GROSS TRANSACTIONS.

...in red ink, and
...tion.

	Debits.	Credits.	Total value of Work or Supplies.
	8 H *	9 F *	10 A *
	284		

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE * BANIPUR.

দানের মর্য্যাদা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দুইটাকা

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ

কার্ত্তিক—১৩৩৬

প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দানের মর্য্যাদা

১

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীতে ছাদের উপর মাতুরখানা বিছাইয়া অমরনাথ শুইয়া পড়িয়াছিলেন। নিকটে একটা মোমবাতির আলোকে বসিয়া কন্যা উমা একখানা বই পড়িয়া পিতাকে শুনাইতেছিল।

চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে চাঁদের আলোয়,—মোমবাতির দীপ্তি চারিদিকে বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে নাই। মাঝে মাঝে ঝরঝর করিয়া চৈত্রের উতল বাতাস আসিয়া দীপ-শিখাটীকে কাঁপাইয়া নিবাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল। উমা তখন বই ফেলিয়া তাড়াতাড়ি দুই হাতে দীপ-শিখাটীকে বাতাসের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

হঠাৎ এক সময় দুর্দ্দান্ত বাতাস অতর্কিতে আসিয়া আলোটা নিবাইয়া দিয়া গেল। উমা সচকিত হইয়া যখন বইখানা ফেলিয়া দুই হাত বাড়াইল, তখন আলো নিবিয়া গিয়াছে।

উমা বলিল "আলোটা নিবে গেল বাবা, জ্বেলে নিয়ে আসি ?"

অমরনাথ অন্যমনস্ক ভাবে শুইয়া ছিলেন, কন্যার কথায় সচকিত হইয়া মুখ ফিরাইলেন, "নিবে গেল আলোটা ? আর কতখানি বাকি আছে মা ?"

উমা বলিল "বেশী নেই বাবা, দুই পাতা বাকি আছে ?"

শ্রান্তকণ্ঠে অমরনাথ বলিলেন "এখন তবে থাক মা, কাল শুন্‌ব।"

উমা বইখানা বন্ধ করিয়া বলিল "তবে থাক বাবা, কাল শুনো।"

অমরনাথ চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলেন, উমাও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

অদূরে প্রবাহিতা গঙ্গা। তাহার ছোট ছোট ঢেউগুলার উপরে চাঁদের আলো পড়িয়া চিকমিক করিয়া জ্বলিতেছিল। ওপারের গাছগুলা মাথায় জ্যোৎস্না মাখিয়া বুকে অন্ধকার ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহারি মাঝে গা লুকাইয়া একটা পাপিয়া অবিরত চীৎকার করিতেছিল—চোখ গেল—চোখ গেল।

নীচে একটা চীৎকার শুনা গেল "দোহাই হুজুর, দোহাই হুজুর, মারবেন না—মারবেন না, সব বলছি।"

সঙ্গে সঙ্গে নায়েবের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল "ফের চীৎকার করছিস বেটা? দেখছি তোর মুখ না বাঁধলে তুই—"

উমা পিতার পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে বাবা? মতিকাকা কাকে মারতে হুকুম দিচ্ছেন?"

অমরনাথ উত্তর করিলেন "আমি বিশেষ কিছু জানিনে মা, তবে বিকেলে মতি বলছিল বটে, রতন জেলে ভারি হাঙ্গামা বাধিয়েছে, তাকে জব্দ করা বিশেষ দরকার; বোধ হচ্ছে তাকেই শাসন করছে।"

উমা বলিল "শাসন কি বাবা?"

অমরনাথ কন্যার পানে চাহিয়া সস্নেহে একটু হাসিলেন, বলিলেন "শাসন মানে মার আর কি?"

উমার কোমল হৃদয়খানা ব্যথিত হইয়া উঠিল। হতভাগ্য রতনজেলের কথা ভাবিয়া সে সজল নেত্র পিতার মুখের উপর রাখিয়া বলিল "না মেরে শাসন করা যায় না বাবা? তবে যে শুনেছি প্রহার করার চেয়ে স্নেহের

শাসনের শক্তি বেশী ? তা যদি হয় বাবা, তবে না মেরে মুখের মিষ্টি কথা দিয়ে শাসন করলেই তো ভাল হয়।"

অমরনাথ বলিলেন "তা হয় মা, সে আমিও জানি। কিন্তু এও জেনো, মানুষের মধ্যেও এমন লোক আছে, যারা কোন শাসনই মানতে চায় না। তাদের কাছে স্নেহের বাঁধন নেই, স্নেহের শাসন তারা মানতে পারে না। জগতে দেবতাও আছে মা, আবার শয়তানও আছে। সকলকে একই জিনিস দিয়ে সন্তুষ্ট রাখা যায় না। তাই যে যেমন, তাকে তেমনি দিতে হয়। কেউ বা মিষ্ট স্নেহে ধরা দেয়, কেউ বা তাতে প্রশ্রয় পেয়ে যায়। সকলকেই দেবতা বলে, ভেব না মা, সকলকেই স্নেহের শাসনে বাঁধতে চেয়ো না, আবশ্যক হলে চোখরাঙানীও দিয়ো। এই যে লোকটা, একে আমি এত দিন স্নেহের শাসনেই বশ করতে চেয়েছিলুম। তোমার বাপকে তো তুমি জানো মা,—তোমার বাপ সহজে বিচলিত হয়ে কোনও কাজ করে বসে না। এ যখন স্নেহের শাসন মানলে না, তখন আমায় বাধ্য হয়ে একে জোর করে বশে আনতে হবে ; আর তাকে শুধু চোখরাঙানী দিলে চলবে না, হাতের কাজটাও চাই।"

উমা নতমুখে বসিয়া রহিল। একটু পরে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল "এতে কি একে বশে আনতে পারবে বাবা ?"

অমরনাথ বলিলেন "ভগবান জানেন।"

উমা শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। সে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দটা পিতার কানে গেল। তিনি বলিলেন, "দুঃখ হচ্ছে মা, কিন্তু এ তোমার সম্পূর্ণ মিথ্যা কষ্ট করা। ছেলেমানুষ তুমি, এখনও লোক চিনতে পার নি, সংসার কেমন তা এখনও জানতে পারনি, তাই একটুতেই ব্যথা পাও। যখন সংসার চিনবে, তখন লোকও চিনবে,—দেখবে, এর মধ্যে দেবতা আর শয়তান পাশাপাশি ভাবেই বাস করছে ; যে যার

ন্যায়সঙ্গত দাবী, তাই চাচ্ছে। দেবতা যা চায়, তাকে তাই দাও। কিন্তু শয়তান যা চায়, তা যদি তাকে না দাও, সে কিছুতেই তোমার কথা কানেও তুলবে না, তোমার শত্রুতাচরণ করবেই। একজন লোক—সে আজীবন কাল দুঃখ কষ্টের মধ্যেই বাস করে আসছে,—প্রত্যেক দিন কত মারই যে খাচ্ছে তার ঠিক নেই। কোন দয়ালু ভদ্রলোক তাকে দেখে ভারি কষ্ট পেয়ে নিজের কাছে আনলেন, তাকে ভাল খেতে পরতে দিলেন। কিন্তু সে লোকটির কাছে এ সব কিছুই ভাল লাগল না ; কারণ, সে প্রত্যেক দিনই মার গাল সইতে এমন অভ্যস্ত হয়েছিল যে, এক দিন এগুলো না হলে তার মনে হয়, দিনটাই বৃথা গেল। সে পর দিনই পালিয়ে গিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলে,—ভাবলে, বাপরে, ও সব কি আমি সহ্য করতে পারি? সংসারে এমনি শয়তানও আছে মা, যে উপকারকে অপকার বলেই জেনে নেয়,—আর সেইটে নিয়ে একটা ভয়ানক কাণ্ডও করে বসে।"

উমা চুপ করিয়া পিতার পানে চাহিয়া রহিল। ভাবিয়া দেখিল তাঁহার কথাই ঠিক। আর পিতা যাহা বলেন, তাহা কখনই মিথ্যা হইতে পারেনা।

অমরনাথ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "সংসারের এই সব দেখে শুনে সময় সময় বড় মনটা খারাপ হয়ে যায়। মনে ভাবি, সব ফেলে একবার ছুটে পালিয়ে যাই। পালিয়ে যেতুম ঠিক—যদি তুই না থাকতিস্ উমা। তখন কেউ আমাকে বেঁধে রাখতে পারত না।"

উমা বলিল "আর উষার বিয়ে বাবা—"

অমরনাথের মুখখানা বিমর্ষ হইয়া গেল। তিনি বলিলেন "ঠিক কথা বলেছিস্ উমা, উষার বিয়ের একটা ভাবনা আছে মাথায়।"

একটুখানি নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন "কলকাতার পাত্রটী সব রকমেই ভাল ; কিন্তু আমার মন সরছে না যে উমা।"

উমা বলিল "কেন বাবা ?"

অমরনাথ বলিলেন "কেন তা জিজ্ঞাসা করছিস্ মা ? আমি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু, তাদের সঙ্গে যে আমার কোন মতেই মিলছে না উমা। ছেলেটী বিলাত ফেরৎ, ডাক্তার হয়েছে, ছেলের বাপ ব্যারিষ্টার। যদিও তারা হিন্দু মতের বলছে, তবু তাদের শিক্ষাটা—"

উমা বলিল "না বাবা, তারা তো ব্রাহ্ম হয় নি বা খৃষ্টানও হয় নি। তারাও বলছে তারা হিন্দু। স্বেচ্ছায় তারা আমাদের ঘরের মেয়ে নেবে, এটা কি ভাল নয় ? শিক্ষা তাদের আছে—সে তো ভালই, আমিও তো তাই ভালবাসি বাবা। অশিক্ষিত পরিবারে, অশিক্ষিত ছেলের হাতে মেয়ে দেওয়া কে প্রার্থনা করে! আমার মত যদি নাও বাবা—তবে এই ছেলেটীর সঙ্গেই বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে ফেল। ছেলের ফটোওতো দেখেছি, চেহারাও বেশ ভাল, আমাদের উষার সঙ্গে বিয়ে হলে বেশ মানাবে।"

অমরনাথ গম্ভীর মুখে বলিলেন, "কিন্তু—হবে কি রকম জানিস্? জলের মাছকে ডাঙ্গায় তুললে যেমন তার অবস্থা হয়, ঠিক তেমনি। একে সে পল্লীগ্রামের জলবাতাসে মানুষ, লেখাপড়া যা জানে তা তাদের বাড়ীর উপযুক্ত নয়, বাংলা আর সংস্কৃতটাই শিখিয়েছি, ইংরাজি শিখাই নি। এতে সে কলকাতায় সেই সব সাহেব ঘেঁসা লোকদের কাছে গিয়ে থাকতে পারবে তো ? আজকাল ধর্ম্মটা কেউ সহজে বিসর্জ্জন দেয় না, কিন্তু মতটা নিঃসঙ্কোচে নিজেদের মধ্যে চালিয়ে যায়। তারা হিন্দু, কিন্তু মনে তারা পূরো সাহেব। আমার সেই ভাবনা, আর কিছুই ভাবছি নে।"

উমা একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "তারা যখন সব জেনে শুনেও নিতে চাচ্ছে, তখন তোমার ভাবনা কেন বাবা ? তারা নিজেদের মত ওকে দুদিনে তৈয়ারী করে নেবে।"

অমরনাথ শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন "সে ভাবনাও বড় কম ভেব না উমা।

যাকে আমি নীতি, সংযম শিক্ষা দিয়ে দেবীরূপে গড়ে তুলেছি, সে যদি সে সব বিসর্জ্জন দিয়ে অসংযমী, দুর্নীতিপরায়ণ হয়, সেটা আমার বুকে কি রকম কঠিন ভাবেই বাজবে। আমার মেয়েকে আমি শান্ত, সংযত দেখতে চাই, তাকে বিলাসিনী দেখতে চাইনে ; দেব দ্বিজে ভক্তিমতী দেখতে চাই, ঘৃণায় সঙ্কুচিতা হয়ে সরে যাওয়া দেখতে চাইনে। আমি যে অমূল্য জিনিসটী তৈরী করেছি, তাকে আবার নিজেরই হাতে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ফেলব উমা ?"

উমা বলিল "কিন্তু, এও তো হতে পারে বাবা—তোমার মেয়ে সে সংসারে গিয়ে ধর্ম্মে, জ্ঞানে সে সংসার উজ্জ্বল করে তুলবে, অন্ধ বিজাতীয়-ভাবাপন্নদের আবার স্বধর্ম্মে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনবে। এ রকম কি হতে পারে না বাবা ?"

অমরনাথ বলিলেন "জগতে কি না হতে পারে মা ? কিন্তু কথা হচ্ছে, অনেকে আবার নিজেকে হারিয়েও ফেলে। অনেকগুলো প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র একটী মেয়ের শক্তি কিছুতেই দাঁড়াতে পারে না,—বিশেষ সে মেয়েটী আবার স্ত্রী রূপেই যাবে। যাই হোক, আমি এখানেই ঠিক করি। ভগবান যা করবেন তাই হবে—তিনি করাচ্ছেন, আমি উপলক্ষ হয়ে করে যাচ্ছি মাত্র। তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, তিনি এই ক্ষুদ্র বালিকাটীকে দিয়েই নিজের কাজ করিয়ে নেবেন।"

নীচে বালিকা উষার ডাক শুনা গেল "দিদি—"

"যাই—" উমা উঠিল।

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "উষা বুঝি জল খেতে ডাকছে ?"

উমা মুখ ফিরাইয়া উত্তর করিল "আজ একাদশী বাবা।"

"একাদশী ?"

পিতা মুখখানা বালিসের উপর রাখিয়া নীরব হইয়া গেলেন। উমা নীচে চলিয়া গেল।

২

অনেক দিনের কথা সে—যেদিন অমরনাথের স্ত্রী—উমার মা অভয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

তখন উমা ছিল পাঁচ বৎসরের, উষা দুই বৎসরের। সংসারে অমরনাথের পিসীমা ছিলেন, তিনিই এই শিশু মেয়ে দুটির ভার লইলেন।

কাজটা বড় কম ছিল না। তিনি বৃদ্ধা, যে সময়ে লোকে ভগবানের নাম গ্রহণ করে, সংসারের দেনা-পাওনা অনেকটা চুকাইয়া ফেলিয়া একটু তফাতে সরিয়া দাঁড়ায়, সেই সময়ে তাঁহার ঘাড়ে দুইটী শিশুর ভার পড়িল। হরিনামের মালা ও ঝুলিটী দেয়ালের হুকে ঝুলাইয়া রাখিয়া তিনি দুইটীকে দুই কোলে তুলিয়া লইলেন।

অবশ্য সে চিরকালের জন্যই নহে। কারণ দুই দিন যাইতে না যাইতেই তিনি অমরনাথকে বিবাহের জন্য ধরিয়া বসিলেন। গম্ভীর মুখে অমরনাথ মাথা নাড়িলেন।

বগলা ঠাকুরাণী ব্যাকুল হইয়া বলিলেন "বিয়ে করবি নে, সে আবার কি কথা রে? কিসের বয়েস তোর, তোর বয়েসে যে অনেকে প্রথম বিয়ে করে। পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়েস, এখুনি তুই সংসারের সঙ্গে দেনা-পাওনা চুকাতে চাস্ না কি?"

হাসিয়া অমরনাথ বলিলেন "তাও কি হতে পারে পিসীমা? দেনা-পাওনা চুকানো আমার মত লোকের কাজ নয়। চুকাতে পারতুম—যদি মেয়ে দুটো না থাকত। ও দুটো যখন আছে, তখন তফাতে গেলেও চলবে না, ওদেরই ভার নিতে হবে।"

বগলা দেবী বলিলেন "তবু বিয়ে করবি নি? ছোট মেয়ে দুটো—

ওদের দেখতেও তো একটা লোকের দরকার। তুই তো বাইরে বাইরেই থাকিস্,—কে এদের দেখাশোনা করবে বল দেখি ?”

অমরনাথ বলিলেন “তুমি তো আছ পিসীমা ?”

রাগ করিয়া হাতখানা নাড়িয়া বগলাদেবী বলিলেন “তাই বলে চিরকালই তোর সংসারে আমি পড়ে থাকি আর কি ? আমার নিজের তো আর কাজকর্ম্ম কিছু নেই,—ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ভাসিয়ে দিয়ে ছেলে মানুষ করি। না, তুই বিয়ে কর বা নাই কর, আমার তাতে কি ? আমি ঠিক বলছি কিন্তু অমর, এই আসছে পূজোর পরেই আমি কাশী চলে যাব। কোথায় এখন জপ তপ করব, তা না, সংসার আর সংসার। সংসার আমার সঙ্গে যাবে, না ? কক্ষনো আমি আর তোর কোনও কথা শুনব না, আমি যাবই পূজোর পরে, তা জেনে রাখিস্।”

অমরনাথ হাসিয়া বলিলেন “তা বেশ তো পিসীমা, যেয়ো তুমি পূজোর পরে, আমি বাধা দেব না তোমাকে। পূজোর তো এখনও দেরী আছে, এই তো মাঘ মাস সবে পড়েছে। এ কয়টা মাস থাকো, মেয়ে দুটোকে একটু দেখো শোনো, বেশী ভার তোমায় নিতে হবে না।”

রাগ ভরেই পিসীমা বলিলেন “দায় পড়েছে তোর মেয়েদের দেখতে আমার। ইচ্ছে হয় নিজে দেখা শোনা কর, না হয় না কর, আমার বয়ে গেল তাতে।”

অমরনাথ নিশ্চিন্ত ভাবেই বাহিরে চলিয়া গেলেন; কারণ তিনি বগলাদেবীকে বেশই চিনিতেন। রাগই করুন, দুঃখই করুন, যে কাজ তাঁহার হাতে পড়িয়াছে, তাহা তিনি পরিপাটীরূপে শেষ করিবেনই। মেয়ে দুটিকে তিনি প্রাণের অধিক ভালবাসিতেন, তাহা অমরনাথ বেশ জানিতেন। ইহাদের ছাড়িয়া পিসীমা কোথাও আর নড়িতে পারিবেন না, সে বিষয়ে অমরনাথ নিশ্চিন্ত ছিলেন।

বগলাদেবী বাহিরে বাহিরে খুবই আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেন, মায়ার পুতলী মেয়ে দুইটার জন্যই যে তিনি রহিয়া গিয়াছেন, তাহাদের যে তিনি ভালবাসেন, সে কথাটা কখনই মুখে আনিতেন না। তিনি লোকের কাছে আস্ফালন করিতেন, "আমি কি ওদের জন্যে পড়ে আছি? ওদের আমি দুচোখে দেখতে পারিনে। আছি কেবল সংসারটা ভেসে যাবে—তাই। এইবার অমরের একটা বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে কাশী যাত্রা করব। বিশ্বনাথের চরণে এখন ঠাঁইটা পেলে হয়, আর দেশে ফিরছিনে।"

এক পূজার জায়গায় তিন চার পূজা চলিয়া গেল, বগলাদেবীর পূজা আর শেষ হইতে চায় না। পূজা আসার মাসখানেক পূর্ব্ব হইতে তিনি ভারী ব্যস্ত হইয়া পড়েন,—কি করিয়া যে পিতৃপুরুষের পূজাটা শেষ করিতে পারিবেন, এই ভাবনায় তাঁহার আহার নিদ্রা একেবারেই দূর হইয়া যায়। পূজা শেষে মাসখানেক লাগে পায়ের হাতের ব্যথা সারিতে। তাহার পর হঠাৎ আবার তাঁহার মনে পড়িয়া যায় কাশীর কথা,—বিশ্বেশ্বরের চরণে লয় হইবার ইচ্ছাটা মনে ভাসিয়া উঠে।

কিন্তু কিছুতেই তিনি অমরনাথের আর বিবাহ দিতে সমর্থ হইলেন না। অমরনাথের বড় কঠোর পণ, সে পণ ভাঙ্গা পিসীমার ন্যায় বৃদ্ধার কাজ নহে।

বাহিরেরও অনেক আকর্ষণ অমরনাথ অনুভব করিতেছিলেন। বিদ্বান্ বিপত্নীক জমীদারকে জামাতারূপে পাইবার জন্য অনেক পিতামাতাই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। অনেক সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ের ফটোও আসিয়া অমরনাথের টেবিলে স্তূপীকৃত হইয়াছিল; কিন্তু অমরনাথ অটল। তিনি কিছুতেই বিবাহ করিবেন না বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা গৃহের তাড়না ও বাহিরের আকর্ষণ কিছুতেই টলাইতে পারিল না।

মেয়েদের শিক্ষার ভার তিনি নিজের হাতে তুলিয়া লইলেন। জ্যেষ্ঠা উমা যথার্থ-ই উমা। সে যেমন সুন্দরী, তেমনি বুদ্ধিমতী। তাহার মনটী যেমন সরল, তেমনি উদার। এত কোমল প্রকৃতির মেয়ে ছিল সে যে সামান্য কিছু দুঃখের কারণ দেখিয়া লোকে যেখানে কেবল একটা আহা বলিত, সেখানে সে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিত। সংসারের কুটিলতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, সংসারের মোহ তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই।

অষ্টমবর্ষীয়া কন্যার বিবাহ দিয়া অমরনাথ গৌরীদানের ফললাভ করিয়াছিলেন। ছেলেটী তখন মাত্র চতুর্দ্দশবর্ষীয়, থার্ডক্ল্যাসে পড়িত। গরীবের ছেলে, তাহাকে গৃহে রাখিতে পারিবেন বলিয়া অমরনাথ তাহাকেই কন্যা দান করেন। গোপীনাথ সর্ব্বাংশে উমার যোগ্য স্বামীই ছিল। তাহার সৌন্দর্য্য, জ্ঞান, বুদ্ধিবৃত্তি, অমরনাথ সবগুলিই পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, বিবাহের পর এক বৎসর গত না হইতেই উমা স্বামী হারাইল। যে সময় তাহার খেলিবার বয়স, সেই সময়েই সে সর্ব্বস্ব হারাইয়া বাঙ্গালার বিধবা শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িল।

বড় আদরের কন্যা উমার এই শোচনীয় অদৃষ্ট দেখিয়া অমরনাথ শয্যা লইলেন। অনেক কষ্টে, অনেক চিকিৎসায় তিনি ভাল হইলেন, কিন্তু মনের সুখশান্তি তাঁহার একেবারেই ঘুচিয়া গেল।

প্রথমটায় উমা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। বিবাহ যে কি—এবং বিধবা হওয়াই বা কি, তাহা সে জানিত না। বাড়ীতে আমিষ বিভাগ তাহার জননীর পরলোকগতা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া গিয়াছিল। অমরনাথ নিরামিষভোজী ছিলেন, মেয়ে দুটীও জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত নিরামিষভোজীই ছিল। পূর্ব্বেও যেমন ছিল, এখনও আহারাদির ব্যবস্থা তেমনিই রহিল। অলঙ্কার বা ভাল কাপড় কিছুই তাহাকে ত্যাগ করিতে হয়

নাই। সুতরাং বিধবা হওয়া যে কি, তাহা জানিবার উপায় না থাকায় উমা কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে আগেও যেমন হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইত, এখনও তেমনি বেড়াইতে লাগিল।

কিন্তু জ্ঞান হইল কিছুদিন পরে; কিছুদিন পরে সে নিজের অবস্থা বেশ বুঝিতে পারিল। উমা দেহ অলঙ্কারশূন্য করিল, ঠাকুর-মায়ের থান লইয়া পরিল। বালিকা কন্যা যখন এই বেশে শোকার্ত্ত পিতার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন দৃঢ়চিত্ত অমরনাথও নিজের দৃঢ়তা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন "আমার সামনে এ বেশ নিয়ে আসিস্ নে মা, আমি তোর এ বেশ দেখতে পারি নে।"

কিন্তু তাহাই আবার দুই দিনে সহিয়া গেল। তাহার সহিত কথা কহিতে অমরনাথ ভুলিয়া যাইতেন সে বিধবা; যে মুহূর্ত্তে কথাটা তাঁহার মনে পড়িয়া যাইত, আর্ত্তভাবেই তিনি বুকখানা চাপিয়া ধরিতেন।

কেন অত তাড়াতাড়ি তাহার বিবাহ দিতে গেলেন, আট বছর বয়সেই সে তাহার সব অধিকার হারাইয়া ফেলিল। যদি আধুনিক মতে বিবাহ দিতেন,—অবশ্য তাহার ললাটের বৈধব্য লেখা কিছুতেই খণ্ডন করিতে পারিতেন না, সে বিধবা হইতই, তবু—তবু স্নেহময় পিতার বুকে একটু সান্ত্বনা থাকিত। আবার ভাবিতেন, তাহার ললাট-লিপিতে অষ্টম বৎসরে পরিণীতা এবং নবম বৎসরে বিধবা হওয়া আছে, তিনি তাহা খণ্ডন করিতেন কিরূপে? যে যাহার অদৃষ্টলিপি সঙ্গে করিয়াই আনিয়া থাকে, তাহার জন্য মানুষ দায়ী হইতে পারে না। এই কথাটী ভাবিয়াই তিনি তাঁহার অসীম দুঃখের মধ্যে একটু সান্ত্বনা লাভ করিতেন।

আর একটা কথাও তাঁহার মনের মধ্যে মাঝে মাঝে উঁকি দিত, কিছু সাহস করিয়া সে কথাটাকে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। সে কথাটা মনে উঠিবামাত্র তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি সেটাকে তখনি চাপা দিয়া ফেলিত।

আবার কি উমার বিবাহ দেওয়া যায় না? সে নবম বৎসরেই বিধবা; স্বামীর কি জানে, কি বুঝে সে? সে বয়সে মেয়েরা পুতুল খেলিয়াই থাকে; পুতুল খেলার মতই, উমার বিবাহ হইয়াছে; সে পুতুলটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আর বিবাহ দেওয়া যাইবে না কেন? সমাজ ঘৃণা করিবে, কিন্তু অধঃপাতে যাক সমাজ। সমাজের তিনি ঢের উপকার করিয়াছেন, সেই উপকারের পরিবর্ত্তে সে যদি অপকার করে, করুক, তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। তিনি আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, বালিকা উমার সুখহন্তা হইবেন না। তিনি স্নেহময় পিতা, পিতার কাজই করিয়া যাইবেন।

কিন্তু উষা আছে। তাহাকে হিন্দুগৃহে দিতে হইবে, তাহার পরে।

উষাকে তিনি শীঘ্র বিবাহ দিতে সম্মত ছিলেন না। একজনের খুব কম বয়সে বিবাহ দিয়া তাহার ফল পাইয়াছেন, কি জানি উষার অদৃষ্টেও যদি তাই ঘটিয়া যায়। যত দিন রাখিতে পারা যায়—থাক না কেন?

উষা চতুর্দ্দশ উত্তীর্ণ হইয়া পঞ্চদশ বৎসরে পড়িয়াছে, বগলা দেবীর চোখে ঘুম ছিল না, আহার ছিল না। উমাও এ বিষয়ে পিতার মন আকৃষ্ট করিত;—বাস্তবিই উষা বড় হইয়া উঠিয়াছে, আর তাহার বিবাহ না দিয়া রাখা ভাল দেখায় না।

অমরনাথ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "মেয়ের বিয়ে দিতে আর আমার ইচ্ছে নেই পিসীমা। উষা বেশ আছে; নিজের মনে খেলছে বেড়াচ্ছে সকলের সঙ্গে মিশতে পারছে। বিয়ে হলেই হয় তো বিধবা হয়ে যাবে, তখন আমি আবার তাকে দেখব কি করে? নিজের হাতে উমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়েছি, উষাকেও এ বেশে সাজাতে আর ইচ্ছে নেই আমার।"

বগলা দেবী বলিয়া উঠিলেন "বালাই যাট, উষার কেন উমার মত অদৃষ্ট হতে যাবে রে অমর? একজনের হলেই কি সকলের হতে হয়?

কি যে সব অলুক্ষণে কথা বলিস, কিচ্ছু ঠিক নেই তার। ও সব কথা মুখে আনিস নে বলছি, মেয়ের বিয়ের যোগাড় দেখ্।"

উমা বলিল "আমায় তুমি অমন করে কেন দেখ বাবা? আর আমার অদৃষ্ট-বশে আমি বিধবা হয়েছি বলে উষাও যে হবে তেমন কোনও কথা নেই। আমার দুঃখ কিসের? আমি বেশ রয়েছি তো। তোমরা বল আমি বিধবা হয়েছি আমার বড্ড দুঃখ, কিন্তু আমি ভাবছি আমার মোটে বিয়েই হয় নি, আমি ছোট বেলা হতে এখনও তোমার সেই উমাই রয়েছি। আমাকে তুমি বিধবা ভেব না। উষার বিয়ের চেষ্টা কর, নইলে লোকে ভারি নিন্দে করবে।"

অমরনাথ কন্যার কথা শুনিয়া মুখখানা ফিরাইয়া গোপনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

৩

"এদিকে আয় উষা, চট করে চুলটা বেঁধে দেই।"

উষা তখন লেস বুনিতেছিল, মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিল, "অত তাড়াতাড়ি কিসের দিদি? থাক না বিকেলে বেঁধে দিয়ো'খন।"

উমা একটু হাসিয়া বলিল, "বিকেলে যে আসবে তারা দেখতে! আর বিকেলের দেরীই বা কত? তিনটে বেজে গ্যাছে, দেখছিস্ নে, রোদ কোথা চলে গ্যাছে।"

উষা নতমুখে বুনিতে বুনিতে বলিল, "থাক না দিদি, দেখতে আসবে তা আবার সেজে গুজে—"

"যা, যা, নেকামো করিস নে, নে, রাখ ওগুলো—"

উষার হাত হইতে সূতার গুটি ক্রুশ টানিয়া ফেলিয়া উমা তাহার মাথা লইয়া বসিল।

"আহা, কি তুই হয়েছিস বল দেখি উষা! চুলগুলো—তা একটু যত্ন নেই; কাপড়খানা—তা যা তা হলেই হল। তোর কি কিছু নেই, কিছু পরতে পাস্ নে? তোর মত মেয়েরা কেমন ফ্যাসান করে, কেমন গুছিয়ে কাপড় পরে, আর তুই হয়েছিস যেন একটা হাবা, কিছু যদি বুঝিস।"

উষা হাসিল। তখনি আবার গম্ভীর হইয়া বলিল "কি হবে?"

উমা। কিসের কি হবে?

উষা বলিল, "এই চুল বেঁধে কি ভাল কাপড় পরে?"

উমা রাগের ভাব দেখাইয়া বলিল "হয় আমার মাথা আর মুণ্ডু।"

উষা হাসিয়া দিদির হাতখানায় একটু নাড়া দিয়া বলিল "রাগ কর

না দিদি, মাইরি, আমি মিথ্যে বলছি নে। ভাল করে চুল বেঁধে, কাপড় পরে কি হবে, তা তো জানি নে। দিন এমন ভাবেও তো কেটে যায়, তবে—"

বাধা দিয়া উমা বলিল "দিন সব ভাবেই তো কেটে যায় উষা! তবু ভাল আর মন্দ। সব থাকতেও থাকিস কেন একটা চাষার মত। চিরদিন এমনি ভাবটা রাখতে পারিস, তবে তো বুঝি। যে ঘরে যাবি, সে আবার তেমনি ঘর। সেই বিলাসিতার মাঝে যদি ঠিক থাকতে পারিস, তাতেই বুঝব।"

পিসীমা আসিয়া বলিলেন; বসিলেন "হ্যাঁরে উমা, তারা শুনছি না কি খিষ্টেন? তারা না কি সব খায়, মেয়েরা না কি জুতো পরে। অমর জেনে শুনে এই খিষ্টেনের ঘরে মেয়েটা দেবে,—বাপ হয়ে মেয়েটাকে এমন করে মাটী করবে?"

উমা উষার বেণী জড়াইয়া দিতে দিতে বলিল, "কে বললে তারা খৃষ্টান ঠাকুরমা? খৃষ্টান হলে কি হিন্দুর ঘরে হিন্দু মতে বিয়ে করতে পারে? আমাদের যেমন সমাজ আছে, সব জাতের মধ্যেও তেমনি একটা সমাজ আছে। তোমাকে কে এই মিথ্যে কথাটা বলেছে বল দেখি?"

বগলা দেবী বলিলেন "আর দিদি—সব্বাই বলছে। কেউ একলা বললে তার নামটা না হয় করা যেত। একলার মুখ ছাপানো যায়, একশ লোকের মুখ বন্ধ করা কি সোজা কথা? একলা কেউ যদি এ কথাটা বলত, তোর ঠাকুরমা কি এমনি আস্তে-আস্তে ঘরে ফিরে আসত? আচ্ছা, খিষ্টেন তো নয়, কিন্তু তাদের বাড়ীর মেয়েরা সব না কি জুতো পায় দেয়, সব জায়গায় বেড়ায়? যার সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্ছে, তারই একটী বোন আছে, সে না কি কলেজে পড়ে, বোর্ডিং না কি—সেখানে

থাকে ? এতগুলো কথা—আমি তাই ভাবছি, একটা কথা না হয় মিথ্যে হতে পারে, এতগুলো কথা কি মিথ্যে হতে পারে ?”

উমা একটু থামিয়া বলিল, “আমি বলি সেটা মন্দ কি ঠাকুরমা ? লেখাপড়া সবাই জানেন, জ্ঞান আছে, ধর্ম্ম আছে—”

বাধা দিয়া মুখ বিকৃত করিয়া বগলা দেবী সরোষে বলিয়া উঠিলেন, “আমার মুণ্ডু আছে। মেয়েটাকে তুই আর তোর বাবা হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে চাস—দে গিয়ে। আমার কি, আমার মত তো কেউ নিবিনে তোরা, নিজেরাই যে লায়েক হয়েছিল। যাক্ আমি এই আসছে দোল-পূর্ণিমাতে কাশী চলে যাব। স্বচ্ছন্দে থাকতে পারব, কারও ভাবনা ভাবতে হবে না।”

রাগ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

উষার চুল বাঁধা তখন শেষ হইয়া গিয়াছিল। সে ফিরিয়া দিদির চোখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, “না দিদি, ওখানে আমার বিয়ে হতে পারবে না।”

উমা বলিল, “কেন রে ?”

উষা বলিল, “আমি তাদের ঘরে থাকতে পারব না। তারা যা তা খাবে, আমাকেও তাই খেতে হবে তো! তারা জুতো পরবে, আমাকেও তাই পরতে হবে। আমি যা তা খেতে পরতে পারব না। না দিদি, কক্ষনো ওখানে আমার বিয়ে হতে পারবে-ই না। তুমি বাবাকে বলে দিয়ো—”

উমা শান্তকণ্ঠে বলিল, “সেজন্যে তোর আমার মাথা ঘামানোর কি দরকার উষা ? বাবা রয়েছেন, তিনিই দেখবেন শুনবেন। তুই যে বলছিস, তুই বিয়ে করতে পারবি নে, এই কথাটা বাবাকে জানাতে, ছিঃ, এ কথা কি জানানো যায় বাবাকে ? বাবা কি ভাববেন বল দেখি

এই কথা শুনলে? ভাববেন, আজকালকার মেয়েগুলো এমনই হয়েছে যে, নিজেদের বিয়ের কথাও বাপ-মাকে জানাতে একটু লজ্জা বোধ করে না।"

পিতার সেই ভাবনার মূর্ত্তিটা কল্পনায় মনে আনিতে বালিকা উষার গণ্ড-কর্ণ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল, "সত্যি দিদি, আমি তা একটুও ভাবিনি কিন্তু। ভাগ্যিস মনে করিয়ে দিলে তুমি, নচেৎ কি হতো।"

তাহার পাগলামীর কথা শুনিয়া উমা একটু হাসিল। সযত্নে তাহার ললাটের উপর পতিত একটা চুল সরাইয়া দিয়া বলিল, "আর সত্যি বাবার যতটা জ্ঞান, যতটা বুদ্ধি, তা কি আমাদের একটুও আছে? বাবা আমাকে বলছিলেন, কি করি? আমি বললুম,—যদি উষার ক্ষমতা থাকে, সে তাদেরই ফিরিয়ে স্বধর্ম্মে আস্থা আনাতে পারবে। বাবা শুনে খানিকটে ভেবে বললেন, তবে এখানেই ঠিক করি। সত্যি উষা, তোর মনের যদি জোর থাকে, তবে যেখানে তুই আছিস সেখানেই থাকবি, কেউ তোকে এক চুল সরাতে পারবে না। বরং যারা দূরে আছে, তারাই তোর কাছে সরে আসবে। তুই ছেলেমানুষ, সংসারের কি-ই বা জানিস। ভগবানের ওপরে বিশ্বাস রাখিস, বাবার দৃষ্টান্ত সামনে রাখিস, বাস্, আর কিছু তোকে করতে হবে না।"

উষাকে দাসীর সহিত ঘাটে গা ধুইতে পাঠাইয়া দিয়া উমা পিতার সন্ধানে গেল।

অমরনাথ নিজের গৃহে টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া পরলোকগতা পত্নীর বৃহৎ তৈল-চিত্রখানার পানে চাহিয়া কি ভাবিতেছিলেন। উমা গৃহে প্রবেশ করিতেই তিনি মুখ না ফিরাইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে, উমা?"

উমা বলিল, "হাঁ বাবা।"

অমরনাথ বলিলেন, "এ বিয়ে হতে পারবে না মা। ভদ্রলোক আসছে আসুক, দেখে যাক—কিন্তু বিয়ে দেওয়া হবে না।"

অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া উমা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বাবা? বিয়ে হতে যে পারবে না, এমন কি কথা আছে?"

অমরনাথ একখানা চেয়ার সরাইয়া লইয়া বসিয়া বলিলেন, "কথা আছে বই কি মা? পিসীমা মহা আপত্তি তুলেছেন। এইমাত্র কেঁদে-কেটে আমায় বললেন, যেন হাত-পা ধরে মেয়েটাকে জলে ফেলে দেওয়া না হয়। তাঁর কান্নাতে মনটা ভারি খারাপ হয়ে গ্যাছে। তা ছাড়া তর্কচূড়ামণি, আরও অনেকে এসেছিলেন—যেন জানাশোনা এই বিধর্ম্মীর ঘরে মেয়ে না দিই।"

উমা মাথা নত করিয়া খানিক দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পর ধীরে-ধীরে বলিল "আচ্ছা—"

সে বাহির হইয়া গেল।

বাড়ীতে বাস্তবিক সেদিন অনেক লোকেরই শুভাগমন হইল। নিষ্ঠাবান অমরনাথকে সকলেই নিষেধ করিলেন, যেন সে ঘরে মেয়ে না দেওয়া হয়। তাঁহার মেয়ের বিবাহের ভাবনা কি? উষা সুন্দরী, বেশ শিক্ষিতা, জমীদারের মেয়ে, তাহাকে বিবাহ করিতে অনেক সুপাত্র আসিয়া জুটিবে।

সন্ধ্যার ট্রেণে কলিকাতা হইতে দুইটী ভদ্রলোক আসিয়া মেয়ে দেখিয়া খুবই পছন্দ করিলেন; এবং বিবাহের কথাবার্ত্তা ঠিক করিতে অমরনাথকে লইয়া বসিলেন।

অমরনাথ বিমর্ষ-মুখে বলিলেন, "আমার কোনই আপত্তি ছিল না; কারণ, আপনাদের আমি চিনি, ছেলেকেও আমি চিনি। কিন্তু এখানে

এই বিষয় নিয়ে একটা ভারি গোল উঠেছে। আমার অন্তঃপুরেও সে গোল পৌঁছেচে। পাত্রেরা যে কিছু ইংরাজ ঘেঁসা লোক—”

পাত্রের মাতুল হাসিয়া উঠিলেন, “ঠিক কথা বলেছেন আপনি। কিন্তু তাদেরকে এইটা বুঝিয়ে বলে দেবেন, পাত্রের মা নিষ্ঠাবান ভট্টাচার্য্যের ঘরের মেয়ে, সেখানে ম্লেচ্ছাচার হওয়ার ভয় নেই! আর তিনি যদি ইচ্ছা করতেন—উচ্চশিক্ষিতা অনেক মেয়ে আছে, যারা স্বেচ্ছায় তাঁর পুত্রবধূ হতে প্রস্তুত—তাদেরই কেউ তাঁর ঘরে আসতে পারত। কিন্তু তিনি বেছে-বেছে চান এমনি ঘরের মেয়ে—সুন্দরী, বেশ শিক্ষিতা, একটু বয়স্থা আর হিন্দু। এ রকম জুটেছে ঠিক আপনারই ঘরে; তাই এখানেই আমরা এসেছি। আমাদের ছেলের বিয়ের ভাবনা কি বলুন, আমি আর আমার বোনই হতে দিচ্ছিনে। দেখুন, আপনার ইচ্ছে হয়, আপনি এখানে বিয়ে দিতে পারেন। না পারেন বলুন, আমরা বিদায় নেই।”

অমরনাথ সকল দ্বিধা সঙ্কোচ দূর করিয়া বলিলেন, “না, আমি এখানেই বিয়ে দেব। আপনারা একেবারে আশীর্ব্বাদ করে যেতে পারেন। আমিও কাল পরশু আশীর্ব্বাদ করে আসব। এই মাঘ মাসেই কয়েকটা দিন আছে, তার মধ্যে যেটাতে সুবিধা বোধ করবেন, আপনারা সেইটেতেই বিয়ে দিয়ে ফেলুন।”

উষার আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল।

অমরনাথ পুরোহিত মহাশয়কে দিয়া পঞ্জিকা দেখাইলেন, বিবাহের দিন ঠিক হইল মাসের কুড়ি তারিখে।

বিদায় লইয়া পাত্রের মাতুল ও অপর ভদ্রলোকটী কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন।

পাত্র সভাস্থ হইল, গ্রামের লোকে হাঁ করিয়া এই বিলাতফেরৎ মস্ত বড়—অথচ হিন্দু-ডাক্তার পাত্রকে দেখিতে লাগিল।

মৃন্ময় সুপুরুষ, বিদ্বান। তাহার মাতা পরম হিন্দু ছিলেন, কিন্তু পিতা একেবারেই নাস্তিক ছিলেন। এই দুইটার মাঝামাঝি মত লইতে গিয়া সে একটা খিচুড়ি মত তৈয়ারী করিয়া ফেলিয়াছিল। সে কখনও ঈশ্বরকে অত্যন্ত ভক্তি দেখাইত, কখনও বা পায়ের তলায় ফেলিবার প্রস্তাবও করিত। এক কথায়, তাহার মাথার ঠিকই ছিল না। মা তাহাকে পাগল ছেলে বলিয়া উড়াইয়া দিতেন। পিতা তাঁহার নিজের মতে ছেলেটিকে সম্পূর্ণ তৈয়ারী করিবার চেষ্টা করিতেন।

মৃন্ময় কলিকাতা ইউনিভার্সিটি হইতে বি-এ ডিগ্রি গ্রহণ করিয়াছিল কুড়ি বৎসর বয়সে। সেই বৎসরেই সে বিলাত গিয়াছিল এবং সেখানে কয়েক বৎসর থাকিয়া চিকিৎসা-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া নামের আগে ডক্টর এবং নামের শেষে এম-ডি যোগ করিয়া সে দেশের ছেলে দেশে ফিরিল।

মতটা বিলাত যাইবার আগে যাহা ছিল, বিলাত গিয়া বেশ সুমার্জ্জিত করিয়া যখন ফিরিল, তখন পিতা নিজের প্রতিভা পুত্রে বিকশিত হইতে দেখিয়া যেমন আনন্দিত হইয়া উঠিলেন, পুত্র যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়া একেবারে নাস্তিক হইয়া গিয়াছে দেখিয়া মা তেমনি ব্যথিতা হইয়া পড়িলেন! তাঁহার দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

মৃন্ময়ের চরিত্রে একটা বিশেষত্ব ছিল, সে মাকে খুব ভক্তি করিত, ভালবাসিত। শুধু মায়ের জন্যই সে প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই হিন্দুগৃহের অল্প-শিক্ষিতা বালিকাটীকে পত্নীত্বে বরণ করিয়া লইতে অগ্রসর হইল।

পিতা আপত্তি করিয়াছিলেন; কিন্তু স্ত্রীর চোখের জলে অবশেষে তাঁহাকেও পরাস্ত হইতে হইয়াছিল।

সম্প্রদানের সময় পার্শ্বে উপবিষ্টা জড়পিণ্ডবৎ স্ত্রীটির উপর চোখ পড়িতেই মৃন্ময়ের হৃদয় ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। ভবিষ্যতে এই জড়ভাবাপন্না স্ত্রীটিকে লইয়াই তাহার জীবন যাপন করিতে হইবে, ইহা ভাবিতে অনুতাপে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। হায়, কেন সে এক মুহূর্ত্তে মায়ের চোখের জলে নিজের দৃঢ়তা হারাইয়া ফেলিল,—কেন সে ভবিষ্যৎ না ভাবিয়াই জেদ করিয়া বসিল যে, যে কোনও মেয়ে মা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন, চোখে না দেখিয়া তাহাকেই সে বিবাহ করিয়া ফেলিবে! এক মুহূর্ত্তের ভুলটী তাহার সারা জীবনের মত সঙ্গের সাথী হইয়া রহিল,—কিছুতেই আর ইহাকে তফাতে রাখা চলিবে না।

তাহার হাতের উপর সুগোল সুগৌর একখানা হাত পড়িল, অমরনাথ কন্যা সম্প্রদান করিলেন। সেই মুহূর্ত্তে মৃন্ময় হাতখানা টানিয়া লইবার জন্য একটু চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তখনি মনে পড়িয়া গেল আর অনর্থক চেষ্টা। কেবল একটা কলঙ্ক মাত্র, আর কিছুই হইবে না। সাধারণের চোখে সে ইহাতে নীচুই হইয়া পড়িবে, উঁচু হইতে পারিবে না।

বিবাহের একটা মন্ত্রও সে পাঠ করে নাই। অমরনাথ সন্দিগ্ধ চোখে তাহার মুখপানে চাহিতেছিলেন; সে মুখে এমন একটা ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল, যাহা দেখিয়া অমরনাথ মোটেই শান্তি পাইতেছিলেন না। তাঁহার মনে হইতেছিল, উষাকে বাস্তবিকই তিনি জলে ফেলিয়া দিলেন; এ বিবাহ কেবল গরলই উৎপন্ন করিবে, সংসার সুখময় করিতে পারিবে না।

তাঁহার মনটা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল,—বিবাহ কার্য্য শেষ হইতেই তিনি উঠিয়া বাহিরে গেলেন। কোলাহল আর ভাল লাগিতেছিল না; তিনি একটা নির্জ্জন স্থান অন্বেষণ করিতেছিলেন।

বাড়ীর পার্শ্বে একটী ছোট ফুলবাগান ছিল। বাড়ীটা গ্যাসালোকে উজ্জ্বল, কোলাহলে মুখরিত,—এ বাগানটা নির্জ্জন, আলোকশূন্য অন্ধকার সেখানে এত ঘন ছিল না, বাহিরের প্রাঙ্গণের গ্যাসলোক সেই অন্ধকার কতকটা ভেদ করিয়া সেখানে আসিয়া পড়িয়াছিল।

অমরনাথ শ্রান্ত দেহখানা কোনও মতে বহন করিয়া আনিয়া সেখানে একখানা বেঞ্চে বসিয়া পড়িলেন।

এক কথায় বিদ্বান, সুচরিত্র, রূপবান, ঐশ্বর্য্যশালী—মানুষের যাহা প্রার্থিত, তাঁহার জামাতায় সে সব গুণই আছে। কিন্তু তবু—তবু তাঁহার মনে হইতেছে,—না, কাজটা ভাল হইল না। তিনি মনকে প্রবোধ দিতে চাহিলেন, কিন্তু হৃদয়ের মধ্য হইতে বার বার তবু কে ডাকিয়া বলিতে লাগিল—ভাল হয় নাই, আগাগোড়া ভুলের বশে চলিয়াছ, এই ভুলের ফল একদিন পাইতে হইবে।

অমরনাথ চমকাইয়া উঠিলেন, কি ভুলের ফল পাইতে হইবে। উমার মত কি? জীবনে কত ভুল কাজ করিয়াছেন, ফল তো সবগুলিরই লাভ হইয়াছে। এ ভুলের কি ফল পাইবেন!

উমার কথাটা মনে হইতেই তাঁহার হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল। এমনি একটী রাত্রে প্রাণাধিকা অষ্টম বর্ষীয়া উমাকেও উদ্বাহ-বন্ধনে বাঁধিয়াছিলেন, সেদিনও বাড়ীখানাকে সাজাইয়াছিলেন, ইহার চেয়েও বেশী উৎসব করিয়াছিলেন। উমার সেই অবগুণ্ঠনাবৃত শ্রী দেখিয়া কি আনন্দেই না তাঁহার বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাহার এক বৎসর পরে—আঃ, সে দিনটা কি দিনই না আসিল।

অমরনাথের অজ্ঞাতে তাঁহার দুইটী চোখ কখন সজল হইয়া উঠিয়াছিল, কখন দুই ফোঁটা জল গণ্ড ভাসাইয়া হাতের উপর পড়িয়া গেল।

ছি, ছি, তিনি করিতেছেন কি? আজ যে উষার বিবাহ-রাত্রি। তাহার মা নাই, তিনি আজ এই শুভ দিনে চোখের জল ফেলিয়া কি দম্পতির অমঙ্গল কামনা করিতেছেন?

তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিয়া তিনি শান্ত, নীরব আকাশখানার পানে চাহিলেন। কি সুন্দর নক্ষত্রখচিত আকাশ। লক্ষ হীরার টুকরা যেন বুকে ধরিয়া হাসিতেছে।

শান্ত আকাশের পানে চাহিয়া অমরনাথ দুটি হাত ললাটে স্পর্শ করাইয়া গভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "নাথ, আজীবন তোমায় বিশ্বাস করেই এসেছি প্রভু, অনেক ঝড় তুফান মাথার উপর দিয়া চলে গ্যাছে, তবু বিশ্বাস হারাই নি। দেখ, জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত যেন এমনি বিশ্বাস রেখেই যেতে পারি, যেন বিশ্বাস হারিয়ে না যেতে হয়। নিজের জন্য কোনও দিন প্রার্থনা করিনি নাথ, প্রার্থনা করবার কোনও দরকার হয় নি। উমার জন্যেও কোনও দিন প্রার্থনা করি নি,—সে যা পেয়েছে তাহাতেই সুখী হোক। কিন্তু ওগো পরম পিতা, আজ যে কাজটি করলুম, যদি তা ভুলের বশে হয়ে থাকে—প্রার্থনা করছি, সে ভুলের দণ্ড আমাকেই দেওয়া হোক। যাকে আজ নিজের হাতে সাজিয়ে দিলুম, নারীর শ্রেষ্ট, বাঞ্চিত যে আসনে আজ প্রতিষ্ঠিত করলুম, পিতার ভুলের জন্য সে যেন সে আসনচ্যুত না হয়।

"বাবা, তুমি এখানে, আমি যে সারা বাড়ীখানা খুঁজে বেড়াচ্ছি এদিকে—"

উমা আসিয়া পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইল।

রুদ্ধ কণ্ঠে অমরনাথ বলিলেন "কেন মা, আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছ কেন?"

বিস্ময়ের স্বরে উমা বলিল "কেন? বাঃ, কখন বিয়ে শেষ হয়ে গ্যাছে,

সারাদিন যে উপোস করে আছ তা বুঝি মনে হচ্ছে না। মেয়ের বিয়ে বুঝি আর কোন বাপেই দেয় না, তোমার মত সব্বাই আনন্দে আত্মহারা হয়?"

"আনন্দে!" অমরনাথ হাসিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সে চেষ্টার ফলে চোখে আসিয়া পড়িল অশ্রু-জল। তিনি বলিলেন "আনন্দ নয় মা আনন্দময়ী, বড় কষ্টেই ছুটে এসেছি এখানে। মনে ভেবে ঠিক করতে পাচ্ছিনে—কি করলুম, কাজটা ভাল করলুম কি মন্দ করলুম। আমি বরাবর দেখে আসছি—ভেবে যা ভাল করতে চাই, সেটা মন্দ ফলই উৎপন্ন করে।"

উমা বলিল, "এ কথা কেন বাবা? আমি দেখছি কাজটা খুব ভালই হয়েছে। মৃন্ময়ের কিছু খারাপ দেখতে পাচ্ছিনে তো।"

অমরনাথ গম্ভীর হইয়া বলিলেন "ছেলেমানুষ তুই মা, সংসার চিনতে মানুষ চিনতে এখনই কি পারবি? আমি তোর বাপ, অভিজ্ঞতা আমার বেশ আছে, যাতে আমি জানতে পেরেছি এ বিয়েতে মৃন্ময়ের একটুও মত ছিল না। নেহাৎ দায়ে পড়েই সে বিয়ে করতে এসেছে। একে তো তারা চলে বিদেশী ভাবে, তার পরে মৃন্ময়ের এই ভাব,—আমার মনে হচ্ছে, উষাকে আমি জীবন্তেই আগুনে ফেলে দিলুম,—সে বুঝি জন্মেও সুখী হতে পারবে না।"

তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

চমকাইয়া উমা বলিয়া উঠিল "না বাবা, ও সব চিন্তা মনেও এনো না। উষা কি আমার তেমনি বোন, সে কি অনাদর করবার জিনিস? তার শিক্ষা যে তোমারি কাছে বাবা, সে যে যথার্থ রত্ন, কাচ তো নয়। ওকে অনাদর করতে পারে, এমন লোক জগতেই নেই। তুমি চল, জল খাবে। রাত কতটা হয়ে গ্যাছে দেখ তো?"

পিতার হাত ধরিয়া সে টানিয়া উঠাইল।

জলযোগান্তে অমরনাথ গিয়া নিজের গৃহে শুইয়া পড়িলেন।

বাসর তখন জনাকীর্ণ—নারীবৃন্দে সে স্থান ভরিয়া গিয়াছে। ঠাকুরমা নাতজামাইয়ের আহার করাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। উমা এখনও এদিকে আসে নাই। সারাদিন-রাতের পরিশ্রম,—কিন্তু তাহার দৃষ্টি ছিল পিতার দিকে। বিবাহের সময় সে দূরে ছিল, আয়ুষ্মতীদের কাছে থাকিবার অধিকার তাহার ছিল না; দূরে থাকিয়া মৃন্ময়ের উন্নত, বলিষ্ঠ চেহারা দেখিয়া বাস্তবিকই সে পুলকিত হইয়া উঠিতেছিল। ঊষা সুখী হইবে, এ কল্পনা করিতে তাহার মনটা যেমন পুলকে পূরিয়া উঠিতেছিল। সে একেবারে পর হইয়া গেল ভাবিতেও তেমনি বিষাদে হৃদয় আচ্ছন্ন হইতেছিল।

বিবাহ শেষে সে পিতাকে জল খাওয়াইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ঘুরিতেছিল। তাহার পর খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাগান হইতে তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া জল খাওয়াইয়া সে শান্তি পাইল। নিমন্ত্রিতগণের আহারাদি পূর্ব্বেই শেষ হইয়া গিয়াছিল, কাজকর্ম্মও ফুরাইয়া গিয়াছিল।

রাত তখন তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। একটু বিশ্রামার্থ নিজের কক্ষে যাইতে গিয়া সে বাসরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মৃন্ময় বালিসটায় হেলান দিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অসভ্য হিন্দু-গৃহের মেয়েদের নির্লজ্জ আচরণের কথা ভাবিতেছিল, এবং যে কোনও সভ্য সমাজে এরূপ ব্যবহার করিলে যে কিরূপ কাণ্ডটা ঘটিত, তাহাই মনে মনে বিচার করিতেছিল। পার্শ্বে পড়িয়া ঊষা তো আরামে ঘুম দিতেছিল। তাহাকে জাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা কেহ করে নাই, কিন্তু বেচারা বরকে কেহই নিষ্কৃতি দিতে চায় না। বর ঘুমাইলে যে বাসরটা মাঠেই মারা যায়।

বহুদিনের অতীত একটা স্মৃতি ধীরে ধীরে উমার মনে জাগিয়া উঠিল।

তখন সে বড় ছেলেমানুষ, কি হইতেছে তাহাই জানে না। কে একটী ছেলে তাহার পার্শ্বে বসিয়া ছিল,—সে লজ্জায় চোখ তুলিয়া তাহার প্রতি চায়ও নাই। আট বছরের মেয়ের লজ্জা, কথাটা হাসির বটে, কিন্তু হিন্দু-গৃহে হাসিবার কিছুই নাই। ছোট বেলা হইতেই মেয়েদের কানে বর কথাটা তুলিয়া দেওয়া হয়। পাঁচ বছরের মেয়েটী—সকলের সঙ্গে মারামারি করে, কিন্তু বরের কথা শুনিয়াই পরণের কাপড়খানি খুলিয়া মাথায় মুখে চাপা দেয়! উমা যদি বরকে দেখিয়া লজ্জা করিবার কথা না জানিত, তবে সে ভাল করিয়া দেখিত; কিন্তু এই লজ্জা তাহাকে ঊষার মতই এক কোণে ঠাসিয়া রাখিয়াছিল।

সেই দিনের কথাটা মনে পড়িতে উমা অন্যমনস্ক হইয়া গেল; সে যে বাসর ঘরের সামনেই দাঁড়াইয়া, সে কথা তাহার মনে রহিল না।

মেয়েরা বরকে গান গাহিবার জন্য ধরিয়াছিলেন। বর এ পর্য্যন্ত একটা কথাও কহে নাই। ইহাতে সে বেচারাকে কথা শুনিতে হইয়াছিল কম নয়। অবশেষে একটা ছোট মেয়ে যখন তাহার কান মলিয়া দিল তখন মৃন্ময় তাহার সকল ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিল।

"এই চললুম আমি, আর যদি কখনও আসি—"

সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাসরে রীতিমত একটা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। সে গোলযোগে ঊষার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সে উঠিয়া বসিয়া দুই চোখ ডলিতে লাগিল। মহিলারা মৃন্ময়কে বসাইবার এত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মৃন্ময় কিছুতেই আর বসিল না। সে পণ ধরিল, এই রাত্রি-শেষের ট্রেণ ধরিয়াই সে কলিকাতায় চলিয়া যাইবে, কিছুতেই এখানে থাকিবে না।

উমা আর বাহিরে থাকিতে পারিল না,—গৃহে ঢুকিয়া পড়িল। মৃন্ময়ের মুখের উপর দুইটা চোখ রাখিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল "তুমি এই চারটের

ট্রেণেই কলিকাতায় ফিরে যেতে চাও,—কিন্তু যাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছ, তাকে রেখে যাবে কোথায় ?"

মৃন্ময় তাহাকে সামনে দেখিয়াই যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। এ মেয়েটীকে সে একবারও দেখে নাই। এমন সুন্দর, দৃঢ় মূর্ত্তি যে এখানে এমন ভাবে সে দেখিতে পাইবে, সে আশাও করে নাই। এমন স্পষ্ট কথাও যে কেহ তাহার মুখের উপর বলিতে সক্ষম হইবে, তাহাও সে ভাবে নাই। সে একবার উমার মুখের পানে তাকাইয়া চোখ নীচু করিল। স্বস্থানে বসিতে বসিতে মৃদুকণ্ঠে বলিল "কিন্তু এঁদের বেজায় রকম অত্যাচার। দুর্ভাগ্যের কথা, আমি কখনও আশা করি নি যে, এ রকম পীড়ন আমার উপরে হতে পারবে। আমি এত দেশ বেড়িয়েছি,—নিঃসম্পর্কীয় পুরুষের কাছে মেয়েরা যে এমন লজ্জাহীন কথা বলিতে পারেন, তার গায়ে হাত পর্য্যন্ত তোলেন, এ কোথাও দেখি নি।"

উমা উগ্রকণ্ঠ স্নিগ্ধ করিয়া বলিল, "তা হতে পারে; আমি তা অস্বীকার করছিনে। বাসরটা আমাদের দেশে বহুকাল হতেই চলে আসছে। এই একটা দিন সবাই এ অত্যাচারটা সহ্য করে যায়। তুমি বিদেশী সভ্যতার মধ্যে মানুষ হয়েছ, এ সব দেখতে পাওনি, জানোও না। কিন্তু—এটা ঠিক, তুমি হিন্দু বলেই আমার বোনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। যখন সেটা সহ্য করতে পেরেছ, তখন হিন্দু সমাজের একটা অঙ্গ এই বাসরটা আর তার অত্যাচারটাও তেমনি করে সহ্য করে যেতে হবে। এ দিনটা তোমায় কেউ মানবে না, সবাই তোমায় যা না তাই বলবে। অবশ্য এটা যে খুব ভাল রীতি, তা আমি বলছিনে,—আমরা সবাই বাসরের বিরোধী; কিন্তু সমাজে যখন চলে আসছে, আমরা কেন তার বিরুদ্ধাচরণ করতে যাব? সমাজের অঙ্গহানি করে এটা বাদ দেওয়া আমরা কোনও মতেই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করিনে। আশা করছি তুমিও করবে না।"

বিস্ময়ে মৃন্ময় উমার পানে চাহিয়া রহিল। হিন্দুর মধ্যে এমন শিক্ষিতা, এমন উন্নত-হৃদয়া নারী যে থাকিতে পারে, তাহা তাহার ধারণায় ছিল না। কিন্তু এমন বেশ কেন? উমা একটু হাসিয়া বলিল "আমি এঁদের বলছি, এঁরা আর তোমায় বিরক্ত করবেন না, তুমি এখন অনায়াসেই ঘুমাতে পারবে, তা হলে বোধ হয় তুমি সুখী হবে।"

মৃন্ময় মাথা নত করিয়া হাসিয়া ফেলিল। উমা সস্নেহে ঊষার পানে তাকাইয়া বলিল "তুই ঘুমো ভাই, বসলি কেন?"

ঊষা অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া দিদির পানে চাহিল। উমা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। মৃন্ময়ের মনে হইল তাহার চোখের সামনে যে উজ্জ্বল আলোটি জ্বলিতেছিল, উমা অন্তর্হিতা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা নিভিয়া গেল।

৫

উষা স্বামীর সহিত কলিকাতায় চলিয়া গেল।

বাড়ীটা যেন অন্ধকার হইয়া গেল। একা উষাই বাড়ীটাকে হাসাইয়া রাখিত। ছুটাছুটি করিতে, চীৎকার করিয়া বাড়ীটা সরগরম করিয়া রাখিতে তাহার মত আর কেহই ছিল না। উমা যেমন শান্ত, নম্র ছিল, উষা ঠিক তাহার বিপরীত ছিল। উমা সময় সময় তাহার দুর্দ্দান্ততার জন্য তাহাকে তিরস্কার করিত, সেটা কেবল তাহার ভবিষ্যৎ শ্বশুরবাড়ীর ভয়ে। উষা যেদিন রাগ করিয়া মুখ ভার করিয়া থাকিত, সেদিন বাড়ীটা একেবারেই নিস্তব্ধ হইয়া পড়িত। সে নিস্তব্ধতা শুধু উমার নয়, নির্জ্জন স্থানাভিলাষী অমরনাথের পর্য্যন্ত বিষদৃশ বলিয়া ঠেকিত।

উমা গোপনে চোখের জল মুছিয়া বগলা দেবীর কাছে গিয়া হাসিল, "বেশ হয়েছে, না ঠাকুর মা? উষা সেখানে বেশ সুখেই থাকবে।"

ঠাকুরমা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'হুঁঃ, সুখ যে কত হবে তা আমি জানছি। সেই সব মেলেচ্ছ আচার ব্যবহার—তাদের মধ্যে গিয়ে ও কখনো থাকতে পারবে উমা?"

উমা নিজের দীর্ঘনিঃশ্বাসটা চাপিয়া ফেলিয়া বলিল, "তা আর কি হবে ঠাকুরমা, যা হবার তা তো হয়েই গ্যাছে, বিয়েটা তো আর ঘুরোনো যাবে না।"

বগলা দেবী তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "হলেই হত। তোমরা সবাই যে ওই ঘরেই ঠিক করলে—তবে হবে না কেন? বাপের মত হল, বোনের মত হল, অমনি বিয়ে হয়ে গেল। আমি আর কোথাকার কে, একটা দাসী বাঁদি বই তো নয়, আমার কথা কি গ্রাহ্য হতে পারে?"

ঠাকুরমায়ের এই উল্টা অভিযোগে উমা যেন আত্মহারা হইয়া গেল, বলিল, "কিন্তু ছেলেটী—"

বাধা দিয়া বগলা দেবী বলিলেন, "জানি বাছা, জানি তা ; কিন্তু শুধু ছেলে ভাল নিয়ে কি ধুয়ে খাব ? ছেলের রূপ আছে, বিদ্যা আছে, পয়সা আছে, কিন্তু গুণটা আছে কি বল দেখি ? বাসরের রাতটায় কি কাণ্ডটা না করলে ? মাগো, মেয়েরা সব কি নিন্দেই না করে গেল। করবে নাই বা কেন ? বাসরে মেয়েরা বরকে কত ঠাট্টা তামাসা করে,—কিছু বোঝে না, কিছু জানে না, অমনি লাফিয়ে উঠে যায় আর কি ? সহুরে ছেলে, বিলেতেও গেছল, এমন চাষা কেন ?"

উমা একটু হাসিল, বলিল, "সত্যি ঠাকুরমা, চাষার মতই শিক্ষাটা তার,—বাসর কি তা বোঝে না। কেন বোঝে না জানো ? ওরা সব সাহেব-ঘেঁসা লোক কি না,—সাহেবদের মধ্যে তো বাসর নেই, কাজেই বাসর ওরা জানবে কি করে ? রাগ করলেও তার সাজে। কিন্তু দেশের মেয়েরা কেন যে চটেন, তা আমি বুঝতে পারছি নে।"

বগলা দেবী রাগ করিয়া মুখ ফিরাইয়া রহিলেন, কথা কহিলেন না। উমা সেখানে আর কথাবার্ত্তার সুবিধা না দেখিয়া বাহির হইল।

অমরনাথ আজ জমীদারির কাজে হাত দেন নাই। নিজের ঘরে একটা সোফায় বসিয়া একখানা বই দেখিতেছিলেন। মনটা কোথায় ছিল কে জানে, তিনি কেবল পাতা উল্টাইয়া যাইতেছিলেন।

উমা পিতার পায়ের কাছে নীচে বসিয়া পড়িল। পিতার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, কোনও কথা বলিল না।

অমরনাথ বইখানা সমীপবর্ত্তী টেবিলের উপর রাখিয়া কন্যার পানে চাহিলেন। পাখানা সরাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "থাক মা, পা টিপতে হবে না, তুমি এই চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসো।"

উমা বলিল, "না বাবা, একটুখানি পা টিপে দিই। সকাল বেলায় বলছিলে পা ব্যথা করছে, তাই—"

সস্নেহকণ্ঠে অমরনাথ বলিলেন, "সকালবেলায় ব্যথা করেছিল, এখনও কি তা থাকে মা? বিকেল হয়ে গ্যাছে যে।"

উমা তথাপি পা ছাড়িল না, নীরবে পদসেবা করিতে লাগিল।

অমরনাথ একটুখানি নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আজকের খবরের কাগজখানা পড়া হয় নি, একটু পড় তো, শুনি মা।"

শ্রান্ত কণ্ঠে উমা বলিল, "আজ কিছু ভাল লাগছে না বাবা।"

কেন যে ভাল লাগিতেছে না পিতা তাহা বেশ জানিতেন। চঞ্চলা যে বালিকাটী ছিল সে আজ নাই, বাড়ীটাতে এত লোক থাকা সত্বেও মনে হইতেছে, কেহ নাই। অমরনাথ প্রাণে ভারি শূন্যতা অনুভব করিতে-ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে বেদনাটা ফুটিয়া প্রকাশ হইতে পারে নাই।

অমরনাথ বলিলেন, "কেন ভাল লাগবে না মা? ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, ঊষা যেন জন্মে জন্মে শ্বশুরঘরই করে, বাপের বাড়ীর সঙ্গে যেন তার সম্পর্ক না রাখ্‌তে হয়।"

উমার দুটি চোখ দিয়া গোপনে দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল, সে মুখখানা অবনত করিয়া কোনও ক্রমে সে অশ্রুবিন্দুকে মুছিয়া ফেলিয়া ভারি গলায় বলিল "সে প্রার্থনা তো দিন-রাতই করছি বাবা।"

আজ অমরনাথেরও কোন কথা ফুটিতে চাহিতেছিল না। উমা সেখানেও বেশীক্ষণ থাকিতে পারিল না, একটা ছুতা ধরিয়া খানিক পরেই বাহির হইল।

তাহার স্নেহপ্রবণ হৃদয়খানা আজ কিছুতেই ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছিল না। সে মুক্ত ছাদে গিয়া বসিয়া রহিল। মনে জাগিতেছিল, ঊষার ছোটবেলা হইতে আজ পর্য্যন্ত সব দিনগুলার কথা।

দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, বিন্দু গোয়ালিনী দেখা করিতে চায়।

বিরক্ত ভাবে উমা বলিল, "কেন ?"

দাসী বলিল, "তা বলছে না।"

উমা একটু ভাবিয়া বলিল, "তার মাসিক বৃত্তি তো তাকে সে দিন দেওয়া হয়েছে, আবার কি দরকার? আচ্ছা, ডেকে নিয়ে আয় আমার কাছে।"

শুধু বিন্দু গোয়ালিনী নয়, অনেক দীন দরিদ্র উমার নিকট হইতে মাসিক সাহায্য প্রাপ্ত হইত। কেবল অমরনাথ ইহা জানিতেন, আর কেহই জানিত না। কন্যার এই সৎকার্য্যে পিতা বাধা দেন নাই, বরং আরও উৎসাহ দিতেন।

বিন্দু আসিয়া দাঁড়াইল।

উমা জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কি দরকার ?"

বিন্দু কাঁদিয়া বলিল, "দরকার না থাকলে কি আসি দিদিমণি ?"

উমা বিরক্ত হইয়া বলিল, "মর, কেঁদেই মরছেন ; আসল কথাটা কি আগে তাই বল, তার পর যত পারিস কাঁদিস, আমি বারণ করব না। সেদিন গোমস্তা বাবু তোকে টাকা দিয়ে আসেন নি ?"

বিন্দু চোখ মুছিয়া বলিল, "দিয়েছেন।"

উমা বলিল, "তবে আর কি চাস, আবার কাঁদছিস কেন ?"

বিন্দু রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "সব কেড়ে নিয়ে পালিয়েছে সে,—একটা পয়সা ঘরে নেই, যা দিয়ে ছেলেটার খাবারের একটু যোগাড় করি। নিজের কি দিদিমণি, দু' দিন না খেয়েও বেশ কাটিয়ে দিতে পারি ; কিন্তু ছেলেটা" —বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া আকুল হইল। উমা খানিকক্ষণ গম্ভীর ভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিল, "তোরই দোষ।"

বিন্দু কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল "কিসে দিদিমণি ?"

জ্বলিয়া উঠিয়া উমা বলিল, "আবার জিজ্ঞাসা করছিস্ কিসে ? তোর স্বামী এতটা অধঃপাতে গ্যাছে, সেও তোর জন্যে। তুই যদি একটু শক্ত হতিস, তবে এতটা হতে পারত না।"

বিন্দু বলিল, "আর কি করে শক্ত হব দিদিমণি ? যে কিছু বোঝে না, তাকে বুঝাব কি ? প্রথম প্রথম ঝগড়া করতুম, সেবা করতুম না,—ভাবতুম, এমনি করলে সে ঠিক জব্দ হয়ে যাবে, নিজের ওপরে নিজের ঘেন্না হবে। তাতে কোনই ফল পাই নি। তারপরে তোমার কথা শুনে, তোমার উপদেশ মতই চলতে লাগলুম, ঝগড়া করা একেবারেই ছেড়ে দিলুম, প্রাণপণে সেবা যত্ন করতে লাগলুম। এতে সে বেশী সাহস পেয়ে গেল। আগে সে কখনও একটা কথা আমায় বলতে সাহস করে নি,—কিন্তু এখন দিদিমণি, সে আর ভয় করে না,—চক্ষুলজ্জা বলে একটী যে জ্ঞান, সেটাও আর নেই। এই দেখ দিদিমণি, তার কাছে আমার একে-বারে নীচু হয়ে থাকার—সেবা-যত্ন করার চিহ্ন আমার গায়েই দেখতে পাবে—।"

সে পিঠের কাপড়খানা তুলিয়া দিল,—বিস্ময়ে উমা চাহিয়া দেখিল, অনেকগুলা প্রহারের চিহ্ন।

অতি কষ্টে চোখের জল প্রশমিত করিতে করিতে বিন্দু বলিল, "আর আমি কি করব দিদিমণি, শক্ত হয়েও দেখলুম, নরম হয়েও দেখলুম। শক্ত হয়ে যে ভয়, যে চক্ষুলজ্জাটা রাখতে সমর্থ হয়েছিলুম, নরম হয়ে তা সবই হারিয়েছি। এখন আমায় কি করতে বল।"

উমা আকাশ পানে চাহিল, সাধ্বী স্ত্রীর এই লাঞ্ছনা, ভগবান, আছ কি তুমি ? চোখ দুইটী সত্যই খাইয়া বসিয়া আছ, না আছে তাহা ?

উমা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া চোখ নামাইয়া বলিল, "সবই দেখছি বিন্দু! কিন্তু তোকে বলছি আমি—হাল ছেড়ে দিস নে, হাল ছাড়লেই

তোর নৌকা একেবারেই অতল জলে ডুবে যাবে। মনে কর—এইবার তোর স্বামী যথার্থ মুক্তিলাভ করবে। সতী-স্ত্রীর গায়ে হাত তোলা—বড় সহজ কথা মনে করিস নে, এর জন্যে অনুতাপ তাকে করতেই হবে; সেই অনুতাপের ফলেই তার দানবত্ব ঘুচে যাবে, সে আবার সেই হবে। মনে করে দেখ, গৌর নিতাই যখন নদীয়ার পথে পথে হরিনাম করে বেড়াচ্ছিলেন, তখন পাপিষ্ঠ জগাই মাধাই সে পবিত্র নাম সহ্য করতে না পেরে, কলসীর কাণা ছুঁড়ে মেরেছিল, যা মহাপ্রভুর কপালে লেগে রক্তপাত পর্য্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু তিনি তখন কি বলেছিলেন জানিস? তাঁর মহত্ব দেখে পাপী দুভাই যখন তাঁর পায়ের তলে লুটিয়ে পড়ল, কিন্তু সাধারণে যখন তাদের হরিনাম দিতে মহাপ্রভুকে নিষেধ করলে, তখন তিনি চোখের জলে ভেসে বললেন, 'মেরেছে কলসীর কাণা, তা বলে কি প্রেম দিব না।'—দেখছিস—কত বড় মহান্ ত্যাগের দৃষ্টান্ত চোখের সামনে! তিনি তাদের দুই হাতে জড়িয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন, তাদের নাম দিলেন, তারা মুক্তিলাভ করলে। বিন্দু, তোর স্বামী তোকে মেরেছে, তুই অটুট থাক, তেমনি সেবা যত্ন করে যা, যত বড় মহাপাপী—যত বড় পাপিষ্ঠই হোক না, তাকে ভাল হতেই হবে। কিন্তু তুই যদি এখন কঠিন হয়ে উঠিস্, সে অনুতাপ করবে না, সে ভালও হবে না। তাকে ভাল করতে, সৎপথে ফিরাতে, চাই কেবল প্রেম, তা ছাড়া আর কিছু দিয়ে কাজ হবে না। যে মন্দ, তারও পরে কঠিন ব্যবহার করতে গেলে সে আরও মন্দ হয়ে যায়, তাকে আর ফেরানোর আশা করা যায় না। কিন্তু সৎ ব্যবহারে তাকে অনায়াসে ফেরানো যেতে পারে, এই কথাটা মনে রাখিস।"

বিন্দুর চোখের জল শুকাইয়া গিয়াছিল, আনন্দে তাহার হৃদয়খানা পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সে নত হইয়া উমার পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া গদ্গদ

কণ্ঠে বলিল, "তোমার কথামতই চলব দিদিমণি,—তুমি মানুষ নও, দেবী। কিন্তু আজ কি খেতে দেব ছেলেটাকে ?"

উমা বলিল, "চল, আমি দিচ্ছি।"

নীচে নামিয়া গিয়া নিজের গৃহে সে প্রবেশ করিল; বাক্স খুলিয়া একখানা পাঁচটাকার নোট তাহার হাতে দিয়া বলিল, "এইটে নিয়ে যা। নগদ পয়সা একটাও হাতে রাখিস নে, যা দরকার, একেবারে সব কিনে নিয়ে যা।"

বিন্দুর কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হইয়া গেল। সে নীরবে নোটখানা লইয়া চলিয়া গেল। উমা আবার ছাদে গিয়া বসিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, বাহির-বাটীতে গৃহদেবতা গোবিন্দজীর মন্দিরে আরতির উদ্যোগ হইতেছিল। প্রত্যেক দিনই আরতির সময় উমা মন্দিরে উপস্থিত থাকিত, আজ সে গেল না।

আকাশে একটী দুটি করিয়া অসংখ্য তারা ফুটিয়া উঠিতেছিল; ধরণীর গায়ে অন্ধকার ক্রমে নিবিড় ভাবেই নামিয়া আসিতেছিল। অমরনাথের ফুলবাগানের পাশে গোটাকতক শৃগাল খুব চীৎকার করিয়া উঠিতেই, চাকরের দল হৈ-হৈ করিয়া তাড়া দিল; বেচারা শৃগালকুল চীৎকারে বাধা পাইয়া পলাইল। মন্দিরে আরতির শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর বাজিয়া উঠিল।

উমার কোন দিকেই মন ছিল না; সে আকাশের পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল বিন্দুর কথা,—উষার কথাও তখন তাহার মনে ছিল না।

সংসারে এমন ঢের বিন্দু আছে, যাহার এমনি করিয়া মাতাল স্বামীর হাতে মারই খাইয়া যায়, কেহ নীরবে সহিয়া যায়, কেহ উগ্ররূপ ধরে। সামান্য স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে গিয়া আমাদের দেশের অনেক ছেলেই মাতাল হয়। তাহাদের আত্মীয়-পরিজন অপদস্থ হয়ও তো বড় কম নয়। তাহার মনে পড়িল, এক দিন তাহাদের বৈঠকখানার সামনে রতন জেলেকে

দেওয়ান মতিবাবু উত্তম মধ্যম প্রহার করিয়াছিলেন। পরদিন সে কারণটা শুনিতে পাইয়াছিল। রতন মদ খাইয়া, জ্ঞান হারাইয়া, তাহার মাকে মারিয়াছিল,—তাই তাহাকে শাসন করিয়া দেওয়া হইল।

কারণ শুনিয়া সে বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া পড়িলে, তাহার সম্পর্কীয়া মাসীমা তাহাকে বুঝাইয়াছিলেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই, অনেক শিক্ষিত ভদ্রসন্তানও এরূপ করিয়া থাকে। মদ খাওয়া যে শিক্ষা-দীক্ষাবিহীন ছোটলোকের কাজ, তাহা নহে ; অনেক ভদ্রলোকও ইহাকে গৌরবের জিনিস বলিয়া মনে করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি তাঁহার বায়ের পুত্র মনীশের উল্লেখ করিয়াছিলেন। মনীশ ছেলটীকে উমা চিনিত। সে প্রায়ই এখানে আসা-যাওয়া করিত। সে এম-এ পাশ দিয়াছিল, এবং পরে কলিকাতার কোনও কলেজের প্রফেসার হইয়াছিল।

মনীশ মদ খায়—কথাটা শুনিয়া উমা একেবারে আকাশ হইতে পড়িয়াছিল। সে মনিদা'র চরিত্রে তো কোন দিনই দোষই দেখিতে পায় নাই। মনিদা এমন জ্ঞানবান ছিল,—এমন বুদ্ধিমান ছিল যে, উমা তাহার নাগাল পাওয়া অসম্ভব বলিয়াই জানিয়া রাখিয়াছিল। মনিদার মত লোক মদ খায়—একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু পিতা বলিয়াছিলেন, জগতে কিছুই অসম্ভব নয়, সবই সম্ভব হইতে পারে। পিতার কথা উমার কাছে বেদবাক্য, উমা তাই ভাবিয়াছিল, হইতেও পারে।

আজ বিন্দুর কথা ভাবিতে ভাবিতে এই সব কথাই তাহার মনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। এই সব স্বামীর স্ত্রী, স্বামীর নিকট উৎপীড়িতা হইয়া মৃত্যুকেই প্রার্থনা করে। হিন্দু-স্ত্রীর স্বামীই দেবতা, দেবতাকে তাহারা অবহেলা করিতে পারে না,—ঘৃণা আসিলেও তাহা চাপিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু এই সব দেবতা—ইহারা পূজা লইতে জানে, পূজারিণীর পানে তাকাইতে জানে না।

জগৎটা এ রকম কেন ? এখানে সকলেই লইতে চায়, দিতে কেউ চায় না। যদি আদান-প্রদান সমানই চলিত, তবে জগৎটা যথার্থ স্বর্গ হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। আদান-প্রদান নাই বলিয়াই জগৎ—জগৎ।

মন্দিরের আরতির বাদ্য থামিয়া গেল, দর্শকের কণ্ঠ হইতে যুগপৎ শব্দ উঠিল;—হরিবোল—হরিবোল।

উমা গলায় কাপড় দিয়া নতজানু হইয়া প্রণাম করিল। খানিকক্ষণ প্রার্থনা করার পরে তাহার মনটা অনেকটা পাতলা হইয়া গেল। সে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

দাসী আসিয়া বলিল, "বাবু ডাকছেন।"

তাহার সহিত উমা নামিয়া গেল।

৬

শ্বশুরবাড়ী যে কি জিনিস, তাহা বাঙ্গালীর মেয়ে বেশ জানে। জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গেসঙ্গেই শ্বশুরবাড়ী কথাটা তাহার কানে আসিয়া লাগে, এবং সেই সময় হইতেই তাহাকে শ্বশুরবাড়ীর উপযোগী করিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। সে একটা কিছু অন্যায় কাজ করিলেই তাহাকে তাড়না করা হয়—শ্বশুরবাড়ী গেলে কি উপায় হইবে? প্রতি পদে তাহাকে ধীর, শান্ত, নম্র হইবার উপদেশ দেওয়া হয়, যেন সে শ্বশুরবাড়ীর জীবনটাকে দুঃসহ মনে করিতে না পায়। শ্বশুরবাড়ীর জন্যই মেয়ের জীবন, কারণ মেয়ে শুধু মা, আর কিছুই নয়। এই মাতৃত্বের শিক্ষা অভিভাবিকার কাছে। এইখান হইতে সে যে শিক্ষা লাভ করিবে, তাহাই তাহার জীবনটাকে রমণীয় করিয়া রাখিবে। বাংলার মেয়ে ছোট বেলা হইতে সংযম শিক্ষা করিতে শেখে। নানা ব্রতের মধ্য দিয়া তাহাকে সহনশীল করিয়া গড়িয়া তোলা হয়; কারণ, মা হইতে গেলে সহনশীলতা আবশ্যক। শ্বশুরবাড়ীতে সকল মেয়েকেই যাইতে হইবে; তাহাদিগকে তাহার উপযোগী শিক্ষালাভ করিতেও হইবে; নহিলে তাহার জীবনটাই খাপছাড়া হইয়া যাইবে; সংসারের কাহাকেও সে সুখী করিতে পারিবে না।

উষাও এ শিক্ষার হাত এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। ছোটবেলা হইতে সে বিশেষ করিয়া বগলা দেবীর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছে। বেশী হাসা, চীৎকার করা, দৌড়াদৌড়ি করা, এ সবই স্ত্রীলোকের নীতিবিরুদ্ধ কাজ। চঞ্চলা উষাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য তিনি তখন যে ভাষা প্রয়োগ করিতেন, তাহা কোনও সভ্যসমাজে উক্ত হইবার নহে। তখন উষার নিকট তাহা অত্যন্ত খারাপ লাগিলেও, এখন তাহা কাজে লাগিল।

সে দেখিল, যথার্থ-ই ঠাকুরমা ও দিদি তাহাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য। স্ত্রী-জীবনে শ্বশুরালয় প্রথম সময়ে একটা কারাগার বলিয়াই ঠেকে। ক্রমে সেই কারাগার আবার মুক্ত রাজ্য বিবেচিত হয়, তাহার সকল বন্ধন আলগা হইয়া যায়, এবং সেই রাজ্যের একছত্রী রাণী হয় সেই ক্ষুদ্র বধূটীই। কিন্তু প্রথম নূতন বধূ, সে না পায় আনন্দ, না পায় স্ফূর্তি। চোখের জলে, আর পুরাতন স্মৃতি মনে করিয়া, অতি কষ্টেই তাহার দিন কাটে।

উষা জলের মাছ ডাঙ্গায় গিয়া পড়িল।

অবগুণ্ঠনের আড়ালে যে নিজের চক্ষুজল লুকাইবে, সে যোও ছিল না। অবগুণ্ঠন একটীবারও সে দিতে পারে নাই।

এ বাড়ীতে সবই তাহার কাছে নূতন বলিয়া ঠেকিতে লাগিল।

গাড়ী হইতে নামিবামাত্র একটী যুবতী আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া নামাইয়া লইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া সে একেবারে বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। অত বড় মেয়ে, বোধ হয় তাহার দিদির মত,—তাহার মাথায় সামান্য একটু কাপড় পিন দিয়া আঁটা, সামনেটা সবই খোলা। কাপড় পরার ধরণটাই বা কেমন? পিছনে আবার কাপড় খানিকটা কুঞ্চিত করা, অঞ্চলটা বুকের বামদিকে একটা ব্রোচে আঁটা। পায়ে গোড়ালী উঁচু জুতা, আবার মোজা।

বিস্মিতা উষা অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল, কই, সিন্দূর তো সিঁথিতে নাই। মেয়েরা আবার বাঁকা করিয়া পুরুষদের মত সিঁথি কাটে, এদের যে সবই আশ্চর্য্য।

আরও কয়েকটী মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইল, সকলেরই সেই এক সমান বেশ ভূষা। 'অবগুণ্ঠনাবৃতা' উষাকে দেখিয়া তাহারা হাসিয়াই আকূল, একজন বলিল, "সতী, তোর ভাইবউ তো বেশ ঘোমটা দেয়। মৃন্ময়

বাবুর খাসা বউ হয়েছে। এত পছন্দ, এ বিয়ে করব না, ও বিয়ে করব না, শেষে পছন্দ হল বুঝি এই তিন হাত লম্বা ঘোমটাবতীটিকে!"

সতী মৃদু হাসিয়া বলিল, "না ভাই ঠাট্টা করিস নে। দেখিস, এই বউকে কেমন করে তৈরি করে নিই।"

আর একটী মেয়ে—তার চোখে এক জোড়া চশমা, হাতে একটী রিষ্ট ওয়াচ—সে অগ্রসর হইয়া আসিয়া উষার মুখের অবগুণ্ঠন তুলিয়া দিল, "ওগো, তোমায় আর অত ঘোমটা টানতে হবে না। সতী, তোর ভাই-বউ আবার চোখ বুজে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল যে।"

সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

এই সব হাসি-পরিহাসের মধ্যে উষা সত্যই কাঠ হইয়া গিয়াছিল। তাহার চোখ ভরিয়া অনেকখানি জল আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; হঠাৎ কখন কখন তাহা উপছাইয়া গণ্ড বাহিয়া পড়িয়া গেল। পিতার উপর, দিদির উপর অভিমানে তাহার সারা হৃদয়খানা ভরিয়া উঠিল। তাঁহারা তো সবাই জানিতেন,—জানিয়া শুনিয়া কেন এখানে তাহার বিবাহ দিলেন।

চশমা-চোখে মেয়েটী মৃন্ময়ের পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "সুন্দরী স্ত্রী পেয়েছেন মৃন্ময় বাবু, চালিয়ে নিতে পারবেন তো?"

মৃন্ময় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উষার পানে চাহিল, তার পর আস্তে আস্তে সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

উষা দাঁড়াইয়া কাঁদিয়াই আকুল হইতেছিল। যে দাসীটা তাহার সহিত প্রসাদপুর হইতে আসিয়াছিল, সে এই গোলযোগ দেখিয়া, অনেক দূরে দাঁড়াইয়া. অবাক্ হইয়া চাহিয়া ছিল। সে পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক মাত্র। একে সহরে পা দিয়াই সে চমকিয়া গিয়াছিল, তাহার উপর এই আশ্চর্য্য সুন্দরীর দল দেখিয়া সে আর পলক ফেলিতে পারিতেছিল না! উষা তাহাকে কাছে পাইবার আশায় দু'চারবার এদিক

ওদিক চাহিল, তাহাকে দেখিতে না পাইয়া তাহার চোখের জল আরও বেশী পড়িতে লাগিল।

"এসো, আমার মা লক্ষ্মী, আমার ঘরে এসো মা—"

ঊষা মুখ তুলিল। সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে যথার্থ-ই মাতৃ-মূর্ত্তি চওড়া লালপেড়ে একখানি শাড়ি তাঁহার পরিধানে, একটী সাদাসিদা সেমিজ গায়ে, সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দূর-বিন্দু দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে। হাতে কতকগুলি সোণার চুড়ি। তাঁহার মুখখানায় যথার্থ দেবীর ন্যায় জ্যোতিঃ। তাঁহাকে দেখিলে যথার্থ-ই হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে।

ঊষা তাঁহার পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। তিনি অগ্রসর হইয়া ঊষাকে দুই হাতে জড়াইয়া বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন, তাহার ললাটে একটা স্নেহচুম্বন দিয়া বলিলেন "কান্না কেন মা, আমি যে তোমার মা রয়েছি এখানে। তোমার মা নেই, তাই ভগবান আমায় তোমার মা করে পাঠিয়ে দেছেন। এস মা আমার আনন্দময়ী, আমার ঘর আলো করবে এস, আমার শূন্য ঘর পূর্ণ করবে এস।"

সতীর পানে চাহিয়া ভর্ৎসনার সুরে বলিলেন, "ছি সতী, কাজটা তোমাদের মোটেই উচিত হয় নি। পল্লীগ্রামের মেয়ে, কি জানে সে। তোমাদের কথাবার্ত্তা, হাসি দেখে সে কেঁদে ভাসাচ্ছে, দেখছ কি? ছেলে মানুষ, তোমাদের কি বোঝে সে?"

সতী অপ্রস্তুত ভাবে আস্তে আস্তে সরিয়া গেল। ঊষাকে লইয়া মৃন্ময়ের মা মালতী দেবী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এই মুহূর্ত্তেই ঊষার মনটা তাঁহার পদতলে একেবারে নুইয়া পড়িল, সে সজল চোখ মালতী দেবীর মুখের উপর রাখিল।

দাসী শ্যামা এক সময়ে তাহাকে একাকিনী পাইয়া চুপি চুপি বলিল, "কি রকম লোক এরা দিদি? বরণ নেই, আচার নেই, কিছু নেই,

আমাদের দেশ ঘরে বিয়ে হলে এতক্ষণ কত কাণ্ড হতো। এ সবই অনাছিষ্টি দেখ্‌ছি। শুনেছিলুম হিন্দু নয়, বিশ্বাস করিনি, এখন দেখছি ঠিকই।”

উষার মনেও কথাটা ঘুরিয়া ফিরিয়া বাজিতেছিল। সে কত বিবাহ দেখিয়াছে, এমন আশ্চর্য্য কখনও দেখে নাই। প্রতিবেশী রামসদয় বাবুর ছেলে বিবাহ করিয়া আসিল, বধূকে দুধ আলতার পাথরে দাঁড় করানো হইল, বরণ করা হইল, আরও কত কি হইল। কই তাহার বিবাহে তো সে সব কিছুই হইল না।

সে যত দেখিতে লাগিল, ততই আশ্চর্য্য হইতে লাগিল। এ বাড়ীতে তাহার শাশুড়ী মালতী দেবী ছাড়া আর সকলেই জুতা পায় দেয়, সকলের সম্মুখে বাহির হয়।

ননদিনী সতীর বাল্যসখী কয়টী মেয়ে দুই তিন দিন সে বাড়ীতে ছিল। মালতী দেবীর ভয়ে তাহারা উষাকে আর ঠাট্টা-তামাসা করিতে পারে না, তাহার কাছেও বড় একটা আসে না। ইহাতে উষা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ইহাদের ঠাট্টা-তামাসার ভয় তাহার বড় বেশী রকম ছিল।

সে দিনে বাড়ীতে একটা সান্ধ্য-সম্মিলন ছিল, ইহাতে বন্ধু-বান্ধব সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বড় হলটা নরনারীতে ভরিয়া গিয়াছিল। মজলিসের হাসি, কথা উষার কানে অপর কক্ষে ভাসিয়া আসিতেছিল। অনভিজ্ঞ বালিকা উষা বসিয়া ভাবিতেছিল—এ আবার কি, এ কাহাদের মধ্যে সে আসিয়া পড়িয়াছে। বাবা দেখিয়া এ কোথায় তাহাকে নির্ব্বাসিতা করিলেন? দিদি যে বলিয়াছিলেন—

অভিমানে উষার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল! বাবা—তোমার উষাকে এখান হইতে উদ্ধার কর,

তোমার কাছে লইয়া যাও। এখানে থাকিলে উষা বাঁচিবে না, তোমার উষা মরিয়া যাইবে।

সতী দ্বারের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহের মলিন আলোটার পানে দৃষ্টি করিয়া বলিল, "ঘরের আলোটা এত কম করে দেছে। বললেই পারতে বউদি, আলোটা বাড়িয়ে দিতে। এমন করে আছ, যেন চোর হয়ে এসেছ তুমি। না, অমন করে বসে থাকলে হবে না, চল, তোমায় ওখানে সবাই ডাকছে।"

উষা একেবারে সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িল, সেখানে অত লোক, কেমন করিয়া সে সেখানে গিয়া দাঁড়াইবে? সে মাথা নত করিয়া যেমন বসিয়া ছিল, তেমনিই বসিয়া রহিল।

সতী এত সাধ্য-সাধনা করিল, উষা নড়িল না; পরাভূত হইয়া সতী চলিয়া গেল।

একটু পরেই মালতী দেবী আসিয়া দাঁড়াইলেন। উষার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে সস্নেহে বলিলেন, "ছি মা, অমন একগুঁয়েমী করতে নেই। সবাই তোমায় দেখতে চাচ্ছে। আমাদের বউ-ভাত তো নেই মা, এতেই লোকে তোমায় দেখবে। চল মা লক্ষ্মী, লজ্জা কি? আমার সঙ্গে চল, আমি তোমায় দেখিয়ে আনছি।"

টপ টপ করিয়া দুই ফোঁটা জল উষার চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল। দেখিতে পাইয়া মালতী দেবী তাহা মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "ছি মা, কাঁদছ কেন? বল লক্ষ্মী, আমায় বল, আমার কাছে কোনও কথা লুকিয়ো না।"

উষার চোখের জল শুকাইয়া গেল, একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মালতী দেবী ক্ষিপ্রহস্তে তাহার চুলটা ঠিক করিয়া দিয়া, মুখখানায়

পাউডার মাখাইয়া, ভাল করিয়া কাপড় পরাইয়া দিলেন। বধূর হাত ধরিয়া চলিতে চলিতে বলিলেন, "লক্ষ্মী মা আমার, ঘোমটা টেনো না যেন, তা হলে লোকে আমায় যা না তাই বলবে। এর পরে তুমি যা খুসি তাই কোরো, আজকার দিনটা মান রক্ষা কোরো।

অবগুণ্ঠনশূন্যা পুত্রবধূর হাত ধরিয়া তিনি হলে প্রবেশ করিলেন। সতী তখন পিয়ানোর কাছে বসিয়া তাহাতে সুর দিয়াছিল, উষাকে আসিতে দেখিয়া থামিয়া গেল।

উষাকে দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিল। ইহারি মধ্য হইতে রেখা চাপা গলায় পার্শ্ববর্ত্তিনী জনৈই বন্ধুকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "শুধু দেখতে ভাল, গুণ কিছু নেই। মৃন্ময়বাবুর কপালে গোলাপ জুটল না জুটল শিমুল ফুল। বেশী বেছে নিতে গেলে এমনিই হয় বটে।"

একটু আহত ভাবে সতী বলিল, "কিন্তু বউদির বয়েস তো বেশী নয় ভাই, আমরা শিখিয়ে পড়িয়ে দুদিনে ঠিক করে নিতে পারব। এখন তো আর সেখানে যেতে পারবে না, এখানে থেকে লেখাপড়া শিখতে হবে। বছর খানেক পরেই দেখতে পাবে, বউদিকে কি করে তৈরী করেছি। যেমন সুন্দর দেখতে, তাতে শিক্ষার যদি যোগ হয়,—দেখতে পাবে, বসরাই গোলাপ হয়ে দাঁড়াতে পারবে কি না।"

মৃন্ময়ের বন্ধু জ্যোতিষ উষার সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহাকে ভালরূপে দেখিয়া লইয়া বলিল, "একেবারেই অশিক্ষিতা কি ?"

পার্শ্বের চেয়ারখানা হইতে পরিচিত একটা কণ্ঠে উক্ত হইল "না, সে বিষয়ে আমি সাক্ষ্য দিতে পারি। তবে শিক্ষা বলতে তোমরা ইংরাজীটাই বোঝ, এরা সে শিক্ষায় শিক্ষিত নয়।"

রেখা চশমা খুলিয়া কাঁচ দুইখানা মাজিয়া চোখে দিতে দিতে হাসিয়া বলিল, "কি রকম শিক্ষা মনীশবাবু ? পল্লীগ্রামের মেয়ের শিক্ষা

দ্বিতীয়ভাগ পর্য্যন্ত. আর রান্না-ঘর-দোর পরিষ্কার করা, একেই আপনি বলতে চান ইংরাজি ছাড়া শিক্ষা।"

'মনীশ' নামটা শুনিবামাত্র উষা সচকিতে মুখ তুলিল। সত্যই তো পার্শ্বে তাহারই মনীশ-দা। এতগুলি অপরিচিত নর-নারীর মধ্যে পরিচিত এই একজনকে দেখিবামাত্র উষার প্রাণটা পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল, আনন্দাশ্রু-পূরিত নেত্রে সে মনীশ দার মুখপানে চাহিয়া রহিল। তাহার ইচ্ছা হইল, একবার মনীশ-দাকে আগেকার মতই চাপিয়া ধরে, কাঁদিয়া নিজের ব্যথা জানায়; কিন্তু তখনি মনে পড়িল, সে শ্বশুরালয়ে বধূ, এখানে তাহার একটুও স্বাধীনতা নাই।

রেখার কথায় উত্তেজিত হইয়া মনীশ বলিল, "শুধু তাই যদি আপনি পল্লীগ্রামের শিক্ষা বলে ধরেন, আমি বলি ইংরাজি শিক্ষার চেয়ে তাই ভাল। ইংরাজি ভাবটা আমাদের দেশে এসে কি লাভ হয়েছে তা জানিনে। লোকে—অর্থাৎ আমার বন্ধুর মত লোকেই বলে, ইংরাজি শিক্ষা খুব ভাল, কিন্তু আমি বলি একেবারেই খারাপ। যেহেতু আমাদের প্রকৃত যা জিনিস, তা আমরা এ শিক্ষায় হারিয়ে ফেলেছি। বাঙ্গালী—অথবা শুধু বাঙ্গালীই বা বলি কেন, ভারতবাসীর আপনার বলে গর্ব্ব করার মত জিনিস আর কি আছে, বলুন দেখি? আমরা সর্ব্বাংশে বিদেশীর অনুকরণ করতে যাই, আমাদের নিজের যা তা বিসর্জ্জন দিয়েছি। যাক্, আমি সে কথা নিয়ে বেশী আলোচনা করতে চাই নে, তাতে আমাদের এই শান্ত সান্ধ্য-সম্মিলনটায় অশান্তি এসে পড়বে। আমি আপনাদের নিশ্চিন্ত করতে এটুকু বলছি—অমরবাবু মেয়েদের ইংরাজি ছাড়া আর সব শিক্ষাই দিয়েছেন। মৃন্ময় বোধ হয় উমাকে দেখে এসেছে, তার শিক্ষা যথার্থ প্রশংসনীয়! আমি মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি—উমার মত শিক্ষা এ পর্য্যন্ত কোন মেয়েই পায় নি, উমার মত স্বভাব এ পর্য্যন্ত কোনও

মেয়েরই আমি দেখি নি। তারই বোন উষা, সেই বোনের কাছে মানুষ, সেই বাপের শিক্ষায় শিক্ষিতা, এ বাড়ীতে কালী দেয় নি। বরং আমি জানি—সে এ সংসার উজ্জল করতে পারবে।”

চকিতে উমার মূর্ত্তিটা মৃন্ময়ের মনে জাগিয়া উঠিল। সেই অনিন্দ্য-সুন্দরী নারী-মূর্ত্তি—বিবাহের রাত্রে যে এক কথায় তাহার মত লোককেও বসাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল। বিদায়ের সময় স্বামী-স্ত্রীতে যখন তাহার নিকট বিদায় লইতেছিল, কি উদাস-করণ সে মূর্ত্তিখানা। বড় বড় স্থির চোখের দৃষ্টি আকাশের কোনখানে ন্যস্ত রাখিয়া সে দাঁড়াইয়া, উষার ডাকে জ্ঞান পাইয়া তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া রুদ্ধকণ্ঠে শুধু বলিয়াছিল “যাচ্ছিস—যা ভাই। আশীর্ব্বাদ করি, সারাজন্ম যেন তোর সেখানেই কাটে, আমার মত পোড়া কপাল যেন না হয়।”

তাহার পর মৃন্ময়ের হাতখানা ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিল “দেখো ভাই—আমার জীবন তোমার হাতে দিলুম। ওকে দেখো—”

সৌন্দর্য্য তো অনেকেরই থাকে, কিন্তু অমন দীপ্ত সৌন্দর্য্য তো দেখা যায় না। পবিত্র জ্যোতিতে উমার সর্ব্বাবয়ব উদ্ভাসিত। সর্ব্বাপেক্ষা বড় সুন্দর তাহার সেই চোখ দুইটা। সেই চোখ দুইটাতেই তাহার মনোভাবটা বাহিরে প্রকাশ হইয়া যায়, সে নিজেকে গোপন করিবার চেষ্টা করিলেও গোপন থাকিতে পারে না।

সেই শুভ্র থানখানা—সেই অলঙ্কার-শূন্যতাই তাহাকে বড় চমৎকার মানাইয়াছিল। সাজ-সজ্জা প্রভৃতি অতিরিক্ত বোঝার দরকার তাহার নাই, সে বড় হালকা, বড় ক্ষীণ। মনে হয় অলঙ্কার সাজ-সজ্জা তাহার উপর চাপাইলেই সে ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

তবু মৃন্ময় তাহার অন্তরটা দেখিতে পায় নাই, শুধু বাহিরটা দেখিয়াই সে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

মনীশের কথাগুলো রেখার মনে বিলক্ষণ জ্বালা ধরাইয়া দিল। কিন্তু সে না কি উমাকে দেখে নাই, তাই চুপ করিয়া গেল ; নচেৎ সে মনীশকে বেশ দু' কথা শুনাইয়া দিতে পারিত।

সতীর কাছে সরিয়া গিয়া বলিল, "মনীশবাবুর আত্মীয় কি না—তাই অত প্রশংসা। একবার দেখ্তে পেলে হত।"

সতী শুষ্ক স্বরে বলিল, "দাদা বলেছেন—অমন সুন্দরী নাকি দেখা যায় না। তার না কি একটা গুণ আছে—যে তাকে দেখে, সেই ভালবেসে ফেলে "

পরিহাসের সুরে রেখা বলিল, "তোমার দাদা ভালবাসায় পড়েন নি তো ?"

সতী বলিল, "না। একবার দেখাতেই কি ভালবাসা জন্মায় ?"

রেখা গম্ভীর মুখে হাতের ব্রেসলেট ঘুরাইয়া দিতে দিতে বলিল, "জন্মায় বই কি। তার ঢের প্রমাণ আমি দিতে পারি। যাই হোক—সে কথা এখন থাক। আমি এই বলতে চাই, মনীশবাবু নিশ্চয়ই উমাকে ভালবাসেন। ভালবাসা যায় যাকে, লোকে তাকে সব রকমেই বাড়িয়ে তুলতে চায়। মনীশবাবুর কথার ভাবেই জানা যাচ্ছে—"

সতী বাধা দিয়া বলিল, "বেশ তো, ভাল কথাই, তিনি তাকে ভালবাসেন, না ভালবাসেন, সে কথা নিয়ে মাথা ঘামানোর কি দরকার আমাদের। সকলে গান করতে বলছেন, একটা গান করে ফেলি না।"

রেখা একটু হাসিয়া বলিল, "ঠাট্টা কেন ভাই ? যে গান জানে, তার বেশী গর্ব্ব হয় কি না ; সে তাই সহজে গান গাইতে চায় না। আমি যদি গাইতে জান্তুম, বলতেও হত না, দশটা গান গেয়ে দিতুম। বলে ফেল না একটা গান। অমন তো হাজারটা গান গেয়ে দিস তুই, আজ কি হল ?"

সতী পিয়ানোতে সুর দিল। রবিবাবুর গান গাহিতে অনুরুদ্ধ হইয়া সে গাহিল—

শুধু তোমার বাণী নয় কো বন্ধু প্রিয়,

শেষ লাইনটা—একলা পথে চলা আমার করব রমণীয়, গাহিতে গাহিতে বাস্তবিকই তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল, কণ্ঠটাও আর্দ্র হইয়া উঠিল। সে সমস্ত মন ঢালিয়া গানটী গাহিতেছিল; তাই গানটা সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল।

গান থামিয়া গেলে—রেখা চুপি চুপি সতীর কানে কানে বলিল "কে সে ভাগ্যবান নির্দ্দিষ্ট হয়েছে কি? বল তো ঘটকালি করতে রাজি আছি। একজামিনের এখনও মাস তিনেক দেরী আছে, ঘটকালী করতে এর সাতটা দিন ব্যয় করতে আমি রাজি আছি।"

সতী একটু হাসিল, উত্তর দিল না।

রাত্রে আহারাদি শেষ করিয়া যাইবার সময় মনীশ সতীকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিল, "তোমার বউদির সঙ্গে একটু দেখা করাতে পারবে কি?"

সতী বলিল, "পারব না কেন? কিন্তু দাদার কাছে বললেই তো ভাল ছিল।"

মনীশ একটু হাসিয়া বলিল, "তোমার দাদা? সে তো স্ত্রী বলেই মানতে রাজি হয় না। বললে—যখন বেশ শিক্ষিতা হবে, তখন সে তার বন্ধুদের তার কাছে নিয়ে যাবে আলাপ করাতে, এখন সে কোন মতেই কাউকে নিয়ে যাবে না; কাজেই তুমি ছাড়া আর উপায় নেই।"

যে কক্ষে উষা চুপ করিয়া বসিয়াছিল, সতী সেই কক্ষদ্বারে মনীশকে আনিয়া বলিল, "এই ঘরে বউদি আছে, যান।"

মনীশ দ্বারের উপর দাঁড়াইয়া ডাকিল. "উষা—"

"মনীশ-দা!"

উষা ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল, চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল "মনীশদা।"

মনীশ সস্নেহে তাহার ললাটের অবিন্যস্ত চুলগুলা সরাইয়া দিতে দিতে বলিল, "এই দুদিনেই রোগা হয়ে গেছিস এত ? হ্যাঁরে পাগলী, এ রকম করলে এখানে থাকবি কি করে ? জন্মটা যে তোর এখানে কাটাতে হবে।"

উষা কাঁদিয়া বলিল, "না মনীশদা, আমি থাকতে পারব না।"

মনীশ বলিল, "থাকবি নে তো কোথা যাবি ?"

উষা বলিল "বাবার কাছে থাকব।"

মনীশ রূঢ়কণ্ঠে বলিল, "তা বই কি ? একজন রয়েছে তাঁর চোখের সামনে বিধবা হয়ে, তুই গিয়ে না থাকলে চলবে কি করে ? পাগলামী করিস নে উষা, ও সব কথা মনে আনিস নে বলছি।"

উষা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "এরা আমায় আর যেতে দেবে না বলছে মনীশদা।"

মনীশ বলিল "যেতে দেবে না কি ? আমি মৃন্ময়ের ছোট বেলাকার বন্ধু, আমায় এরা খুব ভালবাসে। আমি তোকে নিয়ে যাব দিন কতক পরে। তুই কাঁদাকাটা করিস নে বলছি, যে যা বলবে তাই শুনে যাবি। আমি রোজই আসব তোকে দেখতে। যদি শুনতে পাই, এদের কথা শুনিস নি, তা হলে উমাকে গিয়ে সব বলে দেব।"

উষা বলিল, "না মনীশদা, কিছু বল না দিদিকে। আমি কাঁদব না। কিন্তু বল, তুমি আমায় রোজ দেখতে আসবে তো ?"

মনীশ হাসিয়া বলিল, "আসব রে আসব, রোজ আসব, তার জন্যে তোকে ভাবতে হবে না। তোকে না দেখলে তোর দিদির কাছে নিস্তার পাব আমি ? নিজের গরজে না এলেও তার গরজে আমায় আসতেই হবে।"

উষা তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া সজল নেত্রে শাসাইল—"যদি না এস মনীশদা, আমি কিন্তু নিশ্চয়ই দিদিকে লিখব।" মনীশ বাহির হইয়া গেল।

৭

দিন চলিয়া যাইতেছে। মাঘ মাসের মাঝামাঝি উষার বিবাহ হইয়াছে, সে মাস গেল, ফাল্গুন মাসও শেষ হইয়া আসিল; উষা আসিল না। তাহাকে আনিবার জন্য দুইবার লোক পাঠানো হইল। প্রথম তাঁহারা বেশ ভদ্রতার সঙ্গেই ফিরাইয়া দিয়াছিলেন ; দ্বিতীয়বারে স্পষ্ট বলিয়া পাঠাইলেন তাঁহারা এখন উষাকে পাঠাইবেন না ; কিছু দিন পরে তাহার শিক্ষা সমাপ্ত হইয়া গেলে পাঠাইবেন।

উমা খুব গোপনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। থাক, সেখানেই সে সুখে থাক, স্বামীর আদরিণী হইয়া সে যদি চিরজন্মও স্বামীর আলয়ে থাকে, তাহাও প্রার্থনীয়।

অমরনাথের আকারে প্রকারে কিছুই বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। দিনগুলা তাঁহার কাছে যেমন আসিতেছিল, তেমনই আসা-যাওয়া করিতে লাগিল। মনের মধ্যে কষ্ট হইলেও তিনি সেটা প্রকাশ্যে বাহির হইতে দিতে পারিলেন না।

হাত পা আছড়াইতে লাগিলেন বগলা দেবী—"তখনই বলেছিলুম অমর, ওখানে মেয়ের বিয়ে দিস নে। ওখানে মেয়ে কখনই সুখে থাকতে পারবে না, পারবে না ; তা আমার কথা শোনা হবে কেন? আমার কথায় কি ওরা প্রথমে কান দেয়? যখন কান দেয়, তখন সব শেষ হয়ে যায়। এই যে মেয়েটার বিয়ে হল, একটী দিনের জন্যে তারা আর পাঠালে না, একটীবার দেখ্‌তেও দিলে না। এতে সুখটা কি হল? ছেলেমানুষ মেয়েটারও কপালে কষ্ট, নিজেদের মনে কষ্ট।"

উমা শান্তকণ্ঠে বলিল, "কষ্ট কিসের ঠাকুর-মা? মেয়েমানুষ স্বামীর

ঘর করে, এর বেশী প্রার্থনার বিষয় ভগবানের কাছে আর কিছু নেই। না এল, নাই আস্‌বে। আমরা এই ভেবে সুখে থাকব সে শ্বশুর-ঘর করছে, স্বামীর সেবা করছে। সেও মনে ভেবে সুখে থাকবে, সে স্বামি-সেবা করতে জন্মেছে, স্বামিসেবাই করে যাচ্ছে।"

বগলা দেবী মুখখানা বাঁকাইয়া বলিলেন, "তোর কথা রাখ উমা, যদি নিজে সব জেনে উপদেশ দিতিস, তাতে বরং কাজ হতো। মেয়েদের প্রথম দু' একবার শ্বশুরবাড়ী যাওয়া কি, তা তো জানিস নে,—ভগবান তোকে এ জন্মে তেমন দিন দিলেনও না। তারা বাপ মা, ভাই বোন, ছোটবেলা হতে যাদের দেখে আসছে, তাদেরই চেনে, তাদেরই ভালবাসে। হঠাৎ একরাত্রে একটা অচেনা লোক, কস্মিন্‌কালে যাকে কখনও চোখে দেখেনি, সে এসে গোটাকত মন্ত্রের জোরে তার প্রভু হয়ে দাঁড়ায়। হঠাৎ তাকে দেখে ভালবাসা তো চুলোয় যাক, ভয়ই করে,—কোথায় নিয়ে যাবে, এই কথা ভেবে। তার পর শ্বশুরবাড়ী যে সে যাবে, সেখানেও তো সবই পর, কেউ আপনার লোকটী নেই। সেই সব অচেনা লোকের মধ্যে প্রাণটা তার কি রকম করে, বল্ দেখি? ছেলেমানুষ বউদের এই মনের কষ্টটা যারা বোঝে না—তারা কি মানুষ? একেবারে কি পোষ মানানো যায় মানুষকে? অতিরিক্ত জোর চালাতে গেলে যে তার মনটা একেবারেই বিদ্রোহী হয়ে যায়! সেই তিক্ত মন নিয়ে সে যে কাজ করে, সবই যে তিক্ত হয়ে যায়! ছেলেমানুষকে কি একেবারেই আটক করতে আছে? বিয়ে যখন হয়েছে, তখন সে পরেরই হয়ে গ্যাছে, বাপ মায়ের তার উপরে আর কোন দাবী দাওয়াই থাকতে পারে না। এইটেই না বড় কষ্টের কথা যে, ছেলেমানুষ বউটার পানে তাকাতে অনেক শ্বশুর-বাড়ীর লোকই উদাসীন হয়।"

উমা একটু নীরব থাকিয়া বলিল "এমনি তো সবারই হয়ে থাকে

ঠাকুর-মা। লোকে এটা জানে, জেনে-শুনেও কেন এমন করে? সবারই তো মেয়ে হয়, ব্যথাটা সবাই পায়,—তারা তবে বোঝে না কেন ?"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ঠাকুর-মা বলিলেন, "কেন বোঝে না, তার উত্তর আমি কি দেব দিদি ? তার উত্তর তাদের কাছেই পাবে।"

উমা আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

নিজের গৃহে প্রবেশ করিয়া অনাবশ্যক সে এটা ওটা নাড়াচাড়া করিতে লাগিল,—কি করিবে তাহা মোটে ঠিক করিতে পারিতেছিল না। মনের মধ্যে ঠাকুর মায়ের কথাগুলো ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, সে কথাগুলোকে সে কোনও মতে হৃদয় হইতে তাড়াইতে পারিতেছিল না।

অমরনাথের কক্ষ হইতে তাঁহার আহ্বান শুনা গেল—"উমা !"

"যাই বাবা।"

তাড়াতাড়ি সে বাহির হইল। আজ দু' তিন দিন অমরনাথের শরীরটা তত ভাল যাইতেছিল না, সেজন্য তিনি গৃহেই ছিলেন।

অমরনাথ দুখানা পত্র উমার হাতে দিয়া বলিলেন "এই পত্র দুখানা পড়তো মা।"

একখানা পত্র ঊষা লিখিয়াছে। বেশী কথা সে কিছুই লিখিতে পারে নাই, নিজের শারীরিক অবস্থার কথা জানাইয়া সে এখানকার সকলের কুশল চাহিয়াছে।

অপর পত্রখানার খাম ছিঁড়িয়া ফেলিয়া উমা আগেই উল্টাইয়া দেখিল, সেখানা মনীশ লিখিয়াছে। সে গুড্-ফ্রাইডের ছুটিতে আসিবে, আসিয়া ঊষার কথা সব জানাইবে। ঊষা বেশ ভালই আছে, তবে একটু রোগা হইয়া গিয়াছে। প্রথম দুই তিন দিন কাঁদিয়াছিল, আর কাঁদে না। মনীশকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছে; সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য মনীশকে

প্রত্যহই তাহাদের বাড়ী যাইতে হয়,—এটীর ব্যতিক্রম করিবার যো কিছুতেই নাই।

পত্রখানা পড়িয়া উমা আশ্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল"মনীশদা আছেন সেখানে, তা হলে বিশেষ কোনও ভাবনার কারণ নেই, না বাবা?"

অমরনাথ একটু হাসিয়া বলিলেন, "ভাবনার কারণ থাকলেই বা কি হত উমা, ভেবেই বা কি করতে পারতুম। মেয়ে যখন দান করেছি, তখন তার ওপরে আমাদের কি অধিকার আছে? ভাববার অধিকারটুকু আছে বটে, কিন্তু সেটা জ্বালা কেবল বাড়ায়, কমাতে পারে না। মনীশ আছে বলে একটু সান্ত্বনা যে, সে তার বাপের বাড়ীর একটা চিহ্ন দেখ্‌তে পাচ্ছে। পত্রে আর কিছু লেখা আছে কি মা?"

উমা আবার পড়িল—মনীশ লিখিয়াছে উষাকে তাহারা এখন পাঠাইবে না। সে উষাকে পাঠানোর সম্বন্ধে বলায় উষার শাশুড়ী বলিয়াছেন, এখন কিছু দিন তাঁহারা পাঠাইবেন না। আর সে পল্লীগ্রামে পাঠাইতেও তাঁহাদের কাহারও ইচ্ছা নাই। তাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা শিখাইয়া পড়াইয়া যেটুকু শিক্ষিতা করিতে পারিবেন, পল্লীগ্রামের সেই সব কুসংস্কারের মধ্যে গিয়া পড়িলে তাহার সে শিক্ষা সবই দূর হইয়া যাইবে, সে আবার কতকগুলা কুসংস্কারের বোঝা মাথায় লইয়া আসিবে। উষার পিত্রালয়ের দাসীটিকে তাঁহারা বিদায় দিতেছেন, কারণ, সে থাকিলে উষার শিক্ষা হয় না, সে কেবল তাহার কাছেই পড়িয়া থাকে। তাঁহারা ইচ্ছা করেন, সেখানকার আর কোনও লোক অযাচিত ভাবে আসিয়া উষার মনকে কাঁচাইয়া না দেয়। তাঁহারা জানেন, এ ভিত এখন পাকা নহে, কাঁচা,— বাপের বাড়ীর ধাক্কা আসিলেই এ ইমারত ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তবে অমরনাথ নিজে যদি দেখা করিতে আসেন, তিনিই নিশ্চয়ই তাঁহার কন্যার সহিত দেখা করিতে পারিবেন।

অমরনাথের ললাটে দুই তিনটী রেখা ফুটিয়া উঠিল, তিনি অধর দংশন করিলেন, পরক্ষণে একটু হাসিলেন।

উমা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "হাসলে যে বাবা। উষার এ বন্দিনীত্ব শুনে তোমার মনে একটুও কষ্ট হল না ?"

অমরনাথ শান্তস্বরে বলিলেন "দুঃখ ? কি লাভ মা দুঃখ করে ? আমরা দুঃখ করলেই যদি কাজ হতো, তবে তো ভাবনাই থাকত না। সংসারে এসে হেরে যাব কি বারেবারেই, একবারও কি দুঃখকে জয় করতে পারব না; প্রত্যেকবারই তাকে বিজেতার আসন দিয়ে তার পায়ের তলায় পড়ে থাকব ? সে আমাদের দলবে পিষবে, আমরা কেবলই কাঁদব ?"

উমা পত্রখানার উপর দৃষ্টি রাখিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার মলিন মুখখানার উপরে দৃষ্টি রাখিয়া অমরনাথ বলিলেন "এত মলিন হয়ে পড়লে মা ? সুখ দুঃখ যদি তোমায় তাদের মতে চলতে বাধ্য করে, তবে তুমি যথার্থ মানুষ হবে কি করে ? যথার্থ মানুষ সেই—যে সুখ দুঃখকে সমান ভাবে বরণ করে নিতে পারে। যখন সুখ আসবে তখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে অগ্রসর হয়ে তাকে সম্বর্দ্ধনা করে নেবে, যখন দুঃখ আসবে তখন তার দিকে চেয়ে মাটীতে লুটিয়ে পড়ে চীৎকার করবে—না না, আমি তো এ চাই নি, তবে কেন এল ? হ্যাঁ, মা, আমরা কি এ ইচ্ছা প্রবৃত্তি দমন করতে পারি নে ? সুখ দুঃখ, এ ত আসবেই মা। সুখের পরে দুঃখ, দুঃখের পর সুখ ঘুরছে, এ আসবেই। আর এ কি দুঃখ মা ? সামান্য একটুতেই যদি এতটা বিহ্বল হয়ে পড়, এর পর দাঁড়াবে কি করে ?"

উমা কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল "তোমার মত জ্ঞান যদি পেতুম বাবা, তবে তো যথার্থ একটা মানুষ হয়ে যেতুম। আমরা যে মেয়েমানুষ বাবা, অল্পেতেই আমাদের ঘা লাগে বেশী যে।"

অমরনাথ বলিলেন "তা আমি জানি মা। মেয়েদের মনটা স্বভাবতঃই ভারী নরম ; কারণ, তারা জগতে এসেছে শুধু ভালবাসতে। আমি তোমায় তো অন্য মেয়ের মত শিক্ষা দিই নি উমা, তবে তোমার মনটাই বা কেন তাদের মত হবে ? তুমি ভালবাসতে এসেছ, কিন্তু তাতে আপনার সর্ব্বস্ব ভাসিয়ে দিতে ত এস নি।"

উমা একটু হাসিল, বলিল "সেটা আমিও ভাবি বাবা। কিন্তু তুমি যতই শিক্ষা দাও, তবু তোমাদের মত দৃঢ়-চিত্ত আমাদের কখনই হবে না। তোমাদের পথে আমরা চলতে যাব বাবা. কিন্তু তোমাদের মত একেবারেই চলে যেতে পারব না,—নানা দিককার আকর্ষণ আসবেই। মেয়েকে পুরুষ প্রকৃতি দেওয়া চলবেই না। কখন না কখনও তার ভেতরের নারী শক্তি বেরিয়ে পড়বেই। তার দৃষ্টান্ত ঢের রয়েছে বাবা। ঢের পড়েছি, নিজের মন দিয়েও বুঝে দেখেছি। মনে ভাবি, কে কার, কেউ তো আমার না, আমি নিজেই যখন আমার নই, তখন পরের জন্যে ভাবতে যাই কেন ? মনকে খুব শক্ত করে আনি, কিন্তু কোথা হতে একটা কথা মনে ভেসে ওঠে, আমি আত্মহারা হয়ে যাই ; তার কথা ভাবতে আমার চোখ ভরে জল আসে।"

অমরনাথ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া খানিকটা চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন "কলকাতায় কিছুদিনের জন্যে যাবে মা ?"

উমা বলিল "কেন বাবা, ঊষাকে দেখতে ?"

অমরনাথ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "না,তার শ্বশুর,শাশুড়ী, স্বামী—সবাই যখন তার বাপের বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়িয়ে তাকে নিতে চান, আমরাই বা কেন সম্পর্ক রাখতে যাব ? জেনে সুখী থাক—সে ভাল আছে, সে সভ্য সংসারে গ্যাছে, কুসংস্কারীদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক এক দিন সে নিজেই রাখতে চাইবে না, এক দিন আমাদের দেখেই সে সরে দাঁড়াবে।"

উমা মাথা নাড়িয়া বলিল, "না বাবা, তা কখনও হতে পারে?"

উত্তেজিত কণ্ঠে অমরনাথ বলিলেন, "ঠিক হতে পারে। অনেক শিক্ষিত যুবক যে সভ্যতা দেখে মুগ্ধ হয়, সে বালিকা তাতে ভুলবে না, এও কি কথা হতে পারে? এই বিজাতীয় শিক্ষায় সার বস্তু কিছু নেই মা, কিন্তু বাহ্যিক চাকচিক্য এমন যে, লোকে দেখেই মুগ্ধ হয়ে যায়; আর তা পাবার জন্যে লালায়িত হয়। উষার কথা ছেড়ে দাও। যখন তাকে দেখবে—যে রূপে পাঠিয়ে দিয়েছ, সে রূপে আর তাকে দেখতে পাবে না, নূতন রূপে দেখতে পাবে।"

উমা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল।

অমরনাথ চুপ করিয়া শুইয়া পড়িয়া উমার কথা ভাবিতে লাগিলেন।

এই মেয়েটীর প্রকৃতি অন্য মেয়েদের হইতে অনেকটা পৃথক। সাধারণের চেয়ে সে অনেক বেশী জ্ঞান এই বয়সেই লাভ করিয়াছিল। তর্ক তাহার সহিত চলিত না,—একটা কথাতেই সে প্রতিপক্ষকে নীরব করিয়া দিত। কিন্তু উমা পিতার কাছে আসিলে ছোটবেলাকার মতই জ্ঞানহীনা হইয়া যাইত। পিতার কথার উপরে একটা কথাও সে কহিতে পারিত না। পিতা যাহা বলিতেন, সে নীরবে মাথা পাতিয়া তাহাই গ্রহণ করিত।

উমার মন জানিতে অমরনাথের বাকী ছিল না। তাহার মনখানা শুভ্র যূঁই ফুলটীর মত পবিত্র, বড় সরল,—দেবতার পায়ে উৎসর্গ করিয়া দিবার মত জিনিস। সংসারের কোনও ছলনা, কুটিলতা উমার মনে স্থান পায় না। তাহার সহিত লজ্জাবতী লতার তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। সংসারের পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে গেলেই সে সঙ্কুচিতা হইয়া মাটীতে মিশাইবে। অমরনাথ উমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাহাকে কোনও জটিলতার মাঝে তিনি টানিতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

উমার বড় স্নেহপ্রবণ হৃদয়। সে জগতে সবাইকে বড় ভালবাসে। কেহই তাহার চোখ এড়াইয়া যাইতে পারে না। সে নিজেকে দূর্ব্বার চেয়েও নত বলিয়া মনে করে। সকলের নীচে সে তাহার আসন স্থির করিয়া লইয়াছিল। জগৎকে ভালবাসিয়া, স্নেহ করিয়া সে প্রাণে বড়ই শান্তি লাভ করিয়াছিল।

বহুদিনকার অতীত একটা কথা তাঁহার মনে পড়িল,—উমার বিবাহের কথা। আবার কি তাহার বিবাহ দেওয়া যায় না ?

কথাটা মনে করিতে বেদনাও বুকে বাজে, আবার আরামও বোধ হয়। তাঁহার উমা জগতের উপর হইতে এই ছড়ানো ভালবাসা গুটাইয়া আনিয়া একটীতেই অর্পণ করিবে, তাঁহার চেয়েও তাহাকে ভালবাসিবে, এ কল্পনা যেন অসহ্য বলিয়াই ঠেকে। কিন্তু উমা সুখী হইবে, উমা আনন্দ পাইবে, এই কথাটা ভাবিতেও হৃদয় পুলকে ভরিয়া উঠে। উমা স্বামীর স্ত্রী হইবে, সন্তানের মা হইবে, তাহার নারীজন্ম সার্থক হইবে।

স্বামীর স্ত্রী হওয়া, সন্তানের মা হওয়া কোন্ নারীর আকাঙ্ক্ষিত নয় ? উমার মনের মধ্যে অতি গোপনে কি এই আকাঙ্ক্ষাটা জাগিয়া নাই ? সে সংসারের কি বুঝিয়াছে ? অতি শিশুকালেই সে যে বিধবা হইয়াছে, সধবা বা বিধবা—ইহার কি জানে সে ? লোকাচারের বশবর্ত্তিনী হইয়া সে চলিতেছে মাত্র। এ লোকাচারের বেড়া ভাঙ্গিয়া তাহাকে মুক্ত করা স্নেহময় পিতার কার্য্য, আর কাহারও নহে।

শিশু যে কচি মুখে হাসিয়া মা বলিয়া ডাকে, সেই মা ডাকটী শুনিতে সকল নারীই চায়। কারণ জগতে নারীর পূর্ণ বিকাশ জননীতে,—আর কিছুতেই কোনও রূপে সে নিজের বিকাশ এরূপ ভাবে করিতে পারে না।

অমরনাথ দু হাতের উপর মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন। উমার সংস্কার ত্যাগ করানো যাইবে তো ? তা যাইবে বৈ কি। তাহার নিজের

মধ্যে একটা যে অভাব লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া বুভুক্ষুর ন্যায় বসিয়া আছে, তাহাকে দলিয়া ফেলিতে সে সংস্কারের বোঝা বহন করিতেছে। সংস্কারবশে সে আপত্তি করিবে, কিন্তু আপনিই নিজের ভাল বুঝিয়া সম্মত হইবে।

আর সমাজ ?

উষার বিবাহের পূর্ব্বে উমার বিবাহ দিবার কল্পনা একবার তাঁহার মাথায় আসিয়াছিল, সমাজের কথাটাও সেই সঙ্গে তাঁহার মনে পড়িয়াছিল।

সমাজ ? সমাজ তাঁহার কে ? সমাজের পানে চাহিয়া তিনি জীবন-সর্ব্বস্ব কন্যার কষ্ট সহ্য করিবেন কেন ? সমাজ তাঁহাকে কি দিয়াছে, ভবিষ্যতে কি দিতে পারিবে ? সমাজের জন্য নিজেকে সকল রকমে হতভাগ্য করিয়া রাখিতে তিনি কিছুতেই প্রস্তুত নহেন।

মনীশ গুড-ফ্রাইডের ছুটিতে আসিবে লিখিয়াছে। সে আসিলে, তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া দেখা যাইবে, সে কি বলে। সে শিক্ষিত, কলিকাতাতেই থাকে, পল্লীর সমাজের সহিত অতটা সম্পর্ক রাখে না। এ সব কাজে তাহার উৎসাহ খুব, রীতিমত সে যুক্তি দিয়া বিরুদ্ধ মতকে হার মানাইতে পারে।

মনীশের প্রতীক্ষায় অমরনাথ দিন গণিতে লাগিলেন। সেই দিনই তাহাকে একখানা পত্র দিলেন,—গুড্-ফ্রাইডের ছুটিতে সে আসিবে বলিয়াছে, আসা চাই-ই ; কারণ, তাঁহার বিশেষ দরকার।

৮

গুড্-ফ্রাইডের ছুটিতে সকাল বেলাই মনীশ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সঙ্গে তাহার বন্ধু প্রভাস আসিয়াছিল।

প্রভাস বড়লোকের ছেলে, মনীশের সহিত একত্র কলেজে পড়িয়াছিল। এক সঙ্গেই দুজনে এম-এ পাশ করিয়াছিল। মনীশ তাহার পর প্রফেসর হইয়াছিল, প্রভাস বেড়াইয়া বেড়াইতেছিল। মনীশ এ জন্য তাহাকে অনেক কথা শুনাইয়া দিত; কারণ, বসিয়া থাকা সে মোটেই পছন্দ করিত না। তাহার নিজের গৃহে অভাব ছিল না, বসিয়া থাকিতে সেও বেশ পারিত। কিন্তু বেকার বসিয়া থাকা তাহার মত চঞ্চল প্রকৃতির লোকের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ ছিল। প্রভাস তাহার তিরস্কার কানেও তুলিল না; কারণ কাজ করাকে সে অত্যন্ত ডরাইত। নানা দেশ বেড়াইয়া সে যতটা আনন্দ লাভ করিত, এত আনন্দ আর কিছুতেই সে পাইত না।

অনেক দিন হইতেই সে মনীশের এই আত্মীয়টির কথা শুনিয়া আসিতেছে, কিন্তু এখানে আসিবার আগ্রহ কখনই তাহার হয় নাই। বাংলার পল্লীর সম্বন্ধে সে একেবারেই উদাসীন ছিল;—দেখিবার মত যে কিছু থাকিতে পারে, এ ধারণা সে কখনও করে নাই।

ধরিতে গেলে মনীশ এবার তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়াছে। শিকারের প্রলোভনও যথেষ্ট দেখাইয়াছে, এবং দুইটা দিন পরেই সে কলিকাতায় ফিরিতে পারিবে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।

মনীশের সঙ্গে অমরনাথের সম্পর্ক অনেকটা দূর ছিল। তাহা সত্ত্বেও এতটা নিকট ভাব যে ছিল, তাহার কারণ, মনীশের পিতা অমরনাথের

বন্ধু ছিলেন। বন্ধু বলিতে আমরা যেরূপ বুঝি, মনীশের পিতা যতীশ বাবু অমরনাথের সেরূপ বন্ধু ছিলেন না। তিনি অমরনাথকে ভাইয়ের মত ভালবাসিতেন, স্নেহ করিতেন, অমরনাথও তাঁহাকে ভালবাসিতেন, ভক্তি করিতেন। যতীশবাবু যখন মারা যান, তখন পুত্র মনীশকে দেখিবার জন্য অমরনাথকে বার বার বলিয়া গিয়াছিলেন।

সংসারে ছিলেন মনীশের মা ও একটী ভাই দানীশ। মনীশ মা ও ভাইকে নিজের কাছে লইয়া গিয়াছিল; তাহার পিতার যে জমীদারি ছিল, তাহা অমরনাথ দেখাশুনা করিতেন। মনীশ জমীদারির কিছুই বুঝিত না, কিন্তু মা সব বুঝিতেন। অমরনাথ বৎসরান্তে একবার কলিকাতায় গিয়া তাঁহাকে হিসাব-নিকাশ দিয়া আসিতেন। উমাও একবার দুইবার গঙ্গাস্নান উপলক্ষে কলিকাতায় মনীশের বাসায় গিয়াছিল।

অমরনাথ তখন প্রভাত-ভ্রমণ শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন, পথেই মনীশ ও প্রভাসের সহিত তাঁহার দেখা হইয়া গেল।

সহাস্যে মনীশের পিঠ চাপড়াইয়া তিনি বলিলেন, "এই যে তুমি এসেছ, আমি ভেবেছিলুম দুপুরের ট্রেণে আসবে। এটী কে?"

মনীশ প্রণাম করিল, দেখাদেখি প্রভাসও কোন মতে প্রণামটা সারিয়া মনীশের পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। মনীশ বলিল, "আমার একটী বন্ধু, যশোরের একটী জমীদার, গোবিন্দপুরের নাম শুনেছেন বোধ হয়—"

অমরনাথ হাসি মুখে বলিলেন "বিলক্ষণ শুনেছি। এস, বাড়ী যাওয়া যাক্। উমাকে আগে খবর দিতে না পারলে, সে কিছুই ঠিক করতে পারবে না, আজকাল বাড়ীর গিন্নি যে আমার উমা মা,—পিসীমা সব ছেড়ে দিয়ে কাশী যাচ্ছেন।"

তিনি অগ্রসর হইলেন। প্রভাস মনীশের পাশে পাশে চলিতে চলিতে বলিল, "মৃন্ময়ের শ্বশুর না?"

মনীশ উত্তর করিল, "হ্যাঁ। মৃন্ময়ের অদৃষ্ট—সে এমন রত্ন চিনতে পারেনি, কাচ ভেবে অগ্রাহ্য করছে। কিন্তু এ ভুল তার শোধরাতেই হবে, সে দিন মানতেই হবে সে যথার্থ হীরা পেয়েছিল।"

প্রভাসকে অমরনাথের কাছে বসাইয়া মনীশ বলিল, "উমাকে আমিই গিয়ে খবর দিচ্ছি, আপনাকে যেতে হবে না কাকা। আপনি ততক্ষণ প্রভাসের সঙ্গে গল্প করুন।"

সে যে হঠাৎ গিয়া উমাকে বিস্ময়ে চমকিত করিয়া তুলিতে চায়, তাহা বুঝিয়া অমরনাথ হাসিলেন, বলিলেন, "বেশ তো, যাও।"

পা টিপিয়া টিপিয়া মনীশ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

পূজার ঘরের সামনেই উমা। সে পূজা সারিয়া তখন বাহির হইতেছিল। তাহার সিক্ত কেশ-দাম আলুলায়িত ভাবে পৃষ্ঠে লুটাইতেছে। গরদের কাপড় তাহার পরনে। মাথায় সামান্য একটু কাপড়, গলে তখনও অঞ্চল বেষ্টিত। দুই ভ্রূর মাঝখানে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা, ঈষল্লাল মুখখানার মধ্যে স্পষ্ট ফুটিয়া আছে। ললাটে প্রণামের চিহ্ন ধূলা তখনও বিদ্যমান।

মনীশ মুগ্ধ নেত্রে তাহার সেই অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানার পানে একটীবার চাহিয়াই চোখ নামাইল, তখনি একটা বড় গোছের শব্দ করিয়া ঝুপ করিয়া তাহার সামনে গিয়া পড়িল।

চমকাইয়া উমা এক পা পিছনে সরিয়া গেল। মুহূর্ত্ত পরেই হাসিয়া বলিল, "তাই তো বলি, মনিদা ভিন্ন এমন করে ভয় দেখাতে পারবে কে ?"

মনীশ হাসিয়া উঠিল, "আর কেউ নেই ?"

উমা বলিল, "আর একজন ছিল, সে তো এখানে নেই মনিদা, শ্বশুরবাড়ী গ্যাছে। এখন তুমি বই আর কে ভয় দেখাবে ?"

মনীশ বলিল, "আমি কি দাঁড়িয়েই থাকব না কি ? বসবার একটা

যায়গা-টায়গা—কিছুই তো দেবে না দেখছি। তবে এইখানেই বসে পড়া যাক।”

সে ক্ষিপ্রহস্তে একখানি তক্তা টানিয়া লইয়া বসিতে যাইতেছিল, উমা শশব্যস্তে বলিল, “বাঃ, তুমি তো এই এসে দাঁড়ালে মাত্র। চল ঘরে বসবে।”

উমা ক্ষিপ্রপদে গিয়া গৃহের দ্বার খুলিয়া দিল, মনীশ গৃহে প্রবেশ করিয়া তক্তাপোষের উপর বসিয়া পড়িল। একটু হাসিয়া বলিল, “কিন্তু উমা, আমি ট্রেনে এসেছি, কত জাতকে ছুঁয়ে এসেছি তার ঠিক নেই। তোমার বিছানাটা যদিও গুঠানো রয়েছে, তবুও ছোঁয়া গেল। হয় তো এতে তোমার অনেকটা কষ্ট হবে আবার ঐগুলো কাচতে।”

সঙ্কুচিতা উমা বলিল, “কাচব কেন, বাঃ। তুমি তো বেশ কথা বল মনিদা। আমার মধ্যে ওই স্পৃশ্যাস্পৃশ্য ভাবটা মোটেই নেই, তা জেনে রেখো। মানুষ মাত্রই আমার কাছে সমান, এর মধ্যে জাত-বিচার করা চলে না, কাউকে ঘৃণা করে তফাৎ রাখাও চলে না। তুমিও যা, আমিও তাই, বাহ্যিক স্নান করলেই কি সব ময়লা কেটে যায় মনিদা, আমি তো তা বিশ্বাস করিনে। আমি জানি, মন পরিষ্কার থাকলেই হল, দেহ পরিষ্কার হোক বা নাই হোক।”

মনীশ হাসিমুখে মাথা দুলাইয়া বলিল, “আর আমার মন যদি অপরিষ্কার থাকে উমা—”

উমা বলিল, “সে তুমি জানো মনিদা, আমি তোমার মনের খবর কি করে পাব? আমি জানছি, আমার মধ্যেও যে ভগবান আত্মারূপে বিরাজ করছেন, তোমার মধ্যেও সেই ভগবান আত্মারূপে বিরাজ করছেন। গঙ্গাজলে যে সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হয়, ময়লাধোয়া ড্রেনের জলেও সেই সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হয়। জগতে কিছুই ঘৃণ্য নয় মনিদা, সবই পূজ্য। তুমিও যাই হও, আমি তোমায় চিরকালই প্রণাম করব।”

কথাটা শেষ করিবার সঙ্গেসঙ্গেই উমা নত হইয়া নিমেষে মনীশের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল,—এত তাড়াতাড়ি, যে, মনীশ বাধা দিতেও পারিল না। মনীশের মুখখানা বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তখনি সে ভাব সামলাইয়া সে শুধু হাসিল মাত্র।

বিছানাটার ভিতর হইতে একটা বালিশ টানিয়া লইয়া বেশ আরামে কাত হইয়া পড়িয়া সে বলিল, "তবে আর কি! বিনা সঙ্কোচেই এখানে শুয়ে পড়া যাক। কাল রাতটায় মোটেই ঘুম হয় নি, ভারি ঘুম আসছে।"

উমা বলিল "তা তুমি ঘুমাও, আমি ততক্ষণ তোমার খাবারের জোগাড় করে দিয়ে আসি।"

সে পা তুলিতেই মনীশ উঠিয়া বসিল "বিলক্ষণ, আমি একা বসে থাকি এই ঘরের মধ্যে? আমার এক বন্ধু এসেছে সঙ্গে, তার কাছে তবে যাওয়া যাক। সে বেচারা এতক্ষণ কি ভাবছে। ভাবছে—তাকে আমি নিয়ে এসে কোথায় ফেলে অন্তর্দ্ধান হলুম।"

উমা বলিল "তোমার বন্ধু এসেছেন—এখানে?"

মনীশ বলিল "হ্যাঁ, বেচারা শিকার করতে এই পাড়াগাঁয়ে এসেছে।"

উমা পূর্ব্বেই মনীশের এই অভিন্নহৃদয় বন্ধুটীর খুঁটিনাটি সব কথাই মনীশের কাছে অবগত হইয়াছিল। তাই একটু হাসিয়া বলিল, "তবে তাঁকে একা ফেলে রেখে আসা তোমার ভারী অন্যায় হয়েছে মনিদা। তুমি তো আমাদের ঘরের ছেলে, এ তো তোমার ঘর বাড়ী। তিনি যখন অতিথি হয়ে এসেছেন, তাঁর সম্বর্দ্ধনাটা তোমাকেই ভালো করে করতে হবে। বাবা কি তোমাদের মত কলকাতার বাবুদের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন?"

মনীশ গম্ভীর হইয়া বলিল "ওই দেখ, মেয়েরা যে কথা বলে, তার মধ্যে কাঁটা থাকবেই। আমায় শুদ্ধ জড়াচ্ছো কেন উমা, আমি কি দোষ

করেছি ? ছুটি পেলেই চলে আসি এই পাড়াগাঁয়ে। যদি ঘৃণা করতুম, তা হলে কি আসতুম ?”

উমা বলিল, “ওটা ভুল বেরিয়ে গ্যাছে মনিদা ! আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না তোমাকে এ অপবাদটার মধ্যে জড়িয়ে ফেলতে। যাক্, তোমায় আর বেশীক্ষণ আটকে রাখব না, তোমার বন্ধু ওদিকে চোখ কপালে তুলছেন। আমারও ঢের কাজ আছে, তোমাদের খাওয়া দাওয়া দেখতে হবে, আমাদের দু'জনের রান্না আছে—”

মনীশ বিস্ময়ের স্বরে বলিল, “তুমি রাঁধবে ?”

উমা হাসিয়া বলিল, “কেন রাঁধতে নেই না কি ?”

মনীশ বলিল “তা বলছিনে, আগে তো ঠাকুরমাই ওদিককার সব দেখাশুনা করতেন।”

উমা বলিল, “ঠাকুরমা চিরকালই করবেন ? যত দিন জ্ঞান ছিল না, তত দিন বাধ্য হয়ে তাঁর সেবা নিতে হয়েছে। কিন্তু আমরা এখন বড় হয়েছি, জ্ঞান হয়েছে, এখনও কি তাঁকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেব ? আমার যা কর্ত্তব্য কাজ, আমি এখন তাই করছি, তিনি এখন বিশ্রাম করুন।”

উমা চলিয়া গেল।

মনীশ চুপ করিয়া খানিকটা শুইয়া রহিল, তাহার পর উঠিয়া পড়িল। টেবিলের উপর একখানা বই পড়িয়াছিল, সেখানা টানিয়া লইয়া দেখিল—গীতা। প্রথম পৃষ্ঠা উল্টাইতেই উমার হাতের লেখা—“তুমি যাহা করাইবে আমি তাহাই করিব। অতএব হে প্রভু, তুমি আমার সকল ভার গ্রহণ কর।”

একান্ত অনুগত ভক্তের কথাই এ। মনীশ নিষ্পলক নেত্রে সেই লেখাটার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বইখানা টেবিলে নামাইয়া রাখিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে বসিয়াই মনীশ জলখাবার তৈল ইত্যাদি সবই দাসী-ভৃত্যের হাতে পাইল। সে প্রভাসকে বলিল, "যাই বল, এমন নিপুণ শিক্ষা কাকার, যে, মেয়েগুলি ঠিক তেমনি হয়েছে যেমনটী আশা করেছিলেন। যে যেখানেই আসুক, উমার চোখ এড়িয়ে যাবে না। সে যেটী ভালবাসে, উমা ঠিক তাই করবে। আমি এই জন্যেই উমাকে বড্ড ভালবাসি, স্নেহ করি।"

স্নান সারিয়া সে একবার বাড়ী মধ্যে প্রবেশ করিল। উমা তখন নিজের ও ঠাকুরমায়ের জন্য রাঁধিতেছিল! চৈত্রমাসের অসহ্য গ্রীষ্ম, তাহার উপর অগ্নির উত্তাপ, উমার স্বভাবতঃ ঈষৎ আরক্ত মুখখানা গাঢ় আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল ; ললাট হইতে ঘর্ম্মধারা পড়িতেছিল।

মনীশকে দেখিয়া সে বলিল, "এই যে মনিদা, তোমাদের স্নান হয়ে গ্যাছে দেখ্ছি। বামুন ঠাকরুণকে বলি তবে ভাত বাড়তে ?"

সে হাত ধুইয়া বাহির হইয়া ভাত বাড়িতে আদেশ দিয়া ফিরিয়া আসিল। মনীশ তখন সেই গৃহের দ্বারের কাছে একখানা পিঁড়ি টানিয়া লইয়া বসিয়া উনানে কাঠখানা ঠেলিয়া দিতেছিল। বাতাসে একরাশি ধোঁয়া তাহার নাকে চোখে লাগিতেই, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া নাক মুখ ডলিতে লাগিল।

উমা হাসিয়া বলিল, "যার কাজ তারে সাজে মনিদা! এ সব কাজ কি তোমাদের ? যার যা কাজ সে তাই করবে, বিপরীত করতে গেলেই এমনি হবে।"

মনীশ বলিল "তা বই কি ? আমি বুঝি এ সব কাজ পারি নে, তাই ভাবছ ?"

উমা বলিল "তা তো চোখে দেখতেই পাচ্ছি। মুখখানা কি রকম লাল হয়ে উঠেছে একবার আয়নাখানা দিয়ে দেখে এসো তো।"

মনীশ ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "অপদার্থ আমি নই উমা, অপদার্থ বলতে পার বরং প্রভাসকে ; সেটা কোন কাজেরই না, একটু বেশী হাঁটলে হাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু আমি শুধু ছেলে পড়াতেই যে পারি তা নয়,—যার যখন অসুখ বিসুখ হয় তখন তো আমাকেই সব করতে হয়। দানীশ কিছুই জানে না, বাধ্য হয়ে আমাকেই তখন কোনও ক্রমে রেঁধে খেতে হয়।"

উমা কষ্টে গম্ভীর হইয়া বলিল "যারা কৃপণ তাদের অমনিই হয়ে থাকে।"

মনীশ উত্তেজিত হইয়া বলিল, "কৃপণ কিসে ?"

উমা বলিল "কৃপণ নও ? মাসে দুশো আড়াইশো টাকা মাইনে পাও প্রফেসারী করে, জমিদারী থেকে খাজনাও পাও বড় কম নয়, তবু একটা বামুন রাখ্‌তে পার না। লোকে তোমায় কৃপণ বলবে না তো কি দাতাকর্ণ বলবে না কি ?"

কথাটা শেষ করিয়াই উমা হাসিয়া ফেলিল, আর সে গম্ভীরতা বজায় রাখিতে পারিল না।

মনীশ বলিল, "বলবে না তা জানি, কিন্তু যদি আসল কারণটা জানতে পারে, তবে মাঝামাঝি যায়গাতেই রাখ্‌বে, দাতা বলে স্বর্গেও উঠাবে না, কৃপণ বলে নরকেও ফেলবে না।"

উমা তরকারী নামাইতে নামাইতে বলিল "কারণটা কি ?"

মনীশ বলিল "কারণটা—আমি আর কারও হাতে খেতে নারাজ। বিশেষ সহরে যে সব বামুন-বামনী পাওয়া যায়, তাদের চরিত্র প্রায়ই ভাল নয়। সেই সব অসৎ চরিত্র লোকদের হাতে খেয়ে অনর্থক শরীরটাকে খারাপ করতে চাই নে। নিজের লোক যদি কেউ থাকে, রেঁধে দেয় খাব, না হয় নিজের হাতে রেঁধে খাব সেও ভাল। এমন কিছু বেশী কষ্টের কাজ নয় এটা, ইচ্ছে করলে সবাই পারে। কিন্তু সহরে গিয়ে বাবু হয়ে

লে ন্নাঘরের দিকে পর্য্যন্ত যায় না, পাছে ধোঁয়া লেগে অসুখ করে। কিন্তু ই রান্নাঘরই যে আমাদের জীবন, তারা সেটা বুঝতে চায় না। যে রাঁধে সে কি রকম ভাবে রাঁধে, এটা আগে দেখা উচিত। তার স্বাস্থ্য কেমন, তার কোনও সংক্রামক ব্যারাম আছে কি না, তার খোঁজ নেওয়া উচিত। আমি সেই সব জন্যেই বামুন ঠাকুর, বামুন ঠাকরুণ কাউকেই রাঁধবার কাজে রাখ্‌তে চাই নে।"

উমা বলিল, "তা জেঠিমা যে চিরকালই তোমায় রেঁধে খাওয়াবেন, এমন কোনও মানে নাই। তিনিও তো বুড়ো হয়েছেন, কতদিন আর এ জোয়াল ঘাড়ে করে রাখবেন? তুমি একটী বিয়ে কর না মনিদা, সব আপদ চুকে যাবে। এ সময় মাকে বসিয়ে রাখাই কর্ত্তব্য। এই বুড়ো হয়েছেন, এখনও কি সংসার নিয়ে জড়িয়ে থাকবেন?"

মনীশ পরিহাসের সুরে বলিল, "বউ এসে রেঁধে খাওয়াবে, না?"

উমা বিস্ফারিত চোখে বলিল, "রাঁধবে না?"

মনীশ বলিল "রক্ষা কর। সে কাজ করা তো চুলোয় যাক, বউকে বোলো তো একটু রান্নাঘরে যেতে কি একখানা কাজ করতে, রান্নাঘরে গেলেই তার মান গেল, তা বুঝি জানো না? বাবু হবে যে—অর্থাৎ যার দু পয়সা আছে, তাকে যেমন করেই হোক বামুন রাখতেই হবে। নচেৎ বাবু যে হওয়া যায় না। আমি তো এই পাড়াগাঁয়ে এসে বাস করব না যে বউ এখানকার শিক্ষা নেবে? সহরে থাকবে সে, কাজেই সহরের চালে চলবে।"

উমা বলিল, "তা কোনও পাড়াগাঁয়ের মেয়ে নিলেই হয়। উষার সঙ্গে বাবা যখন তোমার বিয়ে দেবার কথা বললেন—"

ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া মনীশ বলিল "ছিঃ, তা কখনো হতে পারে উমা? সেই উষা—যাকে চিরটা কাল কোলে পিঠে করেছি, যে আমার নিজের

বোনের মতই, তার সঙ্গে বিয়ে? স্বপ্নেও যা ভাবা যায় না, বাস্তবিক তা কি হতে পারে? নাঃ, ও সব আমার দ্বারা হবে না। বিয়ে যদি করবার হোতো, অনেক দিন আগেই করতুম।”

উমা বিস্ময়ে বলিল, “বিয়ে করবে না?”

মনীশ হাসিয়া বলিল, “নাঃ।”

উমা বলিল, “দেখা যাবে। চল এখন, যায়গা হয়ে গ্যাছে, ভাত বাড়াও হয়ে গ্যাছে। বাবাকে আর তোমার বন্ধুকে ডাকতে পাঠাই।”

দালানে যায়গা করা হইয়াছিল। অমরনাথ প্রভাসকে লইয়া মনীশকে ডাকিয়া আহারে বসিলেন।

উমাকে উদ্দেশ করিয়া অমরনাথ বলিলেন “তোমার তরকারী নিয়ে এসো মা, নইলে আমার খাওয়া হবে না, মনীশও যেমন তোমার ভাই, প্রভাসও তেমনি।”

উমা নত মুখে পিতার আদেশে আসিয়া নিজের তরকারী পরিবেশন করিয়া গেল।

অমরনাথ একটু হাসিয়া প্রভাসের পানে চাহিয়া বলিলেন, “তোমার খাওয়ার বড় কষ্ট হচ্ছে বাবা। মনীশের তবু অভ্যাস আছে, সে মাছ মাংস না হলেও বেশ খেতে পারে, কিন্তু তুমি—”

লাজুক প্রভাস হাসিয়া বলিল “না, কিছু কষ্ট হচ্ছে না, এ রকম তরকারী আমি কখনও খাই নি; তাই নিরামিষাহারীকে অপদার্থ বলেই ভাবতুম। এখন দেখছি আমিষের চেয়ে নিরামিষ জিনিসটাই লাগে খুব ভাল।”

বাস্তবিক সে একটু তরকারীও উঠিবার সময় পাতে ফেলিয়া উঠে নাই।

৯

সন্ধ্যার সময় ত্রিতলের খোলা ছাদে অমরনাথ বসিয়া ছিলেন। সেই সময় প্রভাস ও মনীশ বৈকালিক ভ্রমণ শেষ করিয়া একেবারে তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। অমরনাথ মনীশকে পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছিলেন, সন্ধ্যাবেলা তিনি ছাদে থাকিবেন, মনীশ বেড়াইয়া আসিয়া যেন সেখানেই যায়, তাহার সহিত কথা আছে। প্রভাসকেও তিনি আসিতে বলিয়াছিলেন। তাই মনীশ তাহাকে লইয়া উপরে উঠিল।

শুক্লা চতুর্দ্দশীর রাত্রি, আকাশে পূর্ণ চন্দ্র হাসিতেছে। মাঝে মাঝে নীলাকাশের গায় ভাসিয়া দুই এক খণ্ড ছোট শুভ্র মেঘ চাঁদের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। ছাদের পূর্ব্ববর্ত্তী একটা আমগাছের পাতার আড়ালে গা লুকাইয়া একটা পাপিয়া ডাকিতেছিল, দূর হইতে আর একটা পাপিয়া তাহার ডাকের উত্তর দিতেছিল। নীচে পিছন দিকে গঙ্গার বুকে গ্রাম্য যুবকেরা পান্‌সী ভাসাইয়া গান গাইয়া যাইতেছিল—

তুমি স্নিগ্ধ যেমন চাঁদিমা কিরণ জ্যোছনা মাখা নিশায়—

মনীশ ও প্রভাসের পদশব্দ কানে আসিতেই অমরনাথ উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন "এসো, এই মাদুরটার উপরে বস।"

উমা ছাদের একটি পাশে চুপ করিয়া বসিয়া নদীর নীরব উজ্জল সৌন্দর্য্য দেখিতেছিল। পিতার আহ্বান শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া প্রভাস ও মনীশকে দেখিয়া নীচে চলিয়া গেল।

প্রভাস জুতা খুলিয়া বসিয়া পড়িল, মনীশ জুতা খুলিতে খুলিতে বলিল "আজ প্রভাস বেচারা বড্ড হাঁফিয়ে পড়েছে। অনেক দূর ঘুরিয়ে এনেছি ওকে। শেষে বলে—আর না, আর বেড়াব না, চল ফেরা যাক।"

অমরনাথ হাসি মুখে বলিলেন "এখানে আর কি-ই বা দেখবে প্রভাস, কেবল বন আর বন। দেশের লোক অর্দ্ধেক চলে গ্যাছে কলকাতায়, দেশে আর কয়জন লোক আছে!"

প্রভাস বলিল "কেন, অনেক লোকই তো আছে দেখলুম।"

অমরনাথ বলিলেন, "আরও ছিল। এরা সবও চলে যেত, কারণ পেটে না খেতে পেলে মানুষ দেশের মায়া কাটাবেই। আমি কেবল দেশের পানে তাকিয়ে দেশ ছেড়ে যাই নি। কারণ, জানছি, আমি যদি চলে যাই, সব লোকই দেশ-ছাড়া হবে। নূতন এক একটা কাজ করাচ্ছি যাতে ওরাও অর্থ পাচ্ছে, আমারও লাভ হচ্ছে। একটা ফ্যাক্টরী করবার ইচ্ছে আছে, যোগাড়ও করেছি। এতে অনেক লোকের জীবিকার্জ্জনও হতে পারবে অথচ আমারও ক্ষতি হবে না। আমার সঙ্গেই প্রজার সম্পর্ক। আমি এমন কাজ করব, যাতে ওদেরও লাভ হয়, আমারও লাভ হয়। তা হলে দেশের যা তা দেশেই থাকবে। দেশের মায়া আমার বড় বেশী, দেশটাকে আমি কোন মতেই ত্যাগ করতে পারিনে।"

প্রভাস একটু নীরব থাকিয়া বলিল "দেখে এলুম যা তাতে খুব ভালই বোধ হয়। আপনার প্রজাদের অবস্থা বেশ উন্নত।"

অমরনাথ বলিলেন "উন্নত করতে হয়েছে অনেক শিক্ষা দিয়ে। ওদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ যাই ঘটুক না কেন, আমি সেটা আদালতে গড়াতে দিই নে, নিজেই দুই পক্ষের মত নিয়ে মিটিয়ে দিই, এতে অনেকগুলো টাকা বেঁচে যায়। এই যে পায়ের তলে মাটী, এ তারা অনর্থক ফেলে রাখতে চায় না, একহাত মাটীতেও তারা উপযুক্ত ফসল তুলে নেবে। এতে লাভ হয় এই, কিছু কিনতে হয় না,—যার ঘরে যা হয় সে তা প্রচুর রূপেই ভোগ করতে পারে। এখানকার গরুদের চেহারা দেখ, এরা দুধও দেয় তেমনি। এতে শিশুদের ছোট বেলা হতে

বার্লি, সাগু, এরারুট দিতে হয় না, তারা মায়ের দুধ যেমন প্রচুর পরিমাণে পাচ্ছে, গরুর দুধও তেমনি পাচ্ছে, এতে তাদের চেহারা বেশ হৃষ্ট পুষ্ট। জ্ঞানের জন্যে স্কুল করেছি, শুধু দৈহিক উন্নতিতেই শেষ করিনি! গ্রামের মেয়েরা আমার বাড়ীতে এসে উমার কাছ হতে পড়া জেনে নেয়, নানারকম শিক্ষালাভ করে। আমি দেখছি বাহিরে, উমা দেখছে অন্তঃপুরে। সংসারে সুগৃহিণী হওয়া, সুমাতা হওয়া, এ সব শিক্ষা দিচ্ছে উমা। উমার অনেক ছাত্রীর বিয়ে হয়েছে। শ্বশুর বাড়ী গিয়ে তারা উমার প্রদত্ত শিক্ষার সদ্ব্যবহার করছে।"

মনীশ বলিল, "আপনি ঠিক জেনেছেন বলেই করতে পারছেন। ধরুন, আমার মত লোক যদি হয় তবে—"

একটু হাসিয়া অমরনাথ বলিলেন "তবে আর কি—যেমন সচরাচর হয়ে আসছে তেমনই হ'ত, তার বেশী একটুও কিছু হ'ত না। সেটাতে তোমার ভাল হ'ত না মন্দ হ'ত, আমি তাই জিজ্ঞাসা করি।"

মনীশ আর কথা কহিল না, মুখ নত করিয়া হাসিতে লাগিল।

অমরনাথ বলিলেন, "আমি তোমায় ডেকেছিলুম মনীশ, একটা বিশেষ দরকার ছিল। আমি—"

তিনি একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। মনীশ বলিল "প্রভাসের সামনে কোনও কথা লুকোবার নেই। ও কি একটা মানুষ? আমি তো বলি, ও মানুষ নামের বাহিরে—"

প্রভাস কৃত্রিম ক্রোধে বলিল "শুনবেন না ওর কথা, মনীশটা ভারী মিথ্যাবাদী।"

অমরনাথ হাসিয়া বলিলেন, "না—না, ওর কথা আমি কানেও তুলি নে। যাই হোক, আমার কথাটা আমি আগেই সেরে ফেলি, এখনি হয়

তো আবার উমা এসে পড়বে। তার সামনে এ সব কথা এখন বলতে আমি রাজি নই।”

মনীশ বলিল, “উমা এখন সন্ধ্যা করতে গ্যাছে, এখন সে আস্‌ছে না।”

অমরনাথ কণ্ঠস্বর নরম করিয়া বলিলেন, “আমি উমার আবার বিয়ে দিতে চাই, এতে তোমার মত কি? যদি বল হতে পারে না, তার কারণ আমায় দেখাও।”

“উমার বিবাহ!” মনীশ যেন চমকাইয়া উঠিল, বিস্ফারিত নেত্রে অমরনাথের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

দৃঢ়কণ্ঠে অমরনাথ বলিলেন, “হ্যাঁ, উমার বিয়ে। কথাটা কি এত ভয়ানক, মনীশ, যে, তুমি একেবারে চম্‌কে উঠলে? কই, আমার কাছে তো এ রকম ভয়ানক বলে ঠেকছে না,—মনে হচ্ছে খুবই সহজ, সরল কথা এটা, কাজটাও বেশ সহজ।”

মনীশ বলিল “সেটা হতে পারে। আপনি অনেক দিন হতে বোধ হয় কথাটা ভেবে আসছেন, তাই আপনার কাছে এ কথাটা বিশেষ জটিল বলে ঠেকছে না। কিন্তু আমি কখনও এ কথাটা ভাবতে পারি নি, তাই হঠাৎ শুনেই আমি চমকে উঠেছি। আমার মনে হচ্ছে, এটাকে আপনি যত সহজ, সরল বলে ভাবছেন, এ কখনই তত সহজ সরল হবে না। এর মধ্যে জটিলতা খুব বেশী রকম রয়েছে, যাতে এটা একেবারে অসম্ভব বলেই বোধ হয়।”

অমরনাথ বলিলেন, “অসম্ভব হবে কিসে? শাস্ত্রে বিধবা বিয়ের উল্লেখ আছে, আমাদের দেশে এ রকম বিয়ে কয়েকটা হয়েও গ্যাছে। সমাজ আমার কি করবে, প্রথমটায় একটু চোখ রাঙাবে, কিন্তু আমি তাতে ভয় পাই নে। সমাজ বড়, না আমার উমা বড়, এই কথা যদি

জিজ্ঞাসা করতে চাও, তবে আমি বলব, সমাজের চেয়ে আমার উমা বড়। উমার সুখের জন্য আমি সমাজের কাছ হতে দূরে গিয়েও বেশ থাকতে পারব।"

মনীশ বলিল "বুঝলুম তা। কিন্তু তা হলে আপনাকে হিন্দু ছাড়া ভাবেই কাজ করতে হয়,—আপনার স্ব-শ্রেণীর মধ্যে কেউ বিয়ে করতে চাইবে না। উষার যে রকম বিয়ে দিয়েছেন, উমারও তেমনি দিতে হবে।"

অমরনাথ বলিলেন "তাই দেব।"

মনীশ এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল, "কিন্তু উমা? উমা কি এতে মত দেবে? সে তো ছেলেমানুষ নয় যে, তাকে যা বলবেন, সে তাই শুনবে? তার নিজের বলে একটা যে মত আছে, সেটা বোধ হয় জানেন,—সেই মতে সে যদি আপনার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে?"

অমরনাথ অন্যমনস্ক ভাবে "তাই তো ভাবছি।"

মনীশের কণ্ঠ একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিল; সে বলিল, "আমি ঠিক বলছি, সে আপনার এ প্রস্তাবে কখনই রাজি হবে না। আপনি তাকে যে চিনতে পারেন নি, এই ভেবেই আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি। আপনারই কাছে মানুষ সে, আপনি তাকে যে শিক্ষা দিয়েছেন সেই শিক্ষাই সে পেয়েছে; আপনি তো তাকে বিলাসের অনুযায়ী শিক্ষা দেন নি, তাকে যে সংযম শিক্ষা দিয়েছেন। তাকে তো কোনও একটী বস্তুকে নির্দ্দেশ করে ভালবাসতে শিক্ষা দেন নি, তাকে যে জগৎকে ভালবাসা শিক্ষা দিয়াছেন। এখন কি সে আপনার সেই জগৎ-বিক্ষিপ্ত ভালবাসাকে গুটিয়ে এনে একটির ওপরে ন্যস্ত করতে পারবে?"

চিন্তিত মুখে অমরনাথ বলিলেন "আমি তো তাই ভাবছি।"

মনীশ বলিল "ভাবছেন, জানছেন সবই, তবে কেন আবার এই

গর্হিত কাজটা করতে যাচ্ছেন? যদি উমা তেমনি মেয়ে হত, তবুও আপনি এ ভাবনাটা ভাবতে পারতেন না। বিধবা আমাদের সমাজে বরাবর দেবীর আসনই পেয়েছেন, তাঁকে টেনে এনে আবার সংসারের পাপপঙ্কে নিমজ্জিত করা বড় সাংঘাতিক কথা।”

অমরনাথ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, “মানছি মনীশ, তোমার ঐ কথা আমি মেনে নিচ্ছি যে বিধবা দেবী, তিনি সংসারের চেয়ে অনেক উঁচুতে। কিন্তু বিধবা—সেও মানুষ তো। আমাদের মতই তার আহার নিদ্রা, তার ভাবনা চিন্তা, সবই। বিধবা হবার সঙ্গে সঙ্গে সে আপনার যা কিছু সব পুড়িয়ে ফেলে দেবী হতে পারে না। তার মনের মধ্যেও কামনা আছে, বাসনা আছে, সে আমাদের ভয়েই প্রাণপণে তা সংযত রাখতে চায়। আমাদের পানে চেয়ে সে নিজের সুখকে বিসর্জ্জন দেয়। তার পানে চাওয়া আমাদের উচিত না অনুচিত? আমাদের কি উচিত নয়, তার বুভুক্ষু, তৃষ্ণাতুর হৃদয়কে শান্ত করা? আমরা এতই স্বার্থপর যে শুধু নিই, দিতে জানিনে, অথচ দেওয়াটা কিছু কঠিন কাজ নয়। এই যে উমা, এর বুকের মধ্যে কি একটু কামনা জেগে নেই, এ কি যথার্থই আপনার সবটা বিসর্জ্জন দিতে পেরেছে? আমরা স্বার্থপর, তাই ওদের স্বার্থত্যাগটা শুধু দেখে যাই, প্রাণ দিয়ে অনুভব করতে পারিনে। প্রাণ দিয়ে যদি অনুভব করতে পারতুম, তবে তাদের এ কষ্ট আমরা দূর করবার চেষ্টা করতুম।”

মনীশ চুপ করিয়া চন্দ্রকরোজ্জ্বল নদীবক্ষ পানে চাহিয়া রহিল। উমার বিবাহ—কথাটা তাহার হৃদয়কে অত্যন্ত আঘাত দিয়াছিল। উমাকে সে যথার্থই দেবীর আসন দিয়াছিল, উমাকে সে ভক্তি করিত, ভালবাসিত। সে উমার সহিত হাসি-ঠাট্টা করিলেও, বেশ জানিত, উমা পৃথিবীর নহে,—উমার দেহ রক্তমাংসে গঠিত হইলেও, উমার মধ্যে যে আছে, সে পৃথিবী

ছাড়া। উমাকে সে কোনও ক্রমে কাহারও সহিত তুলনা করিতে পারিত না,—বরাবর তাহাকে অতি ঊর্দ্ধে দেখিয়াই আসিয়াছে। সেই উমার মনে সংসারের কামনা-বাসনা, সেই উমার মনও ক্লেদ ছাড়া নয়? তবে জগতে বিশ্বাস করা যায় কাকে?

অমরনাথ বলিলেন "চুপ করে রইলে যে মনীশ? তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে, তা ছাড়া বন্ধুর ছেলে তুমি, আমিও তোমায় নিজের ছেলের মত দেখি। তুমি শিক্ষিত, দেশের মধ্যে গণনীয় একটা লোক, আমি তাই তোমার একটা মত জানতে চাচ্ছি। অবশ্য তোমার অমত হলেও যে আমি পেছিয়ে যাব তা নয়, এ আমি করবই, উমাকে আমি সুখী করবই। তবু তোমার মতটা জানতে চাচ্ছি—"

মনীশ বিশুষ্ক মুখে বলিল "মত? আমার মত কিছু নেই কাকা, আপনি আপনার ইচ্ছামত কাজ করতে পারেন, আমি তাতে স্পষ্ট কিছুই বলতে পারব না।"

অমরনাথ বলিলেন, "এতে জানা যাচ্ছে, তোমার মত নেই।"

মনীশ বলিল "প্রকৃত কথা বলতে গেলে তাই বটে। দেখুন, পাশ্চাত্য শিক্ষাতেই আমরা মানুষ হয়েছি, অনেক সভ্য সমাজেও বেড়িয়েছি, তাদের মধ্যে স্বামী মর্‌লে একটা কেন, দশটা বিয়েও করতে পারে; কিন্তু সুখী তো কই কাউকে দেখিনি। আপনি যাকে সুখ বলতে চাচ্ছেন, আমি জানি সে সুখ নয়, সুখের নামে অসীম দুঃখই মাত্র। যদি ভোগ বলতে চান, সুখ বলতে চান, তবে তা ত্যাগের মধ্যে দিয়েই পাওয়া যায়। ত্যাগে যে তৃপ্তির সুখ, বিধবা ব্রহ্মচারিণী সেইটেই হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে। আপনি এ কথা এখানে কেন—অন্য সমাজেও আমায় বলতে দিন, আমি বলে আসব, আমি তর্ক করব। আপনাকে শুধু বলব মাত্র, আমি যে আদর্শ মনের মধ্যে গড়ে রেখেছি, সে আদর্শকে খাটো করে ফেলা

আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আমার মাও বিধবা, তিনিও তো ইচ্ছা করলে—"

অমরনাথ বাধা দিয়া বলিলেন, "তোমার ভুল হচ্ছে মনীশ, তুমি যে ধরণের কথা বলছ, আমি সে কথা বলছি নে। তুমি যে কথা বলছ, তাতে বুঝাচ্ছে, যে-কোনও বিধবার বিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এটা যেন সমাজ-সংস্কারকের কথা। বিধবা বিয়ের মধ্যে দিয়ে সমাজের সংস্কার আমি তো চাচ্ছিনে। আমি দেখছি আমার মেয়ের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য। সুখ দুঃখ এ কথাও আমি ধরছিনে; আমি দেখছি, নারীর জীবনের অভাবটা।"

মনীশ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আপনার কর্ত্তব্য আপনি করে যান, এতে কারু মতামত নেবেন না। আমার কথার ঠিক নেই, মাথারও ঠিক নেই। বিশেষ এ সব সাংসারিক কাজে দক্ষতা আমার মোটেই নেই। আমি জানি ঠিক সময়টায় খেতে, আর কলেজে গিয়ে ছেলে পড়াতে। কে রাখে অত সংসারের খবর, নারীর অভাবের অভিযোগ, সামাজিক কথা?"

সে উঠিয়া ছাদের ধারে পাদচারণা করিতে লাগিল।

অমরনাথ প্রভাসের পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন "বাস্তবিকই, একটু বুদ্ধি হল না মনীশের। এত বড় হয়েছে, এখনও ছেলেখেলা নিয়ে দিন কাটাতে চায়, তা পেলে আর কিছু দরকার নেই। সাংসারিক জ্ঞানও যে একটু দরকার, সেটা ওর ধারণাই নেই।"

প্রভাস একটু হাসিল, বলিল "মনীশ আবার আমাকেই অপদার্থ বলে। আমি দেখছি, আপনি ঠিক কাজই করছেন। আট বছরের বিধবা মেয়ে, কি জানে সে, স্বচ্ছন্দে তার আবার বিয়ে দেওয়া চলে।"

অমরনাথ গম্ভীরমুখে বলিলেন "নিশ্চয়ই চলে। আচ্ছা, তুমিই বল প্রভাস, আমি যে কথাগুলো বলছি, তা কি অযথার্থ? সন্তানবতী বিধবার কথা ছেড়ে দিই,—সন্তানহীনা যে বিধবা, আমি তার কথা বলছি। সত্যিই

তার মনটা প্রথমেই সে উঁচু তারে বাঁধতে পারে না, লুব্ধ মনটা তার জগতের পানে পড়েই থাকে, তার অন্তরটা তখন হাহাকার করে কাঁদে - ”

উৎসাহিত প্রভাস বলিল “তার পর একাদশী প্রভৃতি—”

বাধা দিয়া অমরনাথ বলিলেন, “নিশ্চয়ই। এতে যে আমরা তাদের ওপরে কতটা অত্যাচার করি, তা আর বলা যায় না। সংসারের সব দরজা আমরা নিজেদের হাতেই বন্ধ করে দিই। কিন্তু ব্যভিচারিতার প্রশ্রয়ই এতে দেওয়া হয়ে থাকে। তাদের বড় করতে গিয়ে আমরা ছোটই করে ফেলি।”

ঘুরিয়া আসিয়া মনীশ অমরনাথের সম্মুখে দাঁড়াইল। চন্দ্রালোকে তাহার সুদীর্ঘ সটান দেহটাকে আরও উন্নত দেখাইতেছিল। সে বলিল, “এ কথাটা যে বলছেন, এ আমি ঠিক মেনে নিচ্ছি। কারণ, ব্যভিচারিতার প্রশ্রয় এই সব তরুণী বিধবাদের আমরাই দিয়ে থাকি। আমি একে একে কারণগুলো দেখাবার চেষ্টা করছি। প্রথম, কিছুকাল আগে আমাদের দেশে বিধবার সংখ্যা এত বেশী ছিল না। আর থাকলেও অল্প-বয়স্কা বিধবা খুবই কম দেখা যেত। অর্থাৎ সেকালে লোকেরা স্বাস্থ্য-চিন্তায় উদাসীন ছিল না, স্বাস্থ্যটা তারা আগে দেখত। ধর্ম্ম বলুন, দেবপূজা বলুন, যত রকম ক্রিয়া কর্ম্ম বলুন, এ সবই স্বাস্থ্যের অনুকূলে ছিল। এ সব নিয়ে লোকে বাঁচতও বেশী দিন। আজকালকার মত অল্পায়ু হয়ে কুড়ি বাইশ বছরের মধ্যেই ভবের খেলা সাঙ্গ করত না। আগেকার লোকের মনের বল, দেহের বল কল্পনা করুন, আর এখনকার লোকের চেহারা দেখুন। শুধু আহারের অভাব নয়, এরা নিজেরা নিজেদের সর্ব্বনাশ করে। তাতে মরণ শীঘ্রই এগিয়ে আসে। যে কয়টা দিন বাঁচে, কেবল যন্ত্রণাই সহ্য করে যায়। দেশের ছেলেদের পানে তাকান, কি রকম চেহারা দেখতে পাবেন।

স্বাস্থ্যযুক্ত একটী ছেলেকে বার করুন দেখি। এরা বাইরের জাঁকজমক করে, কিন্তু ভেতরটা একবারেই ভুয়ো হয়ে রয়েছে। অনেকের এমন কদর্য্য অভ্যাস থাকে—সে কথা আমি বলতে চাইনে—যাতে সন্তান না হওয়ায় আবার বিয়ে করে, কিন্তু কিছুই হয় না। লাভের মধ্যে আয়ুকে এরা নিজেরাই শেষ করে আনে। ধর্ম্ম-বিশ্বাস নেই—লোকের চরিত্র-দোষ যথেষ্ট ঘটেছে। নানা রকমে মৃত্যুসংখ্যা বেড়েই চলেছে। তাই আমাদের দেশে তরুণী বিধবার সংখ্যা এত বেশী। ব্যভিচারিতা কতটা বিস্তৃতি লাভ করেছে, একবার ভেবে দেখুন দেখি। এতে শরীর স্বাস্থ্য কয় দিন ভাল থাকবে? আমরা বাইরের দিক দেখছি, কিন্তু ভেতর দেখতে যে একেবারেই উদাসীন। আমরা বাইরের উন্নতি করছি, স্বাস্থ্যের উন্নতি, চরিত্রের উন্নতি এ দেখছি কি? এ দেখতে যে ধর্ম্মে বিশ্বাস রাখা দরকার, সেই ধর্ম্মই যে নেই আমাদের। তবে আমাদের থামিয়ে রাখবে কে? এই সব অসচ্চরিত্র স্বাস্থ্যহীনদের বিয়েও তো হচ্ছে। কয়জন লোক আছে, যে, ছেলের স্বাস্থ্য চরিত্র দেখে মেয়ের বিয়ে দেয়? এরই ফলে মেয়ে যে এক দিন বিধবা হবে—এ কথাটা তারা ভাবে না। সেই অপরিণামদর্শিতার ফল এই তো দেখা যাচ্ছে—তরুণী বিধবার মলিন মুখ। আমি অস্বীকার করছি নে যে, তার হৃদয়ের সাধ আহ্লাদ সবই যায় না, সব থেকে যায়,—সেগুলো কোথায় যাবে তাকে ছেড়ে? আমিও তাদের দুঃখ অনুভব করি বুক দিয়ে, আমারও চোখ ফেটে জল বেরোয়। আমিও বলি, ভগবান এই মেয়েটীর কি পাপে এ দণ্ডলাভ? কিন্তু পাপ মেয়ের নয়, পাপ মেয়ের বাপের। সে শুধু জামাইয়ের বাইরের দিক দেখে, তার স্বাস্থ্যের কোনও খবর রাখে না। যদি স্বাস্থ্যের খোঁজ আগে নিয়ে মেয়ে দিত, তবে তো মেয়ে অকালে বিধবা হতো না। আবার এও বলি, দোষ মেয়ের বাপেরই বা কি? সে হয় তো ধনী নয়। অথবা ধনী হলেই বা

কি করবে, সৎচরিত্রতা যে আমাদের দেশের যুবকদের মধ্য হতে চলে গ্যাছে। শিশুকাল হতে তারা নিজেদের নষ্টের পথে চালিত করে আস্‌ছে। ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি তারা মাথায় তুলে নিয়েছে, কিন্তু স্বাস্থ্য চরিত্র এ দুটোর পানে তাকাতে একেবারেই উদাসীন। শিক্ষার বোঝা বহন করছে, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা তাদের নেই। তারা সংযম জানে না, সকল বিষয়েই তারা অসংযমী। আমাদের দেশের যুবকেরা স্বেচ্ছায় অল্পায়ু হচ্ছে, স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছে। তারা যাচ্ছে, তাদের কাজ শেষে করে যাচ্ছে। কিন্তু পেছনে যে ফেলে রেখে গেল একটী নারীকে—কেবল ব্যর্থতাই বুকের মাঝে জাগিয়ে তুলেছে, সেটা তখন ভাবলেই না। অথবা মরবার সময়ও ভেবে যেতে পারে না, কেন যাচ্ছে তারা। অথবা ভগবানের ওপরেই দোষ চাপিয়ে যায়,—যেন ভগবানই তাদের জোর করে নিয়ে যাচ্ছেন গলায় হাত দিয়ে। তার পর এই সব তরুণী বিধবার কর্ত্তব্য। আপনি বলছেন, এদের সব দরজা আমরাই বন্ধ করছি ; এতে এরাই বা ব্যভিচারিতা দোষ হতে নিস্তার পাবে কেন ? কথাটা যথার্থ বলে গণ্য হতে পারে। কিন্তু আমরা তাদের কোনও দরজা বন্ধ করব কেন ? বরং বলুন, তাদের আরও কাছে টেনে নেব, তাদের শিক্ষা দেব। তাদের মনে এমন ভাব দিতে হবে, যেন তারা কিছুতেই অপবিত্র না হতে পারে, যেন তারা নিজেদের খুব মহান্ বলেই ভেবে নিতে পারে। তাদের কানে এই মন্ত্র দিতে হবে—তারা কিছুতেই মন্দ হতে পারবে না, তারা সৎ, তারা ভগবানের এক একটী আদেশ রূপেই জগতে এসেছে। ভগবানের আদেশ জগতের হিত কামনা বয়ে আনে, অহিত তাদের দ্বারা কখনই হতে পারে না। বিধবাকে দূরে রাখা—তাকে যথার্থ দেবীর মত কেবল পূজা করে যাওয়া—আমি তা চাই নে। কারণ, কাছে এনে কাজের মধ্যে না দিলে, সে ঠিক থাকতে পারবে না। বিধবার যোগ্য সম্মান আমরা দেব না কেন ?

আমরা তাদের হৃদয় মার্জ্জিত করব, তাদের হৃদয়ে জ্ঞান দেব, যাতে তারা বুঝবে তারা মাটী নয়, আগুনের ফুলকি। এ আগুনে ঘর বাড়ী পুড়িয়ে দেবে না, সামনের পথই দেখিয়ে দেবে। তবে—আপনাকে এই কথাটাই বলে যাচ্ছি আমি, তাদের আমরাই অসংযমী করছি এটা ঠিক, এই কথাই বলবেন। কিন্তু তারা নিজে নিজেই যে সংযম হারায়, এ কথা বলবেন না। মানুষকে গড়ে তোলা মানুষের হাত। আমাকে আপনি বানর গড়ালেও পারতেন, কিন্তু তা গড়ান নি। উমাকে আপনি এত দিন সংযম শিক্ষাই দিয়ে এসেছেন, এখন তাকে সুখের বদলে দুঃখই দিতে যাচ্ছেন, আমার তো এই ধারণা। অনেক কথা বললুম কাকা, রাগ করবেন না। উমার সম্বন্ধে আপনার যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, আমার কোনও কথা বলবেন না।"

দ্রুতপদে সে নীচে নামিয়া গেল।

অমরনাথ আর একটা কথাও বলিলেন না। প্রভাস আর একটু গম্ভীর ভাবে বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া পড়িল।

১০

সেই দিন রাত্রি হইতেই মনীশ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিল। উমা জিজ্ঞাসা করিল, "হঠাৎ এত গম্ভীর হয়ে পড়লে যে মনীশ-দা, ব্যাপারখানা কি? কলকাতার জন্যে মন কেমন করছে, না?"

মনীশ গম্ভীর মুখে বলিল "তাই।"

উমা সপরিহাসে বলিল, "আজকাল মনীশদা একেবারে কলকাতার বাবু হয়ে পড়েছ। তবে মনীশদা, কাল সে কথা বলতেই অতটা রাগ করেছিলে কেন? মনের কথাটা টেনে বের করে ফেলেছিলুম কি না, তাই। তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি।"

মনীশ এ খোঁচাটাও সহিয়া গেল, একটাও উত্তর করিল না। কে জানে, কথা বলিতে গেলেই তাহার মনের ভিতরকার চাপা আগুনটা হয় তো বাহির হইয়া পড়িবে। উমাকে সে কেন সে আভাস দিবে?

প্রভাস ও মনীশ একটা গৃহে শয়ন করিত। প্রভাস বিছানায় বসিয়া পাখাখানা নাড়িতে নাড়িতে বলিল "যাই বল, কলকাতার চেয়ে পাড়াগাঁটা লাগে ভাল। বেশ ঠাণ্ডা যায়গাটা। কলকাতায় এ সময় টেঁকাই ভার। অসহ্য গরমও বটে, আর সাদা বাড়ীগুলো রোদের তাতে ঝলসে ওঠে চোখের সামনে, যাতে বেরুতেই ইচ্ছে হয় না।"

ছোট একটা হুঁ' দিয়া মনীশ নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িল। কাল বিছানায় শুইয়া পড়িয়াও অনর্গল বকিয়া গিয়াছিল সে—রাত বারটা পর্য্যন্ত বেচারা প্রভাস কাল ঘুমাইতে পায় নাই। আজ মনীশ আর একটীও কথা কহে না। কথায় এদিকে প্রভাসের কণ্ঠ পর্য্যন্ত ভরিয়া উঠিয়াছিল।

আজিকার ব্যাপারখানা কোনখানে গিয়া দাঁড়াইবে, মনীশের সহিত কথা কহিয়া সে সেইটাই বুঝিতে চায়।

প্রভাস খানিক চুপ করিয়া মনীশের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "তোমার কাকা সত্যিই তা হলে মেয়ের আবার বিয়ে দেবেন?"

মনীশ একটু উগ্র ভাবে বলিল, "তা দিন না, তাতে ক্ষতি কি? সত্যিই তিনি বাপ, মেয়ের কথা তিনি যত জানেন, আমি ততটা কি জানি? আমি পর বই তো নই। ছোট বেলা হতে ওঁর কাছে মানুষ হয়েছি, এইমাত্র সম্পর্ক। এমন সব গোপনীয় কথা থাকতে পারে, যা আমাকে জানানো ওঁরা অপমানের বলেই জ্ঞান করতে পারেন।"

এই কথাটা বলিতেও মনীশের হৃদয়খানা বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু যথার্থ কথাই যে এটা। সত্যকে এখনও খুঁজিয়া পায় নাই, মিথ্যা লইয়া থাকিতেও আর তাহার ইচ্ছা হইতেছিল না। অমরনাথের নিকট এ সত্য আবিষ্কার করা বড় সহজ নয়, কিন্তু উমার কাছে পারিলেও পারা যায়। উমা যতবার তাহার নিকটে আসিয়াছে, ততবারই তাহার বুকে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। একবার সে ভাবিয়াও ছিল, উমার সেই মৃণালের মত হাত দুখানা বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া, সে তাহাকে একটা প্রকাণ্ড ঝাঁকানি দেয়, যাহাতে তাহার মনের সত্য ভাবটা মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। একবার সে জিজ্ঞাসা করে—বল নারী, কি তোমার কামনা, কি তুমি চাও? তোমার ওই সুকুমার বুকে কি দুর্দ্দমনীয় বাসনারাসি জাগিয়া আছে—একবার তাহা জানাও মনীশকে।

কিন্তু সে পারে নাই। সে সত্য কথা যদি সত্যই উমার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়ে, মনীশের কল্পনা যে একেবারেই ছাই হইয়া যাইবে। মনীশ সম্মুখে বীভৎসতার জ্বলন্ত ছবি দেখিয়া কিছুতেই আত্ম সংবরণ করিতে পারিবে না। না, সে সত্য গোপনে থাক, চিরকালই গোপনে থাক,—

মনীশ সে সত্যকে পাইতে চায় না। মনীশ পলাইবে, উমার সম্মুখে কিছুতেই তিষ্ঠাইতে পারিবে না।

উমা, এই দেবী, ইহার মনেও এই কলঙ্কিত কামনা? মনীশ যে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। না করিলেই বা চলে কই? বিশ্বাস যে সামনে, তাহাকে এড়াইয়া চলা তো কোন ক্রমেই চলে না।

তবে—নারীর মধ্যে লক্ষ্য করিবার জিনিস কিছুই নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, নারী কেবল পাইতে চায়, কিছু দিতে চায় না। যত দাও, সে বলিবে না—আর চাই না। এই ভিক্ষাবৃত্তি—এ তবে সকল নারীর বুকে সমভাবে বর্ত্তমান আছে?

উমার সে দেবীর মত মুখ, সরল হাসি, সরল কথা, কিন্তু বুকের মধ্যে পোষণ করিতেছে সে প্রবল তৃষ্ণা, প্রবল ক্ষুধা! হায় নারী, আরও কি চাও তুমি? বড় ঊর্দ্ধে ছিলে—নামিয়া আসিয়া আবার মানুষেরই কাছে? আচ্ছা, তবে এসো, দেবীর রূপ তুমি পরিবর্ত্তন করিয়া ফেল,—মানুষ তুমি তবে মানুষই হও। তোমাতে লক্ষ্য করিবার কিছু নাই, তুমি সামান্য নারী মাত্র। তোমার বুকেও যাহা, সকল নারীর মধ্যেও তাহা, তবে পার্থক্য কিসের?

মনীশ চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। প্রভাস শুইয়া পড়িয়া তাহার দিকে ফিরিয়া পাশ বালিশটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আমার মতে বিয়ে দেওয়াই ভাল! তুমি আবার যে রকম একরোখা মানুষ, তোমার কাছে কোনও কথা বল্‌তেই ভয় লাগে। কিন্তু—"

অধীর ভাবে মনীশ বলিল "আর কিন্তু ফিন্তু নেই। আমাকে ও সবের মধ্যে জড়াতে এস কেন ভাই, আমি ওর কি জানি? ছুটি যখন হয়, ছুদিনের জন্য বেড়াতে আসি, যেমন এসেছি। আবার কাল সকালেই বেরুব।"

প্রভাস আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "কাল সকালেই? কাল যে রবিবার!"

মনীশ বলিল "হোক না রবিবার, তাতে এসে গেল কি আমার? পরশু সকালেই আমার কলেজ, সকাল হ'তে নয়টা পর্য্যন্ত চল্‌বে। সায়ান্স যারা নিয়েছে, তাদের—"

প্রভাস বলিল "বেশ তো, না হয় বিকলের ট্রেণে গেলেই হবে। সকালেই যে যেতে হবে, এমন কোনও কথা নেই।"

মনীশ বলিল "দেখা যাক, এখন ঘুমাও তো। রাত বোধ হয় এগারটা বেজে গ্যাছে এ দিকে।"

প্রভাস বলিল, "তা বাজুক, আমি একটা কথা বলছিলুম তোমায়।"

মনীশ বলিল "বিয়ের কথা?"

প্রভাস বোকার মত হাসিল।

মনীশ বলিল "অর্থাৎ হিন্দুর ঘরে বিধবা বিয়ে চলতে পারে কি না, আর কোনও হিন্দুর ছেলে স্বেচ্ছায় বিধবা বিয়ে করবে কি না—তাই তো? তার উত্তর এই—নিষ্ঠাবান কোনও হিন্দু এতে রাজি কিছুতেই হবে না। তবে মৃন্ময়ের মত সাহেব-বাঙ্গালী যারা, তারা রাজি হতে পারে।"

প্রভাস মুখখানা বালিসে গুঁজিয়া দিয়া চাপা সুরে বলিল "আর—আর —ধর, যদি আমিই বিয়ে করতে চাই—?"

"তুমি—!"

মনীশ একেবারে ঠেলিয়া উঠিয়া বসিল। তখনি নিজের দুর্ব্বলতায় নিজেই লজ্জিত হইয়া শুইয়া পড়িল, "হ্যাঁ, তা বলতে পার বটে। কারণ, তোমার সঙ্গে মিলতে পারে।"

প্রভাসের চক্ষুলজ্জাটা ঘুচিয়া গেল। সে মুখ তুলিয়া অনুনয়ের সুরে বলিল, "সত্যি মনীশ, তুমি যদি একটু চেষ্টা কর, তবে আমি উমাকে বিয়ে করতে পারি। উমার বিয়ে হবেই। আমার সঙ্গে হলে—সেটা কিন্তু ভাই, তোমারই কথার ওপরে নির্ভর করছে। জানোই তো, আমায়

কেউ বিয়ে দিতে পারে নি; কারণ, যথার্থ আমার মনের মত আমি কাউকেই দেখতে পাই নি। যদি উমাকে আমায় দিতে পার, তবে যথার্থ বন্ধুর কাজ করবে।"

মনীশ পাশ ফিরিয়া শুইয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "করব। যদি উমা যথার্থ-ই বিয়ে করতে চায়, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তোমার সঙ্গেই তার বিয়ে দেবার চেষ্টা করব। উমার উপযুক্ত যে তুমি, তা আমি স্বীকার করছি। কিন্তু যদি সে না চায় বিয়ে করতে—"

প্রভাস একটু হাসিয়া বলিল "ক্ষেপেছ তুমি, বিয়ে করতে চেয়েছে সে নিশ্চয়ই। তার কথাটা কোনও ক্রমে তার বাপের কানে এসে পৌঁছেচে বলেই তিনি বিয়ের দিকে এত ঝুঁকেছেন। যাই হোক, তোমার প্রতিজ্ঞা তুমি মনে রেখো, তা হলেই আমার হল।"

প্রভাস বেশ নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রার আয়োজন করিতে লাগিল।

মনীশের চোখে ঘুম ছিল না, সে চুপ করিয়া শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল প্রভাসের কথাগুলা।

এমন সুপাত্র অমরনাথ যে আর পাইবেন না, ইহা নিশ্চয়। প্রভাস হিন্দু। অতিরিক্ত চাল তাহার কিছুই ছিল না। একমাত্র দেশ ভ্রমণটাকেই সে শ্রেষ্ঠ বিলাসিতা বলিয়া জানিত, এবং তাহাই করিয়া যাইত। খুবই শান্ত, সংযত স্বভাব তার। লেখাপড়ায়ও ভাল, চরিত্রেও সে প্রশংসনীয়। সহরে সে ধনী নামে খ্যাত। সংসারে বিধবা একটী ভগিনী ছাড়া আর কেহই ছিল না। সত্যই সে বিবাহের উপর একেবারে চটা ছিল। উমাকে দেখিয়া, উমার কথা শুনিয়া সত্যই সে উমার অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং নিজেই বিবাহের কথা তুলিল।

যদি উমা বিবাহই করে, তবে প্রভাসকেই করুক। প্রভাসের সহিত তাহার মিলন বাঞ্ছনীয়। উমা যদি সুখী হয়, তবে ইহাতেই হইবে।

কিন্তু তবু—মনীশ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস না ফেলিয়া থাকিতে পারিল না,—তবু—তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া একটা বাণী মুখে ভাসিয়া আসিল—নারী, অতৃপ্তিরই একটা শিখা মাত্র।

বাস্তবিকই কি তাই নয়? এর তৃপ্তি কিসে, তাহা কেহ এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিয়াছে? নারী নিজেই বুঝিতে পারে নাই, কিসে তাহার তৃপ্তি হইবে। সে হাহাকার করিয়া ছুটিয়াছে মরীচিকা দেখিয়া। আজীবন-কাল ছুটিয়াই চলিয়াছে। পাশে যাহারা, তাহাদের দগ্ধ করিয়া যাইতেছে, তাহাদের অন্ধ করিয়া যাইতেছে।

মনীশ আর শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে পারিল না। গৃহের মধ্যে যেন আগুনের বাতাস বহিয়া যাইতেছে। বিছানাটা এত গরম হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহাতে শয়ন করা একেবারেই দুঃসাধ্য।

মনীশ দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল। চাঁদ তখন মাথার উপর। রজত-কিরণ-ধারায় খোলা বারাণ্ডাটা প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। বারাণ্ডার নীচে কয়েকটা হেনা ফুলের গাছ সারি সারি দাঁড়াইয়া,—ফুল ফুটিয়া তাহার সুগন্ধে চারিদিক পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে।

বাহিরের বাতাস কি ঠাণ্ডা, মন ও দেহ একনিমেষে জুড়াইয়া দেয়। মনীশ বারাণ্ডার ধারে একটা হেনা গাছের কাছে দাঁড়াইয়া মাথা নত করিয়া ঘ্রাণ লইল। তাহার পর একটা ছোট ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া পাদচারণা করিতে লাগিল।

আচ্ছা, যে যাহাই করুক, তাহার তাহাতে কি? সে তো জানিতেছে, সে পর ব্যতীত আর কিছুই নয়। তবে কেন তাহার এ ব্যাকুলতা, কেন সে বুকের মধ্যে অসহ্য জ্বালা অনুভব করিতেছে?

কি কঠোর সত্য তাহার বুকের মধ্যে লুকাইয়া—

মনীশ, নিজের বুকের মধ্যে যে গোপন স্থান ছিল, সেখানে দৃষ্টিপাত করিয়াই শিহরিয়া উঠিল।

এই যে প্রকৃত সত্য,—সে রাশিকৃত মিথ্যা আনিয়া ইহাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু, সত্য কি গোপন থাকে? এক সময় না এক সময় সে বাহির হইয়া পড়িবেই যে।

না, কিছুতেই না। জীবন্ত সত্যের গলা টিপিয়া অত্যন্ত গোপনে সে হত্যা করিবে, সে যেন আপনাকে প্রকাশ করিতে না পারে, সে যেন একটা শব্দ মাত্র উচ্চারণ করিতে না পারে।

গোপনতম স্থানবাসী সেই সত্যটা মনীশের চোখে পড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সর্ব্বেন্দ্রিয় অবশ হইয়া পড়িয়াছিল, হাতের হেনার শাখা কখন পড়িয়া গিয়াছিল।

সম্মুখে দ্বিতলের গৃহটায় দপ করিয়া আলো জ্বলিয়া উঠিল, জানালা পথে দেখা গেল, উমার শান্ত মুখখানা। সে এতক্ষণ অন্ধকারে জপ করিতেছিল, এইবার শয়ন করিতে যাইবে। তাহার আয়ত চক্ষু অশ্রুসিক্ত, গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতেছে।

প্রেতে তাড়া করিলে লোকে যেমন ছুটে, মনীশ তেমনি করিয়া ছুটিয়া নিজের গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। প্রভাসের গাঢ় নিদ্রা তাহার দুমদাম শব্দেও ভাঙ্গিল না।

পরদিন প্রভাতে মনীশ উঠিয়া প্রভাসকে লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া উমার সহিত দেখা করিবার সাহস তাহার ছিল না। নিজের সত্য মূর্ত্তি প্রকাশ হওয়ায় যথার্থ-ই সে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিল।

প্রভাসকে চা খাওয়াইয়া সেখানে বসাইয়া রাখিয়া সে অমরনাথের খোঁজে গেল।

দেওয়ানের সহিত অমরনাথ কি কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, মনীশ সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। অমরনাথ তাহার শুষ্ক মলিন মুখখানার পানে চাহিয়া বলিলেন, "কোনও দরকার আছে মনীশ?"

মনীশ উত্তর করিল "হ্যাঁ, একটা গোপনীয় বিশেষ দরকারী কথা আছে।"

দেওয়ানকে বিদায় দিয়া অমরনাথ তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন "বল।"

মনীশ বলিল "আপনি উমার যখন বিয়েই দেবেন, তখন আর সে বিষয়ে কথা বলার বিশেষ দরকার নেই আমার। বিয়ে দেবেন—দিন, তবু যাতে সে সুপাত্রে পড়ে তা তো করবেনই। আমি বলছি, এ রকম সুপাত্র পাওয়া ভার, যার সঙ্গে উমার যথার্থ মিল হতে পারে। আমি ভেবে দেখছি, প্রভাস সব রকমেই উমার যোগ্য স্বামী হতে পারবে। আপনি যদি আমায় বিশ্বাস করেন, তবে জেনে রাখুন, প্রভাসের মত ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলে উমা যথার্থ সুখী হতে পারবে, নচেৎ নয়।"

অমরনাথের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল "প্রভাস বিয়ে করবে উমাকে?"

স্থির স্বরে মনীশ বলিল "করবে, সে বলেছে।"

অমরনাথ বলিলেন, "তা যদি হয়, তবে ভালই হবে। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, তোমার কথাকেও বিশ্বাস করি। তুমি যে কথা বলছ, তা ঠিক কথা। প্রভাসকে তুমি যত চেন, তত আর কেউ চিনতে পারবে না। তুমি যদি উদ্যোগী হও, মনীশ—"

মনীশ মলিন হাসিল, বলিল, "উমা যদি রাজি হয়, বিয়ে দিতে দেরী হবে না। আপনি উমার মত করান, আমি সব করে দেব।"

অমরনাথ বলিলেন "তুমি বলতে পারবে না এ কথাটা তাকে? তুমি প্রথম এ কথাটা তাকে শুনিয়ে দাও, তার পরে আমি তাকে বুঝিয়ে রাজি করব এখন।"

সবেগে মাথা নাড়িয়া মনীশ বলিল, "না, আমার দ্বারা এ কাজ হবে না

কাকা। আমি বিধবা বিয়ের পক্ষে কোন মতেই দাঁড়াতে পারব না ! আমি বলছি এই ভেবে—বিধবা বিয়ে দিতে গিয়ে কোন একটা লোকের হাতে উমাকে সঁপে দেবেন না, যাতে আজীবন সে দুঃখই পাবে। তাকে বাঁচাবার জন্যেই আমি প্রভাসকে দিচ্ছি। আমাকে ও সবের মধ্যে টানবেন না। প্রভাসের কথাটা আপনাকে জানিয়ে দিলুম, এখন আপনারাই তার বোঝাপড়া করুন গিয়ে।"

সেই দিনই বৈকাল বেলায় সে প্রভাসের সহিত কলিকাতায় রওনা হইল। প্রভাসের যাইবার তত ইচ্ছা ছিল না, অথচ বেচারী না বলিতেও পারে না।

যাইবার সময় উমা মনীশকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আবার এস, মনীশদা, সামনেই তো গ্রীষ্মের বন্ধ, তখন জেঠিমাকে শুদ্ধ নিয়ে এসো।"

মনীশ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, "বলতে পারিনে উমা, ভবিষ্যতে যা হবে, তার জন্যে কথা দেওয়া যায় না।"

উমা অভিমান পূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "কেন মনীশদা, অন্যবারে তো বলে যাও, এবারে তোমার ন্যায় জ্ঞানটা কি এতই বেশী হল।"

মনীশ বলিল "আমার ন্যায় জ্ঞান বেশী করছে যে সংসার উমা! আমার নিজের সম্বন্ধেই আমি যখন বিশ্বাস করে কিছু বলতে পারি নে, তখন পরকে কথা দেব কি করে ? আমায় মাপ কোরো উমা, বুকে বড্ড ঘা লেগেছে বলেই পালাতে চাচ্ছি, এখানে আসা আমার আর হবে না।"

উমা স্পন্দিত বক্ষে বলিল "কেন, কি হয়েছে মনীশদা, কেন তোমার আসা হবে না ? বাবার সঙ্গে কিছু কি—?"

মনীশ মলিন হাসিয়া বলিল, "পাগল ! তোমার বাপ যে আমারও বাপ, তা কি ভুলে যাচ্ছ ?" তিনি যদি রাগী হতেন, আমায় বকতেন, তাও আমি রাগ করতে পারতুম না ; কারণ, তিনি ছেলের মত আমাদের দুটি ভাইকে

ভালবেসেছেন,—যাতে আমাদের উন্নতি হয়, আমরা সুখে থাকি, প্রাণপণে তাই করেছেন। তিনি শিবের মত লোক,—রাগ তো দূরের কথা, তাঁর মুখ একটা দিন বিমর্ষ দেখতে পাই নি। আমি যাচ্ছি উমা, কেন যে আমার মনে ভাবান্তর, তা আমি তোমায় বলতে পারলুম না, আমায় সে জন্যে ক্ষমা কোরো। যাবার সময় আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি, তোমার অন্তর যেন লোহার চেয়েও শক্ত হয়, হিমালয়ের মত অটল থাকে, তোমায় কেউ তোমার আসনচ্যুত না করতে পারে।"

মনীশ চলিয়া গেল।

মনীশ যে এমন করিয়া কেন চলিয়া গেল, তাহা উমা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কারণটা যতই তাহার কাছে দুর্জ্ঞেয় বোধ হইতেছিল, সে ততই বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল।

চিরশান্ত মনীশদা,—তাহার মুখ একটা দিনের জন্য গম্ভীর দেখা যায় না, সর্ব্বদা সে হাসি-মুখ,—যাহার মনটা বালকের মতই সরল, মধুর,—সে আজ কেন এরূপ হইয়া পড়িল।

নিজের মন দিয়া সে মনীশদার মনটা বুঝিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহাতে কিছুই বুঝা যায় না। তখন সে সাধারণের ভাব দিয়া মনীশকে দেখিবার চেষ্টা করিল।

মনীশের মনে কি কোনও পাপ—

আ-ছি, তাহাও কি হইতে পারে?

মনীশদার মনে পাপ, এও কি সম্ভব হয়? মনীশদা যে শিশুর মত সরল—পবিত্র মনখানি তাহার, সে মনে পাপ কখনও তাহার কালিমা রেখা অঙ্কিত করিতে পারে না।

কিন্তু সংসারে বিচিত্রই বা কি? অমরনাথ যে বলিতেন সংসারে সকলই সম্ভব হইতে পারে, অসম্ভব কিছুই হইতে পারে না, সেই কথাটা উমার মনে পড়িয়া গেল।

মনে পড়িয়া গেল—মনীশের মাসিমা নৃত্যকালীর এক দিনকার কথা। মদ খাওয়া লইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, মনীশও মাঝে মাঝে মদ খায়। কথাটা সম্ভবপর বলিয়া সে ধারণাই করিতে পারে নাই; তাহার পর জগতে সবই সম্ভব মনে করিয়া সে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল—কিন্তু

সে বিশ্বাসের মূল শিথিল ছিল। সে দিন কথায় কথায় সে মনীশকে উপহাস ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তুমি না কি মদ খাও মনীশদা ?"

মনীশ তাহার শান্ত দৃষ্টি তাহার মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া বলিয়াছিল, "কথাটা শুনেছ নিশ্চয়ই, আগে বল উমা, এ কথা তুমি বিশ্বাস কর ?"

কালবিলম্ব না করিয়া উমা উত্তর দিয়াছিল, "করি বই কি, কারণ জগতে অসম্ভব কিছুই থাকতে পারে না।"

মনীশ গম্ভীর হইয়া বলিয়াছিল, "তবে তাই জেনে রাখ, আর বেশী কিছু জানতে চেয়ো না। আমার সম্বন্ধে বেশী খোঁজ করা উচিত নয়। শুধু আমার সম্বন্ধেই বা বলি কেন, মানুষের সম্বন্ধেই বেশী খোঁজ করা উচিত নয়। যা শুনবে—তা শুধু শুনেই যেয়ো। মানুষের সম্বন্ধে খোঁজ করতে করতে তার এমন অনেক দোষ বেরিয়ে পড়ে, যাতে অত্যন্ত পূজনীয় ব্যক্তিও ঘৃণার্হ বলে বিবেচিত হন। যাদের মান্য কর, ভালবাস, তাদের খোঁজ মোটেই নিয়ো না। পার যদি এই উপদেশটা আমার মনে করে রেখো।"

উমার মনে মনীশের এই কথাটা জাগিয়া উঠিতেই, সে অত্যন্ত সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িল। না, মনীশদার মনে যাহাই থাক, তাহা লইয়া আলোচনা করিতে কি অধিকার তাহার আছে ? সে মনীশদাকে ভক্তি করে, ভালবাসে, তাহাই করিয়া থাক। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুক, মনীশদার মনে যদি কোনও চিন্তা উঠিয়া থাকে, সে চিন্তা লয় হউক।

সন্ধ্যাবেলা ব্যতীত উমা পিতাকে পাইত না। সারা দিন তিনি কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন। দিবানিদ্রা তাঁহার ছিল না, সে সময়ও লেখাপড়া, কাজ-কর্ম্ম করিতেন। সন্ধ্যার মধ্যে সব কাজ তাঁহার শেষ করাই চাই। সে সময়টা তিনি কন্যাকে উপদেশ দিবেন, ভালমন্দ চারিদিককার গল্প করিবেন।

উমা ঠাকুরমায়ের সন্ধানে গেল। বগলা দেবী তখন বামুন ঠাকরুণের নিকট বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। গল্পটা আর কিছুই নহে—সেই কাশী যাত্রা। তিনি না কি অতিবড় পাপিনী, তাই বাবা বিশ্বনাথ তাঁহাকে টানি-টানি করিয়াও পায়ের তলে টানিতে পারিতেছেন না। তা এইবার তো তিনি আশা করিতেছেন নিশ্চয়ই কাশী যাইতে পাইবেন। উষাটাকে বড় ভালবাসিতেন, কেবল তাহার মায়াতেই যাইতে পারিতেছিলেন না। মনীশ যাহা বলিল, তাহাতেই তাঁর সব আশা ভরসা ফুরাইয়াছে। উষা আসিলেও তিনি আর তো তাহাকে ছুঁইতে পারিবেন না, ঘরেও প্রবেশ করিতে দিতে পারিবেন না। সে না কি একেবারে খিষ্টেনের বাড়ী, তারা না খায় এমন জিনিস নাই। বাধ্য হইয়া উষাকেও সব খাইতে হয়, নইলে শুকাইয়া মরা—তা তো আর পারা যায় না। যাহাই হোক, উষাও খিষ্টেন হইয়াছে, তাহাতে আর কোন ভুল নাই। বাবা বিশ্বনাথ কি এই নিদারুণ সংবাদ দিয়া তাহার বুকটা ভাঙ্গিয়া দিয়া, তাহার পর তাঁহাকে চরণে টানিয়া লইবেন।

এই কথাগুলি বলিতে বলিতে কতবার তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, কতবার তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িল, তাহার ঠিক নাই। বাস্তবিক তাঁহার মনঃকষ্টের অবধি ছিল না। যে দুইটিকে হাতে করিয়া মানুষ করিলেন, তাহার একটি বিধবা হইল, সংসারের নিকট হইতে বহু দূরে সরিয়া গেল, আর একটী সে থাকিয়াও রহিল না।

উমা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িল,—এ দুঃখময় প্রসঙ্গের মধ্যে সে দাঁড়াইয়া থাকিতে সমর্থ হইল না।

নিজের গৃহে গিয়া সে কাপড়খানা ছাড়িয়া গরদ পরিয়া আহ্নিকে বসিল। এ কাজটা কিছু দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত ; এ সময়ে উমার মনে কোনও ভাবনা থাকিতে পারিত না।

প্রায় এক ঘণ্টা সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া সে যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, —দাসী কখন আসিয়া দেয়ালের ল্যাম্পটা জ্বালাইয়া খুব কমাইয়া দিয়া গিয়াছে।

বাহির হইবামাত্র দাসী সংবাদ দিল, ঠাকুরের আরতির সময়ে তাহাকে সেখানে যাইতে অমরনাথ আদেশ দিয়াছেন, তিনিও সেখানে গিয়াছেন।

উমা নীচে নামিয়া গেল।

ঠাকুরবাড়ী স্বতন্ত্র, সেখানে ঠাকুরের বৃহৎ গৃহ, দালান, ছোট ছোট অনেকগুলি কুঠারিও ছিল। পূজারি এখানে থাকিত। একজন ভৃত্য ও দাসী এ দিককার জন্য আলাদা রাখা হইয়াছিল। প্রত্যেক দিন অতিথি, দরিদ্র এখানে ঠাকুরের প্রসাদ পাইত, এজন্য একটী পাচকও ছিল।

উমা দালানের এক পাশে গিয়া দাঁড়াইল। অমরনাথ যুক্ত করে দাঁড়াইয়া ছিলেন। আরতির সময়ে প্রত্যেক দিনই অনেক লোক সেখানে আসিয়া জুটিত, আজও অনেক লোক আসিয়াছিল। আরতি আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল, দর্শকেরা ভক্তি গদগদ চিত্তে দাঁড়াইয়া ছিল।

উমা একদৃষ্টে গোবিন্দজীর পানে চাহিয়া রহিল। তাহার হৃদয় তখন পবিত্র ওঁ শব্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার দীপ্ত চক্ষে অপূর্ব্ব অপার্থিব দৃষ্টি।

আরতি শেষ হইয়া গেল,—বোল হরিবোল শব্দে সমস্ত ঠাকুরবাড়ীটা কম্পিত হইয়া উঠিল। দর্শকেরা মাটীতে লুটাইয়া প্রণাম করিয়া যে যার গৃহে ফিরিল।

"উমা—"

উমা তখনও মাটীর উপর মাথা রাখিয়া পড়িয়া ছিল। পিতার আহ্বান

কানে আসিতে, শেষ আর একবার প্রণাম করিয়া উঠিল। তখন ঠাকুর-বাড়ী প্রায় লোকশূন্য।

অমরনাথ স্নেহ-গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "চল মা—ঘরে যাই।"

পিতার দক্ষিণে কন্যা অগ্রসর হইল।

"আচ্ছা বাবা, এই দেবতাই আগে সত্য ছিলেন?"

অমরনাথ একটু হাসিয়া বলিলেন, "এ কি প্রশ্ন পাগলী মা?"

উমা বলিল, "না বাবা, বল না। তোমার কথাগুলো কিন্তু সব ঠিক হয়। আমি তাই ভাবি, তুমি সব জানতে পার কি করে?"

অমরনাথ বলিলেন, "যত বছর মাথার উপর দিয়ে চলে যায় মা, তত জ্ঞানও দিয়ে চলে যায়। দেখে শুনে সবই জানা যায়, এতে তোমার বাপের বিশেষত্ব বড় কিছু নেই। দেবতা আগে সত্য ছিলেন, এখন কি মিথ্যে হয়েছেন মা? দেবতাকে আগে লোক ডাকত, তাই তিনি ছিলেন সত্য; এখন ডাকে না, বিশ্বাস হারিয়েছে, তাই বলে কি তিনি মিথ্যা? সত্য মিথ্যা নিজের মনে, সত্য মিথ্যা বাইরে জেগে নেই। তোমার মনে যদি সত্যকেই আসন দাও, সব জিনিসেই সত্য দেখতে পাবে, মিথ্যা যদি বরণ কর, সত্যও তোমার কাছে মিথ্যা হয়ে যাবে। তবে একটা কথা মিথ্যাকে বরণ করলেও সত্য গোপন থাকবে না, এক দিন সে বার হবেই। সে দিন মিথ্যাকে আশ্রয় করার জন্যে অনুতপ্ত হতে হবে বড় কম নয়।"

উমা পিতাকে সিঁড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিতেছিল। পিতা বলিলেন, "তোমার সঙ্গে কথা আছে উমা।"

"আসছি বাবা," উমা চলিয়া গেল।

সেদিন আকাশটা মেঘে ছাওয়া ছিল, চাঁদের আলো স্ফুট ছিল না। মেঘের আড়াল হইতে সামান্য শুভ্রতার আভা আসিয়া ধরার বুকে পড়িয়াছিল, তাহাতে অন্ধকারের ভীষণতা ঘুচিয়াছিল।

বৃষ্টি পতনাশঙ্কায় অমরনাথ আজ ছাদে গেলেন না, নিজের গৃহে গিয়া সোফায় বসিয়া পড়িলেন।

উমাকে বলিলেন কথা আছে; এখনি সে আসিবে; কিন্তু তাহাকে তিনি কি বলিবেন? কেমন করিয়া সে কথাটা তাহাকে শুনাইবেন, ইহাই তিনি ভাবিতেছিলেন। উমা ত তাঁহার যে-সে মেয়ে নয়,—সে যে সত্যই উমা, সে যে সত্যই দেবী। তাহার পবিত্রতা, তাহার সরলতা, তাহার কোমলতা, সবই যে সাধারণ নারীকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। এই কথা ভাবিয়াই তিনি মনীশের উপর উমাকে বলার ভার অর্পণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সে তো স্পষ্টই অস্বীকার করিল, এখন তাঁহার নিজের মুখে বলা ছাড়া আর উপায়ও নাই।

খানিক পরেই উমা আসিয়া পড়িল, "তুমি ঘরে রয়েছ বাবা, আমি এদিকে ছাদ খুঁজে তোমায় না পেয়ে যাচ্ছিলুম আমি নীচে। ভাবলুম, বুঝি আবার কোনও দরকার পড়েছে তোমার বাইরে, তাই বুঝি গ্যাছো।"

অমরনাথ বলিলেন, "ছাদে যাব কি মা, দেখলুম, এক ফোঁটা দু ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে লাগল। আবার বেশী আসবে, সেই জন্যেই যাইনি। বস তুমি ওই চেয়ারখানায়। ওই পত্রিকাখানা রয়েছে, যাতে একটা লাল দাগ দেওয়া আছে, সেইটে পড় তো মা।"

উমা পত্রিকা তুলিয়া লইল। লাল দাগ দেওয়া প্রবন্ধটা একেবারে ভাঁজের উপরেই ছিল, সেখানে লেখা ছিল—'বিধবা বিবাহ।'

উমা ভাঁজ খুলিয়া ফেলিয়া পিতার পানে চাহিয়া বলিল, "বিধবা বিবাহ নামে যে প্রবন্ধ, সেইটা বাবা?"

অমরনাথ বলিলেন, "হ্যাঁ।"

এই প্রবন্ধটা বহুকাল পূর্ব্বেই অমরনাথ পড়িয়াছিলেন। আজ

আবার নূতন করিয়া ইহা পড়াইয়া শুনিবার যে বিশেষ আগ্রহ তাঁহার ছিল, তাহা নহে। তবে এই কথাটা হইতেই তিনি নিজের কথা বলিবার সুবিধা পাইবেন।

উমা পড়িতে লাগিল। কথাগুলা সে যে বুঝিয়া পড়িতেছে, অমরনাথের তাহা বোধ হইল না। শিশু যেমন পাঠ্যপুস্তক হইতে পাঠ মুখস্ত বলিয়া যায়, এ যেন তেমনি।

খানিক দূর পড়িয়া উমা কাগজখানা ফেলিয়া দিয়া বলিল, "না বাবা, আমাদের না কি এ সব পড়তে নেই।"

অমরনাথ বলিলেন, "কেন মা ?"

উমা শান্ত ভাবে বলিল, "বিধবার বিয়ে—এ যে কল্পনা করাও পাপ, বাবা। উৎসর্গ করা গ্যাছে যে ফুলকে, তা কি আর দেব-পূজায় লাগতে পারে ? সে দেবতার উৎসৃষ্ট বলে তোলা থাকে, তাকে আর কিছুতেই লাগানো যেতে পারে না।"

অমরনাথ তাহার শান্ত শ্রীতে উদ্ভাসিত মুখখানার পানে দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, "বিধবার বিয়ে বলতে আমি সমাজ-সংস্কার বুঝছিনে মা,—বুঝছি, বিধবার দারুণ কষ্ট হ্রাস।"

উমা একটু হাসিল, "কষ্ট ?—কষ্ট কি বাবা ? আমি তো দেখছি, বিধবার কষ্ট কিছুই নেই। সত্যি বাবা, আমার তো মনে হয় এই ভাল।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অমরনাথ বলিলেন, "তা তো বলবেই মা। তুমি আমাদের পানে চেয়ে নিজের সুখদুঃখ বিসর্জ্জন দিয়েছ। কিন্তু মা, আমাদেরও তো কর্ত্তব্য আছে, আমাদেরও তো চোখ আছে।"

উমা শঙ্কিত হইয়া উঠিল। পিতার কথার মধ্যে সে যেন একটা

নূতন সুর শুনিতে পাইল। কই, এত কাল পিতা তো তাহার বৈধব্য অবস্থাকে উড়াইয়া দিয়াই আসিয়াছেন। যদি কেহ বিধবার কষ্টের কথা বলিত তিনি তর্কের দ্বারা তাহা কাটাইয়া দিয়া আসিয়াছেন। সেই পিতা—তিনি আজ এ কিরূপ কথা বলিতেছেন!

উমা বলিল,—"কি কর্ত্তব্য তোমাদের বাবা ?"

অমরনাথ বলিলেন, "বাপ-মায়ের বুক সন্তানকে সুখী দেখলেই ঠাণ্ডা থাকে মা। তোমার মা নেই, আমিই তোমার মা—তোমার বাপ। উমা, আমি তোমার আবার বিয়ে দিবার চেষ্টা করছি।"

"আমার বিয়ে ?"

উমা যেন আকাশ হইতে পড়িল; বিস্ফারিত চোখ দুইটা তুলিয়া সে পিতার পানে চাহিয়া রহিল।

পিতা আবেগভরা কণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁ মা, উমা, তুমি যে আমার সেই ছোট্ট মেয়েটী, তোমার মন আমিই যে গড়ে তুলেছি মা। আমার পানে তাকিয়ে নিজের সব বিসর্জ্জন দিচ্ছ, এ কি আমি সহ্য করতে পারি ? আমি তোমার আবার বিয়ে দেব, তোমায় সুখী করবার চেষ্টা করব।"

"বাবা—"

উমা উচ্ছ্বসিত ভাবে হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল।

অমরনাথ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কাঁদছ কেন মা ?"

উমা রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমাকে এ রকম ভাবে কেন নির্য্যাতন করছ বাবা ? তুমি যে আমার পরম ন্যায়বান্, জ্ঞানবান্ বাবা, তোমার মুখে তো ঐ কথা মানায় না। তুমি আমায় এতদিন এত জ্ঞানোপদেশ দিয়ে এসেছ, সে সব কি আজ মিথ্যে হবে ? আমায় উপরে তুলে কেন আবার নরকে ফেলবে বাবা ? তুমি যে আমায় শিখিয়েছ, আমি আর

কেউ নই, আমি শুধু মা,—তোমার কথায়, তোমার উপদেশে আমি যে আমার বুকখানা মায়ের ভাব দিয়েই ভরে নিয়েছি। এ জগতে সবাই যে আমার সন্তান, এই কথাই তুমি যে সকাল হতে সন্ধ্যা অবধি উপদেশ দিয়ে এসেছ। তবে আজ আবার এ কি নূতন কথা শুনাচ্ছ? তোমার উমা তো দ্বিচারিণী নয়। তার যে একবার বিয়ে দিয়েছিলে, সে কথাটা একবার মনে কর। আমার স্বামী ছিল, এখনও সে আছে মর্ত্ত্যে নেই, স্বর্গে আছে। এক দিন আমিও তো সেখানে যাব, তার সঙ্গে সেখানেই তো আমার যথার্থ মিলন হবে, মাঝখানে দুদিনের জন্যে কেন একটা জন্মান্তরব্যাপী প্রাচীর তুলে দিচ্ছ বাবা!"

ক্ষুদ্র বালিকার মতই সে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অমরনাথ একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। খানিকক্ষণ উমার পানে তাকাইয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কেঁদ না উমা, তোমার চোখে জল—এ আমার সহ্য হয় না। আনন্দময়ী মা আমার—আমি তো তোমাকে কাঁদাতে চাই নি, আমি যে তোমায় হাসাতেই চেয়েছি।"

উমা পিতার পা দুখানা জড়াইয়া ধরিয়া, পায়ের উপর মুখখানা, রাখিয়া, চোখের জলে সিক্ত করিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি বাবা, ও কল্পনা তুমি মনেও এনো না। আমায় তাতে তো আনন্দ দিতে পারবে না বাবা, সে যে আমার বুকে শেল বিঁধবে। আমি কখনও তোমার কথার অবাধ্য হই নি, তোমার আদেশ আমার দেবাদেশ। তুমি যদি আদেশ কর, তবে এ ভীষণ দণ্ডও আমায় বইতে হবে। যদি আমায় একটু স্নেহ কর বাবা, তবে—তবে আমায় এমন করে নষ্ট কোরো না!"

"মা—উমা"

অমরনাথের দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। দৃঢ়চিত্ত অমরনাথ ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় কাঁদিয়া বলিলেন, "কাঁদালি মা আমায়? আমি যে কেন আবার তোর বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি, তা জানিস্ নে মা? তুই চলে গেলে তোর বাপের কি থাকবে মা, এই শ্মশানে তাকে যে একলা প্রেতের মত হাহাকার করে বেড়াতে হবে—এ জেনেও আমি তোকে তফাৎ করতে যাচ্ছিলুম। মা, বাপের মন বড় স্নেহপরায়ণ। ওরে অভাগা মেয়ে, যদি তোর মা থাকত, তবে আমার এত দায় তো থাকত না। আমি নিজের এতবড় ক্ষতিও সহ্য করতে যাচ্ছিলুম কেবল তোর মুখের পানে চেয়ে। যদি এতে সুখীই না হোস মা—তবে কি হবে আমার এতে? না, তুই এমনিই থাক আনন্দময়ী, আমার বুক, আমার বাড়ী তোর হাসিতেই ভরে থাক।"

পিতা কন্যার মাথাটা তুলিয়া ধরিলেন, স্নেহপূর্ণ চোখে সে মুখের পানে চাহিতে চাহিতে ঝর্ ঝর্ করিয়া চোখের জল ঝরিয়া সেই মাথাটার উপর পড়িতে লাগিল।

মনীশ কলিকাতায় ফিরিয়া গেল, কিন্তু যেমন হাসিমুখে সে আসিয়াছিল, তেমনি হাসিমুখে ফিরিতে পারিল না। তাহার মনের সুখ শান্তি সব যেন সে হারাইয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণ নিঃস্বের মতই ফিরিয়া চলিল।

মা তাহার বিষণ্ণ ভাবটা প্রথমে লক্ষ্য করিতে পারিলেন না ; কিন্তু বেশী দিন সে মায়ের চোখ এড়াইয়া থাকিতে পারিল না। সে দিন পুত্র যখন আহারে বসিয়াছিল, মা নিকটে বসিয়া বাতাস করিয়া মাছি তাড়াইতেছিলেন। মনীশ ইহাতে অনেক আপত্তি করিত, কিন্তু স্নেহময়ী জননী কিছুতেই তাহার আপত্তি কোন দিন কানে তুলেন নাই।

মা বলিলেন, "তোর কি হয়েছে মনীশ, আজকাল তোর মুখখানা অত ভার হয়ে থাকে কেন, যেন কিছুতেই আর স্ফূর্ত্তি পাস্ নে ?"

মনীশ যেন চমকাইয়া উঠিল। তখনি হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "বাঃ স্ফূর্ত্তি পাই নে কে বললে তোমায় ? আমি তো আগেকার মতই বেশ হাসি।"

মা বলিলেন, "আমার চোখে ধূলো দেবার চেষ্টা করছিস মনীশ ? আমি বেশ জানি, আমার কাছে কক্ষনো তুই মিথ্যে কথা বলিস নে, তবে আজ কেন মিথ্যা কথা বলছিস বাবা ?"

মনীশ ভারি বিব্রত হইয়া পড়িল। সত্যই সে মায়ের কাছে মিথ্যা কথা বলিত না, এবং মাকে সে বড় ভক্তি করিত। মায়ের কথা তাহার নিকটে বেদবাক্য তুল্য ছিল, এবং তাহা বিশ্বাস করিত সে প্রাণ দিয়া।

সে ঠিক জানিত, মায়ের কথা কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। কিন্তু, সে সত্যকে সে প্রকাশ করিবে কেমন করিয়া,—সে যে বড় অপ্রিয় সত্য।

মনীশ মাথা নত করিয়া সব ভাতগুলা একসঙ্গে ডাল দিয়া মাখিয়া ফেলিল। মা বলিয়া উঠিলেন, "ও কি করলি? দুটো ভাত দুধ দিয়ে খাবার জন্য রাখলি নে?"

সে কথায় কান না দিয়া মনীশ বলিল, "তোমার কাছে কখনও যে মিথ্যা কথা বলি নি, এ কথা ঠিকই মা। এখন আমার কলেজের দেরী হয়ে যাচ্ছে, বাড়ী ফিরে এসে সব কথা বলব'খন।"

তাড়াতাড়ি যা তা করিয়া খাইয়া সে উঠিয়া পড়িল।

কাপড় জামা পরিয়া মাথার চুলটা ফিরাইয়া একটা পাণ মুখে দিয়া বাইকটা হাতে লইয়া সে সবে বাহির হইতেছে, সেই সময় পোষ্টম্যান আসিয়া তাহার হাতে একখানা পত্র দিয়া গেল।

এনভেলপখানা দু'চারবার উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া দেখিয়া, সেখানা পকেটে ফেলিয়া, সে হাতের ঘড়িটার পানে চাহিল। অতি ব্যস্তভাবে বাইকে উঠিয়া বাইক চালাইল। পত্রখানা পড়িবার সময় হইল না। উপরের পোষ্টের ছাপ দেখিয়া বুঝিতে পারিল, এখানা প্রসাদপুর হইতে আসিতেছে।

টিফিন আওয়ারে সে বিশ্রাম করিতে গেল লাইব্রেরীরুমে। সেখানে একটু নির্জ্জন পাইয়া সে পত্রখানা খুলিয়া ফেলিল।

পত্রখানা উমার। সে লিখিয়াছে,—

মনীশদা, আজ পনের ষোল দিন গ্যাছ, এর মধ্যে একখানাও যে পত্র দিলে না, এর মানেটা কি? আগে তুমি সাত দিনের মধ্যে দুখানা পত্র দিয়েছ, তা কি মনে পড়ে। আমার পত্র না পেলে হয় তো রোজই পত্র দিয়েছ। আচ্ছা মনীশদা, হঠাৎ এ রকম ব্যাপারটা ঘটল কি করে?

তোমার সেই গোপন কথা আমি জানতে পেরেছি। ছি মনীশদা এমনি তোমার মনের ভাব—তা তো আমি জানতুম না। তুমি হাসতে, কথা বলতে আগেকার মতই। তোমার বুকে এই কামনাটা ছিল, তা তো আমায় এক দিনও জানতে দাও নি। আমায় স্পষ্ট যদি সামনাসামনি জানাতে, আমি তোমার এ ভুল ধরিয়ে দিতে পারতুম। আমি বৈশাখ মাসের দশ বার তারিখে তোমাদের বাড়ী যাব। তোমার সঙ্গে সামনা-সামনি কথা বলা দরকার। আর মাঝে কয়টা দিন মাত্র বাকি আছে। আমি এ দিনগুলো শিগ্‌গির কেটে যাবার প্রার্থনা করছি। উষার খোঁজ মাঝে মাঝে নিয়ো। পত্র পাঠ উত্তর দিয়ো মনীশ দা, রাগ করে থেক না। যদি পত্র না দাও, তবে আমিও আর দেবো না। তোমার রাগ থাকতে পারে, আমার কি রাগ থাকতে পারে না, বিশেষ এ যে আমারই কথা।

ইতি

স্নেহের উমা।

মনীশের হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠিল। উমা সব জানিয়াছে, লিখিয়াছে। তবে কি সে তাহার হৃদয়ের সেই জ্বলন্ত সত্য কথাটাও জানিয়া ফেলিয়াছে? সে যে রকম বুদ্ধিমতী মেয়ে, জানাও তো বিচিত্র নয়। উমাকে কোনও কথা লুকানো বড় সহজ কথা নয়, তাহা মনীশ বেশ জানিত।

মনীশ ভাবিতে লাগিল,—উমা আসিবে। সে পূর্ব্বেই বলিয়াছিল, বৈশাখ মাসে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে কলিকাতায় আসিবে, পত্রেও লিখিয়াছে আসিবে। সে আসিয়াই মনীশকে ধরিবে। সে বলিবে, সে যে নিজের ভাইয়ের মতই মনীশকে দেখে, মনীশ তাহা ভুলিয়া গেল কি করিয়া,—মনীশের বুকের মধ্যে এ কিসের আকাঙ্ক্ষা? এ তো ভগিনী স্নেহ নয় এ যে আর একটা জিনিস।

না, মনীশ কিছুতেই সে সময়ে বাড়ী থাকিবে না, মনীশ এখান হইতে চলিয়া যাইবে। উমার সম্মুখে সে কিছুতেই মুখ বাহির করিতে পারিবে না। এ কলঙ্কিত মন লইয়া দেবীস্বরূপা উমার কাছে থাকাও তাহার উচিত নয়, উমার নিকট হইতে অনেক দূরে সরিয়া যাওয়াই তাহার কর্ত্তব্য।

উমার বিবাহ—

ভাবিতেই মনীশের সুগৌর মুখখানা হইতে কান পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। না, তাহা কখনই হইতে পারে না। উমা যে দেবী, সে কিছুতেই মানবের শ্রেণীতে নামিয়া আসিতে পারিবে না।

হাত দুখানা যোড় করিয়া সে ললাটে ঠেকাইয়া—"ভগবান, আমার মনে পাপ আছে, আমি তার কাছ হতে বহু দূরে থাকব। উমা যে দিকে থাকবে, আমি সেই দিকে যাব না, কিন্তু—তাকে পবিত্র রাখ। সে যে তোমারই নির্ম্মাল্য প্রভু, সংসারের উপরেই তাকে রেখো, সংসারের পঙ্কিলতার মাঝে তাকে ফেল না।"

প্রার্থনান্তে সে হৃদয়ে অনেকটা যেন বল পাইল। রুমালে মুখখানা বেশ করিয়া মুছিয়া ফেলিয়া সে ক্লাসরুমে প্রবেশ করিল।

বৈকাল বেলা বাসায় ফিরিয়া জলখাবার খাইয়া সে ছাদে গিয়া শুইয়া পড়িল। উমার পত্রখানা তাহার সার্টের পকেটেই ছিল, সেখানা বাহির করিয়া আবার পড়িল। একবার দুইবার, দশবার পড়িয়াও তাহার শান্তি হইতেছিল না।

সে নিজেও তো এ কথা জানিত না। সে দিন বড় আঘাতেই তাহার বুকের মধ্য হইতে এই অচিন্তনীয় সত্যটা একেবারে উলঙ্গ ভাবেই বাহির হইয়া পড়িয়া তাহাকেই স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। এ কথা তাহার নিজের কাছেই হয় তো চিরকাল অপরিজ্ঞাত থাকিয়া যাইত—সে উমাকে

ভালবাসে। সে এই ভালবাসাটাকে জোর করিয়া ভগিনী-স্নেহ প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু এ ভগিনী-স্নেহ তো নয়।

আচ্ছা—উমা? উমা যদি এ কথা জানিয়াই থাকে, তবে সে কি ভাবিতেছে? সে মনীশকে কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক ভাবিয়া কি শিহরিয়া উঠিতেছে না?

উমার মূর্ত্তিটা হৃদয়ে কল্পনা করিয়া মনীশ একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেল। সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল—সেই উমা,—যাহার মুখে সর্ব্বদাই হাসি লাগিয়া থাকিত, যে তাহাকে নিজের ভাই মনে করিয়াই অসঙ্কোচে কাছে বসিয়াছে, দাঁড়াইয়াছে, তাহার মুখ কি গম্ভীর, তাহার চোখে কি সে আগুনের মত দীপ্তি! সে যেন মেঘের গর্জ্জনের মতই গর্জ্জন করিয়া বলিতেছে, "এই তোমার মনে ছিল মনীশদা, তোমার মনের মধ্যে এই পাপটা বহন করে তুমি আমার কাছে আস্‌তে?"

এ যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ। ইহার উপযুক্ত শাস্তি মানুষে দিতে পারে না। যে অপরাধ করে, শাস্তি তাহার হৃদয় হইতে উদ্ভূত হয়। সে বড় অসহ্য জ্বালা। সে জ্বালায় মানুষ মরে না, কিন্তু মরণের অধিক যন্ত্রণা ভোগ করে।

মনীশ দুই হাতের মধ্যে মাথাটা লুকাইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, আকাশ অন্ধকার হইয়া উঠিল, সহরের বুকে লক্ষ লক্ষ বাতি জ্বলিয়া উঠিল। পাশের বাড়ীতে একটি মেয়ে হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান গাহিতেছিল,

অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়,
কণাটুকু যদি হারায়, তা নিয়ে প্রাণ করে হায় হায়।

বাস্তবিকই জগতে আমরা থাকি অতি অল্প লইয়া, বেশী করিবার যোগ্যতা থাকিলেও কারবারের ক্ষমতা তো নাই। এই অল্পের মধ্য

হইতেই লোকসানই দিয়া থাকে। কোথায়, কখন যে হারাইয়া যায়, তাহা আমরা ভাবিয়া ঠিক পাই না। কিন্তু সেইটুকুর জন্য আমরা কাঁদি, হাহাকার করি। যে যথার্থ বড়লোক, তাহার সহিত কারবার করিতে গেলে ঠকিতে তো হয়ই না, উপরন্তু সেখানে আমরা লাভই পাই। তবু কেন যে সহজে অগ্রসর হইতে পারি না, তাহা বলিতে পারি না। সংসারে কেবল দিয়া যখন দেখি, সবই গেল, আর কিছুই পাইলাম না, তখনি আমরা কাঁদিয়া সেই বিশ্বপিতার দ্বারে গিয়া অভিযোগ করি, অভাব জানাই।

পূজাহ্নিক সারিয়া মা আসিয়া পুত্রের পাশটায় বসিলেন। তাহার অনাবৃত পৃষ্ঠে বক্ষে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে সখেদে বলিলেন, "দিন দিন তোর চেহারা বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে মনীশ। বুকের হাড়গুলো জির জির করছে, কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে পড়েছে। কিছু দিন আগেও তো তোর এমন চেহারা ছিল না।"

স্নিগ্ধ কণ্ঠে মনীশ বলিল, "আর খাটুনীটাও কি কম মা?"

মা বলিলেন, "সে সত্যি বাছা, একদণ্ড ছুটি নেই তোর। এত খাটাই বা কি দরকার, তা তো আমি বুঝি নে। মাইনে দুশো টাকা যা পাস তাই ভাল, জমিদারীরও যথেষ্ট আয় আছে। আবার এই প্রাইভেট টিউশানি করবারই বা কি দরকার? আজ নেহাৎ শরীরটা এলিয়ে পড়েছে, তাই যেতে পারলি নে বলেই গেলি না। নচেৎ একটা দিন তো জিরাবি নে। মানুষের শরীর তো, ক'দিন বাঁচবি এ রকম করে খাটলে? তিনি গেছেন, আমি যেতে পারলেই বাঁচি তোদের দুটি ভাইকে এমনি রেখে। আমার সদাই ভয় হয়—কখন আমার মাথায় বাজ মেরে তোরা কি করে বসিস্।"

মায়ের চোখের জল হঠাৎ উছলাইয়া উঠিয়া মনীশের পিঠে পড়িয়া

গেল চমকাইয়া উঠিয়া মনীশ হাসিয়া ফেলিল। উঠিয়া বসিয়া মায়ের মুখখানা ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "তুমি তো আচ্ছা পাগল মা, এমনি করে বুঝি আমাদের কথা ভেবে কেঁদেই মর দিন-রাত? না, তোমায় নিয়ে দেখছি ভারি বিপদে পড়া গেল। তোমার কোনও ভয় নেই মা, ভগবান তোমার শেষ না করে আমাদের যাবার আদেশ দেন নি। আমি টিউসানি ছেড়ে দেব, বাস্তবিকই বড় পরিশ্রম হচ্ছে আমার, শরীরে আর সহ্য হচ্ছে না। আমি মনে ভাবছি মা, এই বৈশাখ মাসের প্রথমেই মামার বাড়ী গিয়ে দিন কতক থাকব। এই তো কলেজের বন্ধও এল। এখানে থাকতে মোটেই ইচ্ছা করছে না।"

আনন্দিত হইয়া মা বলিলেন, "আমাকেও তবে নিয়ে চল মনীশ, অনেক কাল সেখানে যাই নি। এ সময়টায় দেশে ঘরে থাকতেই ভাল,—কলকাতাটা মোটেই ভাল লাগে না বাপু।"

মনীশ বলিল, "তোমায় আশ্বিন মাসে নিয়ে যাব মা। বৈশাখ মাসে উমা আসবে বলেছে। সম্ভব, তোমাকে সে সঙ্গে করে নিয়ে প্রসাদপুর ফিরবে। তার আবদার তোমায় রাখতেই হবে, জান তো সে কেমন নাছোড়বান্দা মেয়ে। উমা আসবে বলেই আমি তোমায় এখন নিয়ে যেতে পারব না; আশ্বিন মাসে নিশ্চয়ই নিয়ে যাব।"

মা বলিলেন, "উমা আসবে—তুই থাকবি নে?"

সম্পূর্ণ উদাস ভাবে মনীশ বলিল, "আমি থেকে কি করব মা? আমার স্বাস্থ্য দিন দিন ভারি খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এখানে থাকলে কোন দিন কি হয়ে বসবে, তার ঠিক নেই। আর—দানীশ তো থাকছে, তোমাদের কালীঘাটে নিয়ে যাওয়া, গঙ্গাস্নান করতে নিয়ে যাওয়া, সেই সে সব করবে। সে নেহাৎ ছেলেমানুষ নয়, সব পারবে।"

পুত্রের ভগ্ন স্বাস্থ্যের কথা ভাবিয়া মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া

বলিলেন, "তাই হবে বাবা, তুই মাস-দেড়েক শান্তিপুরে থেকে আয় গিয়ে। শরীরটা যাতে ভাল হয় তাই কর। সুস্থ শরীরের চেয়ে মূল্যবান্ জিনিস জগতে আর কিছু নেই। তাই তো আমি আজ কয় দিন ধরেই দেখছি, দুবেলাই তুই ভাত খেতে পারিস নে, তোর মুখখানা সদা সর্ব্বদা মলিন, ভার মত। দিনরাত কেমন একটা অন্যমনস্কতা। আমার মনে কি সুখ আছে বাবা? তোরা বেশ হেসে খেলে বেড়া, আমি বসে বসে কেবল তাই দেখি। তোদের কিছু খারাপ দেখলে আমার যে কি হয়, তা আর কি জানাব তোকে?"

মনীশ চুপ করিয়া আবার শুইয়া পড়িল। মাও নীরবে পুত্রের গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে মনীশ বলিল, "একটা কথা তোমায় বলতে ভুলে গেছলুম মা। এবার প্রসাদপুর হতে আসবার সময় কাকার মুখে শুনেছিলুম, তিনি আবার উমার বিয়ে দেবেন।"

কথাটা সে এমন ভাবে বলিল, যেন এটা একটা বাজে কথা। সংসারে প্রত্যেক দিন যেমন অনেক কথাই কানে আসে, ইহাও তেমনি একটা কথার কথা মাত্র, বিশেষ করিয়া মনে রাখিবার মত ইহাতে কিছুই নাই।

"উমার বিয়ে।" মা বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "তুই বলিস্ কিরে?"

কষ্টে হাসিয়া মনীশ বলিল, "কেন, বড় আশ্চর্য্যের কথা না কি এটা? সংসারে এ রকম যেন আর হয় না! এটাতে এমন কিছু অস্বাভাবিকত্ব নেই, যা শুনে তুমি চমকে যাবে।"

মা বলিলেন, "বিধবা বিয়ের নামে আশ্চর্য্যের কিছু না থাক, উমার বিয়ে, এ কথাটায় আছে বৈ কি। ঠাকুরপো উমাকে এত শিখিয়ে পড়িয়ে, অমন ভাবে মানুষ করে, শেষে তাকে দুঃখের মধ্যে ফেলবেন?"

মনীশ বলিল, "দুঃখের মধ্যে ফেলা কি? বিয়ে হলে উমা সুখে থাকবে, তিনি তাই মনে করেছেন।"

মা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সুখ? না মনীশ, উমার বিয়ে দিলে সে সুখী হতে পারবে না, এ আমি ঠিক বলে দিচ্ছি। উমার মনটা যে উঁচু সুরে বাঁধা রে! সে যে ছাড়া পাখী। সে কি বন্ধনের মধ্যে আর পড়তে পারে? তাকে আমি যত চিনি, তত কি তোরা চিনিস? তার মনের কথা সব যে খুলে বলে সে আমাকেই, সে যে এ সংসারে শ্রেষ্ঠ রত্ন—কোহিনুর। তার বাপ তাকে সুখী করবার নামে না জানি কি অত্যাচার করছেন, তা বলতে পারি নে। তুই তাকে চিনিস নি মনীশ, সে কারও কাছে ধরা দিতে চায় না। তার মনটা কেমন জানিস? সদ্য-ফোটা যুঁই ফুলটীর মতই, তেমনি শুভ্র, তেমনি পবিত্র, তেমনি সুগন্ধে পূর্ণ। তার আবার বিয়ে—এও কি সম্ভব হতে পারে?"

উমার প্রশংসা শুনিতে শুনিতে মনীশের হৃদয়টা পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সে মনে করিয়া দেখিল, মায়ের বিশেষণগুলা সবই উমাতে খাটে। সে আর্দ্র কণ্ঠে বলিল, "উমা আসবে, তাকে তুমিই জিজ্ঞাসা কোরো মা। আমি পারি নি, এ সম্বন্ধে কোন কথা আমার মুখ দিয়ে বার হতে চায় নি। আমি প্রাণপণে কাকার মনের পরিবর্ত্তন করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই পারি নি। যখন দেখ্‌লুম, কাকা তার বিয়ে দেবেনই, তখন পাত্র নির্ব্বাচন করে দিলুম।"

বিস্ময়ে আত্মহারা মা বলিলেন, "তুই—তুই পাত্র নির্ব্বাচন করে দিলি?"

মনীশ বলিল, "হ্যাঁ মা, আমিই পাত্র নির্ব্বাচন করে দিলুম! তিনি বিয়ে দেবেনই,—উমার কষ্ট দূর করবেনই, এই তাঁর দৃঢ় সংকল্প। আমি তখন প্রভাসকে দেখিয়ে দিলুম। সে বিদ্বান্, সুপুরুষ, ধনী, তার

সঙ্গে উমার বিয়ে—যদি যথার্থ-ই তার বিয়ে দেওয়াই হয়, তবে দেওয়া যেতে পারে। কাকা যখন ঝোঁক ধরেছেন, তখন দেবেনই। কোথায় দেবেন, কার হাতে দান করবেন, তার ঠিক কি? উষাকে যেমন ঘরে দিয়েছেন, উমাকে সে রকম ঘরে দিলে তার যা অবস্থা হবে, সে তো জানাই যাচ্ছে। অনেক ভেবে আমি প্রভাসকেই দেখিয়ে দিলুম।”

মা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিলেন, “তবে আর কি, বড্ড ভাল কাজই করে এসেছিস মনীশ। এই তুই উমাকে ভালবাসিস, এই তুই উমাকে স্নেহ করিস? তুই বলছিস উমাকে তুই কিছু বলতে পারিস নি; কিন্তু এই না বলাটাই যে তোর অন্যায় হয়েছে মনীশ। তুই তাকে কেন তার বিপদের গুরুত্বটা বুঝিয়ে দিলি নে, তাকে কেন তার ভবিষ্যৎটা দেখালি নে? উল্টে তুই তার সর্ব্বনাশের পথটা আরও বিস্তৃত করে দিয়ে এলি? না, এটা তোর উপযুক্ত কাজ হয় নি মনীশ!”

মনীশ নীরবে মায়ের তিরস্কার শুনিয়া গেল। সে কিছুতেই মাকে বলিতে পারিবে না যে, তাহার হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন সত্য বাহির হইয়া পড়াতেই সে স্তম্ভিত, ভীত হইয়া পড়িয়াছিল, উমার কাছ হইতে সে তাই পলাইয়া আসিয়াছে,—উমাকে একটা কথাও সে বলিতে পারে নাই।

মা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, আর কয় দিন পরেই তো উমা আসছে, আমার কথা তার সঙ্গেই হতে পারবে। তুই কাল একবার উষাকে দেখতে যাস, সে বিকেলে খবর পাঠিয়েছিল, তার না কি খুব জ্বর হয়েছে। কত দিন যাসনি দেখতে তার ঠিক নেই। দানীশকে সে দিন পাঠিয়েছিলুম, কিন্তু তারা কেউ সেদিন বাড়ী ছিল না, ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে গেছল। কাল অবশ্য করে একবার যাস। কাল রবিবার—যেতে পারবি সকালের দিকেই!”

আর একটু বসিয়া তিনি আহারাদির উদ্যোগ করিতে উঠিয়া গেলেন।

সকাল বেলা উষার জ্বরটা ছাড়িয়া গিয়াছিল; সে দ্বিতলের খোলা জানালায় বসিয়া পথের পানে চাহিয়াছিল; আজ কয় মাস তাহার বিবাহ হইয়াছে; এখানে আসিয়া তাহার জ্বর হয় নাই। কাল খুব জ্বর আসিয়াছিল, সে চৈতন্যহারা হইয়া পড়িয়াছিল। সেই প্রবল জ্বরের ঝোঁকে মনে পড়িয়াছিল খুব বেশী করিয়া দিদির কথা; তাহার পর পিতা ও ঠাকুর-মা। তাহার জ্বর হইলে দিদি তাহার বিছানা ছাড়িত না; যতবার সে চক্ষু মেলিত, মুখের সামনেই দিদিকে দেখিতে পাইত।

আজ জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু শরীর ভারি দুর্ব্বল, মাথার মধ্যে বুকের মধ্যে যেন আর কিছুই ছিল না। দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া উষা ভাবিতেছিল একটী গ্রামের কথা। সেখানে সকলেই তাহার আপনার ছিল, সেখানে সকলেই তাহাকে বুক দিয়া ভালবাসিত। সে গ্রামের অতি হেয় পদার্থ-টীও আজ তাহার মনে দেবতার আসন বলিয়া বোধ হইতেছিল; সে গ্রামের নীচ অশিক্ষিত লোকগুলাও আজ তাহার চোখে দেবতা।

বিবাহের পরই সে বোর্ডিংয়ে প্রেরিত হইয়াছিল, সেখানে বাধ্য হইয়াই তাহাকে লেখাপড়া শিখিতে হইতেছিল। কি রকম একটা ঘৃণায় ও লজ্জায় সে একেবারে মুসড়িয়া পড়িয়াছিল; তাই সে কথা দিদি বা পিতা কাহাকেও জানাইতে পারে নাই। সে যে বোর্ডিংয়ে আছে সেখান হইতে পত্রও দিত না, শনিবার বাড়ীর গাড়ী গিয়া তাহাকে বাড়ীতে আনিত। এখান হইতেই সে পিত্রালয়ে পত্র দিত, উত্তরও এখানে পাইত।

আজ উষা বসিয়া ভাবিতেছিল, সে কেমন করিয়া পবিত্রা দিদির

পাশে দাঁড়াইবে? সে নিরামিষাশী ছিল, সে অন্য কাহারও বাড়ী আহার করিত না; এ বাড়ীতে কিম্বা বোর্ডিংয়ে জাতিবিচারও ছিল না, আর মাছ মাংস সবই বিনাপত্তিতে চলিত। মালতী দেবী নিজের জন্য স্বতন্ত্র পাক করিতেন, কয়েকদিন মাত্র উষা সেখানে আহার করিতে পাইয়াছিল। তাহার পর একদিন মৃন্ময় স্পষ্ট তাহার মুখের উপর বলিল, উষাকে এরূপ করানো একেবারেই অন্যায় হইতেছে। শুধু তাহার জেদে পড়িয়াই একে সে হিন্দু-গৃহের কুসংস্কারান্ধা একটী বালিকাকে জীবনের সহচারিণী করিয়া আনিয়াছে, এখন তাহার কুসংস্কারগুলি দূর করানো তো চাই, সে অশিক্ষিতা কুসংস্কারপূর্ণা স্ত্রী লইয়া জীবন কাটাইতে পারিবে না।

পুত্রের কথায় মা পুত্রবধূকে আর আমল দেন নাই। বাধ্য হইয়া উষাকে সবই করিতে হইতেছে। কিন্তু বাহিরে সে শিক্ষিতা হইলেও মনটা যে তাহার কুসংস্কারেই পরিপূর্ণ রহিয়া গেছে, মৃন্ময় তাহা দেখিতে পায় নাই।

সে পবিত্র ভবন, সেই পবিত্রচিত্ত পিতা, দিদি, ঠাকুরমা,—উষা হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তাঁহারা জানেন; তবে জানিয়া শুনিয়াও উষাকে এমন জায়গায় বিবাহ দিয়াছেন, তাহার অপরাধ কি?

মনে পড়িল দিদির একখানা পত্রের কথা, এখানি সে কাল মাত্র পাইয়াছে। কাল বোর্ডিং হইতে বাড়ী আসিয়াই সে পত্রখানি পাইয়াছিল; পাছে কেহ দেখে বলিয়া তখনই পত্রখানা ছিঁড়িয়া সে পার্শ্ববর্ত্তী বাগানে ফেলিয়া দিয়াছিল। উমা নানা কথার পরে লিখিয়াছে—"বোন, তুমি আমাদের কোনও কথা না লিখিলেও আমরা মনীশদার কাছে তোমার সকল খবর পাইয়াছি। আমরা যাহা আশা করিয়াছিলাম তাহার বেশী ফল পাইয়াছি। তোমায় তাঁহারা বোর্ডিংয়ে রাখিয়াছেন তাহাও

শুনিলাম। আমরা অবশ্য আশা করি নাই যে তাঁহারা সত্যই এতদূর শিক্ষিত, ইংরাজী যে মেয়ে জানে না, সত্যই তাহাকে লইয়া ঘর করিতে পারিবেন না। তোমার শাশুড়ীর মত যে দাঁড়াইতে পারে নাই, তাহাও মনীশ-দা বলিলেন। দুঃখ করিয়ো না ভাই, ধরিয়া লও, ইহাও তো সেই ভগবানেরই দান। তোমাকে তাহারা চিনিতে পারে নাই, চিনিয়াছেন তোমার শাশুড়ী; কিন্তু তিনি রমণী, তাঁহার শক্তি ক্ষীণ, তাই তাঁহার কার্য্য ফল উৎপন্ন করিতে পারিল না। যাহাই হউক, ঈশ্বরের আদেশরূপে—যাহা সম্মুখে আসিতেছে তাহাই গ্রহণ কর। মনকে ঠিক রাখিয়ো, মনে ত্যাগের আদর্শ আঁকিয়া রাখ, বাহিরের এই ভোগ মিথ্যা হইয়া যাইবে। ইহার পরে—বাস্তবিকই এমন দিন আসিতে পারে, যে দিন মনের ত্যাগই একমাত্র পরম সত্যরূপে তোমার চোখে প্রতীয়মান হইবে। যাহা তাঁহারা বলিবেন, যাহা তাঁহারা করাইবেন, অসঙ্কুচিত চিত্তে করিয়া যাও। তোমার জন্য তো তুমি সৃজিত হও নাই, মানবের জন্য হইয়াছ। যাহাদের জন্য তুমি—তাহারা যাহাতে আনন্দ পায় তাহাই করিবে; সর্ব্বদা মনে করিয়া রাখিবে এ ভগবানের আদেশ মাত্র, তাঁহার আদেশ পালন করিতেই হইবে।"

পত্রখানার কথা আগাগোড়া মনে করিতে উষার চোখের জল শুকাইয়া উঠিল; একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে ভাবিল, তাই হোক, দিদির কথা কখনও সে ঠেলে নাই, কখনও ঠেলিবে না।

দরজার ভারি স্ক্রীনটা সরাইয়া গৃহে প্রবেশ করিতে করিতে শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে মালতী দেবী বলিলেন "কেমন বোধ হচ্ছে শরীরটা মা?"

উষা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ধরা কণ্ঠে বলিল "জ্বর নেই, কিন্তু তত ভাল লাগছে না।"

মালতী দেবী স্নিগ্ধ হাতখানা তাহার ললাটে দিয়া দেখিলেন; তাহার

ললাটোপরি পতিত অলকগুচ্ছ সরাইয়া দিতে দিতে সস্নেহ কণ্ঠে বলিলেন "আঃ, একটা দিনের জ্বরে মার আমার কি চেহারাই হয়ে গ্যাছে। মৃন্ময়কে খবর পাঠিয়েছি, সে এসে একবার দেখে যাক, ওষুধ দিক। শীগ্‌গির করে জ্বরটা সেরে যাক, আমি বাঁচি।"

তাঁহার এই স্নেহপূর্ণ কথাগুলি শুনিয়া বালিকার চোখে আবার জল আসিয়া পড়িল, আবার দিদির কথাটা তাহার মনে ভাসিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে চোখ ভাসাইয়া জল টপ টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

মালতী দেবী তাহার অন্তরের কথা বুঝিলেন; তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া অঞ্চলে তাহার মুখখানা মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "ছি মা, কাঁদতে নেই। বাপের জন্য মন কেমন করছে? আমি নিজের হাতে তাঁদের পত্র লিখে দেব আসতে, তাঁরা আমার কাছে থাকবেন, একটা দিন থেকে তোমার সঙ্গে দেখা-শোনা করে চলে যাবেন।"

উষা তাঁহার বুকের মধ্যে মুখখানা লুকাইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "তাঁরা এখানে কক্ষনো আসবেন না।"

মালতী দেবী বলিলেন, "আচ্ছা, এখানে না হয় নাই আসবেন, মনীশের বাড়ীতে আসবেন তো? আমি তাই লিখে দেব, তোমায় মনীশের বাড়ীতে দুদিনের জন্য জোর করেও আমি পাঠিয়ে দেব। কেঁদ না মা লক্ষ্মী, ছি, কাঁদলে মাথা ধরে আরও বেশী জ্বর আসবে'খন। কাল তোমার বেহুঁস জ্বর দেখে আমি তখুনি মনীশের কাছে লোক পাঠিয়েছিলুম, সে তখন কলেজে ছিল, তার মা বলেছেন পাঠিয়ে দেবেন। কাল হয় তো কোন ক্রমে আসতে পারে নি, আজ রবিবার আছে, নিশ্চয়ই আসবে'খন।"

সতী দরজার বাহির হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "মা কি এ ঘরে?"

তীব্র কণ্ঠে মা বলিয়া উঠিলেন "হ্যাঁ, মেম সাহেবের কিছু দরকার আছে নাকি ?"

অপ্রস্তুত হইয়া সতী গৃহে প্রবেশ করিল, তাহার হাতে খান-কত বই ছিল। সে বলিল "দরকার কিছু নেই মা। বউদিকে দেখতে আসার কথা দাদাকে বলতে গেলুম, দাদা বললে আগে কল হতে ফিরে আসি।"

মালতী দেবীর মুখখানা অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিল ; খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন "ভারি খুসী হয়েছি এ কথা শুনে।"

সতী বই কখানা টেবিলে ফেলিয়া উষার পাশে বসিয়া পড়িল, "আমি সকাল বেলাই বউদির টেম্পারেচার নিয়ে গেছি, চা পাঠিয়ে দেছলুম, টেবলে পড়ে আছে দেখছি, খাওনি বউদি ?"

উষা উত্তর দিবার আগেই মালতী দেবী বলিলেন "যে তোমাদের দয়ার দান সতী, ও দান না নেওয়াই ভাল। ছেলে মানুষ—একে তোমাদের নিজের চোখে দেখা-শোনা করাই উচিত। এখন এর কি জ্ঞান হয়েছে, এখন কি মায়া বসেছে ? তোমরা নিজেরা কি রকম ব্যবহার করেছ বল দেখি ? ছিঃ, লেখাপড়ায় জ্ঞান হয় না, ওতে কেবল অহঙ্কারই বাড়ে।"

অভিমানে সতীর হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল, উষা তাড়াতাড়ি বলিল, "না মা, দিদি আমায় বড় ভালবাসে। বোর্ডিংয়ে থাকতে দিদি রোজ দুবেলা আমার কাছে যায়, এখানে কাল সমস্ত দুপুর দিদি আমার কাছে ছিল। দিদি আমায় খুব ভালবাসে মা।"

সতী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "মা মনে করেন, তিনি একলাই বউদিকে ভালবাসেন, আমরা কেউ ভালবাসি নে। তবে দাদার কথা আলাদা। আমার সঙ্গে দাদার সঙ্গে কথা কি ? দাদা আলাদা মতে চলে, আমি কি দাদাকে এ জন্যে ভাল বলি ?"

"মা এ ঘরে আছেন নাকি ?"

মনীশের কথা শুনিবামাত্র সতী তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিল, উষার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল, সে দরজার পানে চাহিল। মালতী দেবী বলিলেন, "আছি বাবা, এসো।"

মনীশ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া মালতী দেবীকে প্রণাম করিল, আশীর্ব্বাদ করিয়া মালতী দেবী বলিলেন, "বস বাবা, সতী, চেয়ারখানা এগিয়ে দে তো মা!"

সতী উঠিতেই ব্যস্ত হইয়া মনীশ বলিল, "না, না, চেয়ার দিতে হবে না। তুমিও কি পাগল হয়েছ সতী ; বি-এ পড়ছ, এ জ্ঞানটুকু হল না—মা বসবেন নীচে—আর আমি বসব উপরে। এ কি কখনও হয়? না হতে পারে—হয় তো তোমাদের শাস্ত্রে এ কথা বলে, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে এ কথা বলে না।"

সতীর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, সে বলিল "আপনাদের শাস্ত্র আর আমাদের শাস্ত্র বুঝি পৃথক্? মাকে সম্মান দেখানো—সে শিক্ষিতেরও কাজ নিরক্ষরেরও কাজ। আপনারা যত কথা বলেন, সব আমাকেই লক্ষ্য করে, আমি যে লেখাপড়া করি—"

অভিমানে সত্যই তাহার কণ্ঠ একেবারেই রুদ্ধ হইয়া গেল, চোখ দিয়া জলও বাহির হইয়া পড়িল।

মনীশ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল "ভাল পাগলের পাল্লায় পড়েছি তো। মা, সতী হাজার লেখাপড়া শিখলেও অভিমানে তার চোখের জল সামলাতে কখনো পারবে না, এ আমি ঠিক বলে দিচ্ছি। আচ্ছা সতী, এতে তোমার চোখের জল ফেলার কারণটা কি হল বল তো?"

মালতী দেবী হাসিলেন, বলিলেন "ও মনে ভাবছে—ও লেখাপড়া করছে বলে সবাই ওকে মেমসাহেব ভাবে। ও মেমসাহেব হতে আদতেই চায় না। তুমিও মেমসাহেব বলে মাঝে মাঝে ডাক ; তা কোনদিন

মুখোমুখি তোমার সামনে ঝগড়া করতে পারে না, যত অভিযোগ হয় আমার কাছে। আজ সেটা মুখ ফুটে তোমার সামনেই বেরিয়ে পড়েছে।"

মনীশ হাসিমুখে বলিল "মেমসাহেব বললে সতী রাগ করে, কিন্তু আমার স্বভাব কি জানেন মা, যে যাতে রাগ করে আমার তাই করতে আরও ভাল লাগে।"

সতী মুখভার করিয়া বলিল "তবে আরও বেশী করে বলবেন। আপনি বসবেন, না দাঁড়িয়েই থাকবেন ?"

"এই যে, মার কাছে বসছি—"

মনীশ মালতী দেবীর পার্শ্বে বসিয়া পড়িল, "উষার জ্বর ছেড়েছে ? দেখি ভাই, হাতখানা তোর ?"

নাড়ীজ্ঞান নাকি তাহার বেশ ছিল। উষার হাতখানা পরীক্ষা করিয়া গম্ভীর মুখে সে বলিল "জ্বরটা ছেড়েছে বটে, কিন্তু আবার জ্বর আসবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। এই সময়টার ওষুধ পড়লে খুব ভাল হতো।"

মালতী দেবী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আর বাবা তুমিও যেমন ; বাড়ীতে এত বড় একটা ডাক্তার, একবার চোখে যে দেখবে তার সে সময়টাও নেই। কি হতভাগা কপাল নিয়ে এসেছি মনীশ, যদি শোন তবে সব বুঝতে পারবে।"

মনীশ বলিয়া উঠিল "থাক মা, ও সব কথা বলে কোনও লাভ নেই, ওতে কেবল মনে কষ্টই হয়।"

মালতী দেবী বলিলেন "কষ্ট কি আর বেশী হবে বাবা ? বুকের মধ্যে দিনরাত যে আগুন জ্বলছে, তার বেশী আর তো কিছুই নেই। স্বামীকে তো দেখছ, বিলেত হতে যখন ফিরে এলেন, আমায় আনা তো দূরে থাক, একটা খবর পর্য্যন্ত দিলেন না। বাপের বাড়ীর কেউ এখানে আমায় পাঠাতে রাজি হলেন না, কারণ তাঁরা জানেন এখানে এলে আমিও খৃষ্টান

হয়ে যাব। অবশেষে মাসীর ছেলের সঙ্গে আমি পালিয়ে আসি, পেছনে রেখে এলুম কলঙ্ক;—সবাই বললে আমি কুলত্যাগ করেছি, কার সঙ্গে গেছি তার ঠিক নেই।"

তাঁহার কণ্ঠ বড় করুণ হইয়া উঠিল; তিনি আবার বলিলেন, "জানতুম, আর আমি সেখানে যেতে পাব না; বাপ, মা, ভাই, বোন, কারও সঙ্গেই আমার আর মিলন হবে না। আমি এখানে এলুম, স্বামী আমায় গ্রহণ করতে চাইলেন না, কারণ আমি অশিক্ষিতা, গ্রাম্য কিশোরী মাত্র। কিন্তু সেই কিশোরীর মনেও বিশ্বাস এত দৃঢ় ছিল, সে কিছুতেই আর ফিরে গেল না, সে এখানেই পড়ে রইল। চোখের সম্মুখে স্বামীর অবাধ ব্যভিচার দেখতুম। আমার কিছু ভেব না বাবা, সত্যই আমার বুকে বড় আঘাত লেগেছে, নইলে এ সব কথা কখনও আমার মুখ দিয়ে বার হত না।"

তাঁহার চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল; তাই চোখ মুছিয়া শান্ত কণ্ঠে বলিলেন "ক্রমে সবই সয়ে গেল, ক্রমে তাঁর ধর্ম্ম-স্ত্রীরূপে পরিচিতা হতে আমিই হয়েছি। আমার একটি ছেলে, একটি মেয়ে, সংসারের গৃহিণী আমি, কিন্তু আমার অধিকার আমি বাইরে বিস্তার হতে দেই নি, এই অন্তঃপুরটার মধ্যেই আমি আপনাকে বন্ধ করে ফেলেছি। মৃন্ময় তার পিতার শিক্ষায় শিক্ষিত, তবু কেন যে সে আমার কথা রাখতে এই অশিক্ষিতা বালিকাকে বিয়ে করে আনলে তা জানি নে। কিন্তু আমায় সে কিছুমাত্র সুখী করতে পারে নি। সে ভবিষ্যতে সুখী হবে বলে আমিই জোর করে উষাকে আমার কাছছাড়া করেছি, তাকে বোর্ডিংয়ে রেখে ইংরাজী পড়াচ্ছি; বাড়ীর পড়া যদিই তার পছন্দ না হয়—তাই; কিন্তু এত করেও তার মন পাই নি। এই নির্দ্দোষী বালিকাটিকে যে সে দেখতে পারে না, এইটিই আমার বুকে বড় আঘাত দেছে।"

বাহির হইতে তাঁহার দাসী ডাকিল "মা, আপনার ভাত হয়ে গেছে বোধ হয়।"

চোখ মুছিয়া বিকৃত কণ্ঠে মালতী দেবী বলিলেন "যাচ্ছি।"

সতী মায়ের পানে চাহিয়া কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিল "আমি যাব মা ?"

মালতী দেবী বলিলেন "হ্যাঁ, তুমি যাও, আর হাতটা পুড়িয়ে এস, তখন আবার কথা শুনি। তোমাদের কারও কিছু করে দরকার নেই বাছা, রান্নার দিকে তোমাদের গিয়ে দরকার নেই।"

সতী মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল ; খানিক পরে মনীশের পানে চাহিয়া বলিল "দেখলেন, শুনলেন, মার কথা ? এই জন্যে আমার এত রাগ হয় যে, মনে করি আমার বইগুলো সব নিয়ে গিয়ে উনানে ফেলে দেই। আমি যেন বাবারই মেয়ে—ওঁর কেউ নই।"

তাহার মুখখানা—সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বরটাও বিকৃত হইয়া উঠিল।

মনীশ মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল "বাস্তবিক মা, এ যে আপনার অন্যায় কথা। আপনি জানেন মেয়েরা মায়ের কাছেই প্রায় থাকে, মায়ের কাজ তারা প্রাণপণে—জানা না থাকলেও করতে যায় ; আপনি এমন করে কেন সতীকে বলেন ?"

মালতী দেবী মনীশের কথায় একটু হাসিলেন ; বলিলেন "না মনীশ, অবশ্য আমার মনের ভাবটা তা নয়, আর ওঁরও এদিকে নজর নেই। বাড়ীর ভেতরে মেয়েরা কাজ করুক, বাইরে ঠিক মতই তাঁর পাশে থাকা চাই। এখন আমার পরে সব ভার তিনি ছেড়ে দেছেন, এমন কি নিজের ভারটা পর্য্যন্ত। মানুষের বয়েস বেশী হলে তখন বুঝতে পারে কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ ; কাজেই প্রত্যেক কথায় কাজে কুসংস্কার বলে আর চেঁচিয়ে উঠতে পারেন না। মেয়েটা যেমন লেখা-পড়া শিখছে তেমনি কাজ কর্ম্মও করুক, তাই তিনিও এখন চান ; কিন্তু আমিই আমার দিকে তত

বেঁসতে দেই নে। কি জানি, মনীশ, ওরা কত জাত ছোঁয়, পায়ে দিন-রাতই জুতো পরে, কত কি খায়—"

সতী বলিল "এখন তো আমি স্নান করে এসেছি মা।"

মালতী কন্যার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন "আর—আনাড়ি হাত, পুড়ে গেলে মরবি যে তখন।"

সতী ওষ্ঠ ফুলাইয়া বলিল "তুমিই তো আনাড়ি করে করে রাখ মা, ছুঁতেই চাও না যে, রান্নাঘরে উঠতেই দাও না।"

মনীশ বলিল, "তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর হয়ে গেল সতী, যাও, আমি আদেশ দিচ্ছি তুমি অনায়াসে ভাত নামিয়ে আসতে পার, আর তোমায় সঙ্গে সঙ্গে আশীর্ব্বাদও করছি তোমার হাত পুড়বে না, অক্ষত দেহে তুমি ফিরে আসবে।"

সতী গর্ব্বিতভাবে মায়ের পানে চাহিয়া চলিয়া গেল। মনীশ বলিল, "তফাৎ করে নিজের মেয়ে-ছেলেকে রাখবেন না মা, ওতে আপনার শুচিতার একটু হানি হয় হোক। শুচিতা আপনার সঙ্গে আসেও নি, সঙ্গে যাবেও না। ছেলেমেয়েও আপনার সঙ্গে যাবে না, কিন্তু এদের দিয়ে যে কাজটা করিয়ে যাবেন সেটা থেকে যাবে। ওরাই আবার ছেলেমেয়ের বাপ মা হবে, ওদের শিক্ষা সঞ্চালিত হবে। ওদের কাছে ডেকে নেবেন মা, ওদের শুধু বাইরের শিক্ষা দেবেন না, আপনার শিক্ষাও দেবেন; তবেই সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা হবে, নচেৎ আধখানাই বৃথা থেকে গেল। যাক সে সব, ঊষা বুঝি কাল এসেছিল বোর্ডিং হতে?"

ঊষা বলিল, "হ্যাঁ! মনীশ দা, প্রসাদপুর গেছলে, কি রকম দেখলে সেখানে, সব ভাল আছেন তো? দিদি কি বললে, বলুন না?"

সে যে পড়িতেছে, বোর্ডিংয়ে থাকে, সে কথাটা সে গোপন করিতে চায়।

মনীশ বলিল, "হ্যাঁ, সব ভাল।"

ঊষা অভিমানের সুরে বলিল, "সেখান হতে এসেছও তো আজ পনের ষোল দিন মনীশ দা, একদিনও কি এখানে এসে খবর দিতে নেই?"

মালতী দেবী সতীর কাজ দেখিতে উঠিয়া গেলেন। মনীশ বলিল, "কি করে আসি দিদি বল্ তো? তুই তো এখানে থাকিস নে, শনিবারে আসিস, রবিবারে থাকিস, আর রবিবারে গেছলুম শিবপুরে একটা দরকারে; তবে যদি বলিস বোর্ডিংয়ে গিয়ে দেখা করতে,—কিন্তু—"

সবেগে মাথা নাড়িয়া ঊষা বলিয়া উঠিল, "না, তোমার সেখানে যেতে হবে না। ওখানে আবার মানুষে যায়?"

মনীশ হাসিল।

ঊষা বলিল, "দিদি কিছু বললে না, আমি যেতে পাব না শুনে, দিদি কাঁদলে না?"

মনীশ বলিল, "কাঁদবে কেন ঊষা? তোর দিদি এই বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি আসবে লিখেছে।"

উৎসাহিতা ঊষা বলিল, "তোমার বাড়ীতে এসে থাকবে?"

মনীশ বলিল, "নয় তো কি,—তোর শ্বশুর-বাড়ীতে আসবে?"

ঊষা বলিল, "আমি কি তাই বলছি না কি? দিদি এলে আমায় নিয়ে যাবে তো মনীশ দা?"

মনীশ বলিল, "আমি তো এখানে থাকব না ভাই, এই আসছে সোমবারে আমি মামার বাড়ী বেড়াতে যাব, মাস দেড়েক পর—অর্থাৎ কলেজ খুললে পরে আমি ফিরে আসব। তা—তোর যাওয়ার ব্যাঘাত হবে না, আমি মাকে বলে যাব'খন—যদি উমা আসে তবে দানীশ তোকে নিতে আসবে, এঁরা তোকে নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেবেন।"

সতী রুমালে হাত মুছিতে মুছিতে গৃহে প্রবেশ করিতেছিল, বলিল, "হঠাৎ মামার বাড়ীর পরে এতটা ভক্তি হল যে; আমি তো বোধ হয় কখনও শুনিনি যে আপনার আবার মামার বাড়ী আছে।"

মনীশ হাসিমুখে বলিল, "অর্থাৎ বিশেষ দরকার না পড়লে লোকের, বিশেষ আমাদের মত লোকের মামার বাড়ীর কথা মনে হয় না। স্বাস্থ্যটা বেজায় খারাপ হয়ে গ্যাছে। ডাক্তারকে দেখিয়েছিলুম দেহটা, তিনি ব্যবস্থা করেছেন দিন কতক অন্য জায়গায় যেতে। এই গরম কাল, এ সময় কোন্ দেশে আর যাব, কাজেই অসহায়ের সহায় মামার বাড়ীই এখন সম্বল।"

সতী উদ্বেগপূর্ণ চোখে মনীশের পানে চাহিল; তাই তো, মনীশের চেহারা তো খুবই খারাপ হইয়া গিয়াছে। তাহার বড় বড় চোখ দুইটা ভিতরে বসিয়া গিয়াছে, তাহার চোখের নিম্নে কালি পড়িয়াছে। মুখখানাও অত্যন্ত শুখাইয়া গিয়াছে। এতক্ষণ যে মনীশের পানে চাহিয়াও কাহার শরীরটা চোখে পড়ে নাই, ইহা ভাবিয়া সতী কি জানি কেন—ভারি কুণ্ঠিতা হইয়া পড়িল।

সতী তাহার পানে চাহিয়া আছে দেখিয়া মনীশ হাসিয়া বলিল, "চেয়ে দেখছ সতী, কতখানি রোগা হয়ে গেছি, না?"

সতী উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "বাস্তবিক তাই দেখছি। সত্যি আপনার চেহারাটা ভারি খারাপ হয়ে পড়েছে। আপনাকে কিছুদিন অন্য জায়গায় থাকা উচিত। আর আপনি নিজের পানে তাকাতে একেবারেই উদাসীন। ও-রকম করলে কয়দিন শরীর টেঁকতে পারে?"

তাহার কণ্ঠস্বরে একটা প্রচ্ছন্ন বেদনার ঝঙ্কার ফুটিয়া উঠিতেছিল।

মনীশ বলিল, "আমি তাকাতে উদাসীন—কারণ একজন তাকাতে আছে যে—যতদিন মা থাকবেন ততদিন নিজের পানে কে চায়? যা হয় মা করবেন, আমি তার কি জানি?"

সতী বলিল, "মা যখন না থাকবেন তখন তা হলে কি অবস্থা হবে আপনার? এর পরে কখনও কি নিজের পানে তাকাবেন?"

উষা মাঝখান হইতে বলিল, "তখন বউদি থাকবে যে, বউদি সব দেখবে। এখন যেমন আছ মনীশ দা, বউদি এলে আর তেমনটী থাকতে হবে না।"

মনীশ হাসির সহিত রাগ মিশাইয়া বলিল, "তুই দিন দিন ভারি বখাটে হচ্ছিস উষা, আমি দেখছি বিয়ে হয়ে তুই আরও বয়ে গেছিস। বউ এলেই যদি কান ধরে উঠায় বসায়, তবে মৃন্ময়ের এমন অবস্থা কেন।"

এই একটা কথাতেই উষা উঠিয়া পলাইল।

সতী হাসিয়া বলিল, "বউদির মত মেয়ে হলে এমনিই হয় বটে, কিন্তু যদি তেমনি মেয়ে হয়, তবে—"

বাধা দিয়া মনীশ বলিল, "আমার অদৃষ্টে বিধাতা তা লেখেন নি। হাত দেখা জানো সতী, কোষ্ঠি কাকে বলে তাও বোধ হয় জানো। আমার কোষ্ঠিতে আছে আমার বিয়ে হবে না, আর বাস্তবিক আমি বিয়ের 'পরে একেবারেই চটে আছি। যাক, সে সব কথা; ভাত নামিয়েছ, হাত পোড়ে নি তো?"

সতী একটা নিঃশ্বাস খুব সতর্কে ফেলিয়া বলিল, "না।"

"দেখলে আমার আশীর্ব্বাদের জোর—"

মনীশ উঠিয়া পড়িল,—"যাচ্ছি আজকের মত, কাল একবার এসে দেখে যাব। আর—সতী, তোমায় একটা কাজ দিয়ে যাই—"

সতী বলিল, "বলুন।"

মনীশ বলিল, "তোমার দাদা আসবামাত্র ধরে এনে তোমার বউদিকে দেখিয়ো, আর ওষুধ নিয়ে তুমি নিজের হাতে খাইয়ো। উষাটা এমন দুরন্ত মেয়ে যে, কিছুতেই ওষুধ খেতে চায় না, লুকিয়ে ফেলে দেয়। ওকে

উমা একটুও বিশ্বাস করত না। আমি তোমায় এই ভারটা দিয়ে যাচ্ছি, করবে তো ?”

সতী অবনত মস্তকে বলিল, “এ আমাদেরই কর্ত্তব্য কাজ, অবশ্য করতেই হবে। আপনি বিকেলে একবার আসবেন অবশ্য করে, দেখে যাবেন।”

মনীশ একটু ভাবিয়া বলিল, “দেখি, পারি তো আসব।”

মনীশ বাহির হইয়া গেল।

রাত্রি তখন অনেক হইয়া গিয়াছে। সতী তখনও উষার গৃহে বসিয়া ছিল। উষার দুপুরে জ্বর আসিয়াছে, এখনও সে জ্বর সমভাবে রহিয়াছে। মৃন্ময় বৈকাল বেলা বেড়াইতে গিয়াছে, এখনও আসে নাই। প্রায়ই ফিরিতে তাহার রাত্রি হইত।

মালতী দেবী গৃহে প্রবেশ করিতে করিতে চাপাস্বরে বলিলেন, "তুই এখনও বসে আছিস সতী, শুতে যাস নি যে?"

সতী উত্তর দিল, "কেমন করে যাই? মাথায় আইসব্যাগ ধরে বসে আছি। জ্বর যেমন তেমনই আছে, কেবল বকছে, কাঁদছে, একটা মানুষের এখানে থাকা চাই তো।"

মালতী দেবী বলিলেন, "আমি থাকছি, মনীশ এসেছে, সেও মৃন্ময়কে ধরে নিয়ে আসছে, তুই এবার যা।"

"যাচ্ছি" বলিয়া সতী তথাপি বসিয়া রহিল।

মা বলিলেন, "সামনে তোর একজামিন আসছে, দুটো বছর পড়ে পড়াটা মাটী করবি সতী? আজ কয়দিন তো পড়া মোটে করিস নি, আজ এই ঘরেই কাটালি, এই রকম করলেই একজামিন দিবি খুব ভাল।"

দরজার কাছে মৃন্ময়ের কথা শোনা গেল, "আঃ, টানাটানি কর কেন, আমি যাচ্ছি তো।"

মনীশ তাহার হাতখানা ধরিয়া টানিতেছিল, বলিল "টেনে না আনলে কত যে এস, তা আমিই জানি। আজ সারাদিন বেচারাকে একবার দেখলে না, এক ডোজ ওষুধ পর্য্যন্ত দিলে না, অথচ তুমিই হচ্ছ ডাক্তার। তোমার বাড়ীতে তোমার স্ত্রী বিনা ওষুধে ভুগবে, তুমি বাইরে লোকের

নাড়ী টিপে ওষুধ খাইয়ে বেড়াবে? দেখ, যাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছ, তার সম্বন্ধে এতটা উদাসীন হওয়া তোমার কোন মতেই মানায় না।"

মালতী দেবীকে দেখিয়া সে বলিল, "এই যে মা, আপনি এসেছেন। আমি ভাবছিলুম আপনাকে ডাকতে পাঠাই। এই দেখুন, মৃন্ময়কে ধরে আনলুম। তার দায়িত্ব, না আমার দায়িত্ব বলুন দেখি? আমার বোন, তার স্ত্রী। আমাদের এখন কোনও দাবী নেই, দাবী তো ওর, তবে ও দেখবে না কেন?"

মৃন্ময় তাহার মুখখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "থাক, তোমার হাতে ধরছি, আর অনর্থক বোকো না। আমি সময় পাই নি সারা দিন তাই—"

বাধা দিয়া মনীশ বলিল "রাখো তোমার সময় পাই নি কথা। নাও, আগে দেখ, একটা কোন ওষুধ দাও, ওটা আমাদের চেয়ে তুমিই বোঝ ভাল, তোমার ব্যবসাই ওই। আমরা কেবল নাদানে গুরু, অর্থাৎ ছেলে ঠেঙিয়ে মানুষ করি, আর কিছু করবার ক্ষমতা নেই।"

মৃন্ময় আর কথা না বাড়াইয়া স্ত্রীকে পরীক্ষা করিল, তাহার পর মুখটা একটু গম্ভীর করিয়া বলিল "চল, ওষুধ দিচ্ছি।"

মনীশ বলিল "শুধু ওষুধ দিয়েই কর্ত্তব্য ফুরাবে না বন্ধু, এখানে থাকতে হবে।"

মৃন্ময় চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া বলিল "এখানে—আমি?"

মনীশ তাহার স্কন্ধে একটা চপটাঘাত করিয়া বলিল "হ্যাঁ, তুমি। তুমি একটা কেষ্ট বিষ্ণু নও যে থাকতে পারবে না। বিলাত হতেই এস আর যাই কর, তুমিও একটা মানুষ, আর তোমারই স্ত্রী এ। মা, সতী এঁদের থাকার চেয়ে আমার মনে হয় তোমার আমার থাকা ভাল।"

বিস্ময়ে মৃন্ময় বলিল "তুমিও থাকবে?"

মনীশ বলিল "নিশ্চয়ই থাকব। ভয় নেই, তোমায় কিছু করতে হবে

না, তুমি এই কৌচটায় পড়ে অনায়াসে এক ঘুমে সকাল করতে পারবে, যা করতে হয় তা আমিই করব।”

মৃন্ময় বলিল “ঘুমাবই যদি—তবে থেকে লাভ ?”

মনীশ বলিল “লাভ যথেষ্ট আছে বন্ধু, লাভ না থাকলে মনীশ এ কাজ করতে আসে না। কাল আমি তোমার যত বন্ধু আছে, সকলকে ডেকে বলব, মৃন্ময়ের স্ত্রীর জ্বর হয়েছিল, মৃন্ময় সারারাত ধরে তার সেবা করেছে।”

মৃন্ময় একটু হাসিল, তাহার পর ঔষধ আনিতে গেল।

সতীকে ও মালতীদেবীকে উঠাইয়া দিয়া তাহারা উভয়ে সেই গৃহে রহিল।

সামনে খোলা ছাদ, তাহার ওদিকে পাশাপাশি কয়েকটা কক্ষ, ইহারই একটাতে সতী থাকিত।

সতী ঘরে গেল না, চুপ করিয়া খানিকটা খোলা ছাদে দাঁড়াইয়া রহিল।

কি জানি কি একটা বেদনা তাহার বুকের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল, কি জানি কেন, আজ তাহার মনে হইতেছিল সে একবার কাঁদে, কাঁদিয়া বুকের ব্যথাটাকে কতকটা কম করিয়া ফেলে। কোনও একটা অছিলা সে খুঁজিয়া পায় নাই, যাহাতে সে কাঁদিতে পারে।

ঊষাই মনীশের চোখে বড় অভাগিনী ;—কিন্তু কেন সে অভাগিনী ? ঊষা সুখিনী, সে জগতের সব জিনিসই পাইয়াছে, স্বামীর ভালবাসা—তাহাও পাইবে। মনীশ ঊষাকে বড় ভালবাসে—কিন্তু কেন এ ভালবাসা ? কাহার খাতিরে এ ভালবাসা ? ঊষার জন্য ঊষাকে ভালবাসা। কিন্তু এ সে রকম নয়, বন্ধুর জন্য বন্ধুকে ভালবাসা,এ সে ভালবাসাও নয় ; এ ভালবাসা আর একজনের খাতিরে, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী সতী তাহা বুঝিয়াছে।

উমার কষ্ট হইবে ভাবিয়াই মনীশ উষাকে এত টানিতেছে। সতী দুই করতলে মাথা রাখিয়া উমার কথাই ভাবিতে লাগিল।

কে সে উমা, কি রকম সুন্দরী সে, কি রকম লেখাপড়া সে জানে, যাহাতে মনীশ একেবারে মুগ্ধ? উমার নাম করিতে মনীশের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে, তাহার চোখ দুইটা অসম্ভব দীপ্ত হইয়া উঠে। সতী বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে, মনীশ কতদূর ভক্তি, কতদূর শ্রদ্ধার সহিত উমার নামটা উচ্চারণ করে। উমার বর্ণনা করিতে মনীশ একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়ে।

উমা মনীশের কে?

মনীশ উমাকে ভালবাসে, ভক্তি করে, এই কথাটা মন যেমন সহজে মানিয়া লইতে চায়, আবার কোথা হইতে কে আপত্তি করে—না তাহা হইতে পারে না। এ যেন একেবারেই অসম্ভব, মনীশ কাহাকেও ভালবাসিতে পারে না।

সতী সামনের গৃহটার পানে চাহিল, সে গৃহ হইতে মনীশের হাসি ভাসিয়া আসিতেছিল; সঙ্গে সঙ্গে দাদার কণ্ঠ ভাসিয়া আসিল—"আঃ, কি পাগলামী কর মনীশ, তোমার ছেলেমানুষি এখনও গেল না দেখছি। রোসো, এবার বিয়ে দিয়ে একটা বউ এনে দিচ্ছি, তখনই থাকবে জব্দ, কারও কাছে আর টুঁ শব্দটী করতে পারবে না।"

মনীশ কি বলিল শোনা গেল না।

সতী কান পাতিয়া ছিল সেই উত্তরটা শুনিবার জন্য, কিন্তু না, তাহার কানে মনীশের একটা কথাও আসিয়া পৌঁছিল না।

কি কথা সে শুনিবে? মনীশের যা কথা তাহা তো শুনিয়াছেই সে; মৃন্ময়কেও সেই কথা বলিল, আর কি বলিবে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সতী কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

পরদিন হইতে মা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন সে লেখাপড়ার মধ্যে একেবারেই ডুবিয়া গেল। সামনে একজামিন, আর কয়দিন পরেই আরম্ভ হইবে; দিনকতক সে মোটেই যে বইতে হাত দেয় নাই, তাহারই কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে লাগিল। কদাচিৎ দুই একবার উষার কাছে সে যায়, যে সময় মনীশ না থাকে সেই সময়ে।

সে দিন সন্ধ্যাবেলা চায়ের টেবলে মৃন্ময় তাহার মুখের পানে লক্ষ্য করিয়া বলিল "তোর চেহারাটা হঠাৎ এমন খারাপ হয়ে গেল যে সতী?"

পিতা প্রসন্ননাথ রায় চায়ের কাপে আস্তে আস্তে চুকুম দিতে দিতে বলিলেন "সামনে একজামিন কিনা—"

মৃন্ময় হাসিয়া বলিল "আমার ব্যারামটা সতীরও আছে। সারা বছর হেসেখেলে বেড়িয়ে একজামিনের সময় পড়া—চেহারা অস্থিচর্ম্ম-সার হয়, আর কপালের' পরে একটা ভারী পাথর ঝুলানো থাকে, কি হয়, কি হয়? যদি ফেলের কথা মনে হয়—তখন—"

বলিয়া সে মুখভঙ্গি করিয়া হাসিল।

সতী উঠিয়া বলিল "আমি যাই।"

পিতা বলিলেন "যাও মা, যাতে পাস হতে পার, ভাল হয়ে, তার চেষ্টা কর। আমার মুখটা তা হলে থাকে, লোকের কাছে গর্ব্ব করতে পারি।"

সতী চলিয়া গেল।

আজ চার পাঁচ দিন হইতে মনীশ তাহাদের বাড়ী আসে নাই, সতী ইহাতে একটা জ্বালামিশ্রিত শান্তি অনুভব করিতেছে। মনীশ আসিলেই তাহার মনটা ছুটিয়া যাইত সেখানে—যেখানে মনীশ থাকিত; কান দুইটা মনীশের কথা শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া বাহিরে যাইত কিছুতেই অবাধ্য মনকে সে পাঠে সন্নিবিষ্ট করিতে পারে না; যখন বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া

আসিত, সে নিজেকে তিরস্কার করিয়া জোর করিয়া মনকে ফিরাইত, কিন্তু অবাধ্য মন আবার ছুটিত।

এ রকম তো ভাল নয়। মনীশ তাহার কে, কেন সে মনীশের কথা শুনিতে, মনীশকে দেখিতে এত ব্যগ্র ?

শুধু, আজ বলিয়া নয়, ছোটবেলা হইতে মনীশকে সে দেখিয়া আসিতেছে। মনীশের কাছ হইতে কতদিন সে পড়া জানিয়া লইয়াছে। যেদিন তাহার গৃহ-শিক্ষক উপস্থিত না হইত, সেদিন মনীশ তাহাকে পড়াইয়াছে। তখন সে ছিল ছোট একটী বালিকা, আর সেই ছোট বালিকাটীর মনের অতি নিভৃত কোণে প্রণয়রাশি জমিয়া স্তূপীকৃত হইতেছিল।

এতদিন সে মনীশের সঙ্গ এড়াইয়া চলিতে চায় নাই, কিন্তু এখন সে বুঝিয়াছে তাহার এ প্রেম নিস্ফল, মনীশ তাহাকে বোনের চোখে দেখে, প্রণয়পাত্রীরূপে তাহাকে কখনও দেখিতে পারিবে না।

হৃদয়ের ভাব পরিবর্ত্তন করিবার জন্য সে দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছে, প্রাণপণে মনীশের কাছ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিতেছে।

একজামিন আসিল—এবং তাহা শেষও হইয়া গেল সতী একটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া মায়ের কাছে গেল "এখন বাইরের সব কাজ তো শেষ হয়ে গেল মা, ভেতরের কাজগুলো শেখাও, নইলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।"

মৃন্ময় বলিল "ভেতরের কাজ আবার তুই কি শিখবি রে? তুই বুঝি বি-এ পাস করে ঢুকবি গিয়ে রান্নাঘরে?"

সতী বলিল "বি এ পাস করলেই আমাদের সব শিক্ষা শেষ হল নাকি দাদা? পড়াটা হচ্ছে বাইরের জিনিস, ভেতরের সঙ্গে ওর সম্পর্ক কি ? আমরা লেখাপড়া শিখলে আমাদের অন্তঃপুরের ভার বইতে হবে না,

এমন কি কথা আছে? এটা যে আমাদেরই জিনিস, এটাকে দেখতে হবে আমাদেরই। আমাদের লেখাপড়া শেখার মানে জীবন-যাত্রাকে সরল সুগম করা। যদি রান্নাঘরে না গেলুম, তবে আধখানাই যে বাকি থেকে গেল দাদা? আর আজ কি সে কাল আছে, মেয়েরা একটু ইংরাজি শিখে রান্নাঘরের দিকে গেলে হিষ্টিরিয়া হয়ে পড়বে? ও সব ব্যারাম আমাদের এখন ডেকে আনলে চলবে না, অভাব আমাদের দুয়ারে, ব্যারাম নিয়ে থাকলে যুদ্ধ করব কি করে?"

কথাগুলো সম্পূর্ণ মনীশের, তাহাতে একটুও সন্দেহ ছিল না। মৃন্ময় চোখে চসমা দিতে দিতে বলিল "দেখছি প্রফেসরের সঙ্গে তোর মতের ঠিক মিল হয়। এক কাজ কর না সতী, প্রফেসরকে বিয়ে করে ফেল, নইলে তোর মতে চলবে এমন পাত্র আর কোথায় খুঁজতে যাব। প্রফেসর আর তুই, তোরা দুজনে বেশ একটা সুখের সংসার গড়িয়ে ফেলতে পারবি।"

সতীর মুখখানা সিঁদুরের মত লাল হইয়া উঠিল, সে মুখ ফিরাইয়া বলিল "যাঃও, দাদা কি যে বলে, তার ঠিক নেই।"

মৃন্ময় বলিল "মন্দটা কি বলেছি? প্রফেসর মেয়েদের লেখাপড়া শিখতে বলে, কিন্তু বেচাল দেখলেই তার সর্ব্বনাশ। সে বলে, মেয়েরা লিখুক, পড়ুক, কিন্তু যে জায়গাটা তাদের সেইখানেই তারা থাক। তারা রান্না শিখুক, সন্তান লালনপালন করা শিখুক, ঘরের অন্য কাজকর্ম্ম দেখুক।"

সতী বলিল "বাস্তবিকই তো, সে কথা ঠিক! মনীশ বাবু যা বলেন, তার কোন্‌টা সত্যি নয়? তিনি বলেন সেকালেও তো আমাদের দেশের মেয়েরা শিক্ষা পেত, অবশ্য ইংরাজী না হলেও সে শিক্ষা পুরুষদের মতই তাঁরা লাভ করতেন। আমিও পড়েছি, অনেক কাল আগে এই

দেশের মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে একত্র যজ্ঞ, হোম পর্য্যন্ত করেছেন। এই দেশের মেয়ে—খনা, লীলাবতী, গার্গী, তাঁদের নাম আজও পর্য্যন্ত ভারতের বুকে সোণার অক্ষরে আঁকা রয়েছে। তাঁরা অবধি বিদ্যাচর্চ্চা করেছেন। আবার তাঁরাই কি সংসারের কাজ করেন নি? দেশের মেয়েরা সব সময়েই পুরুষের সাহায্য করতেন, সব বিষয়ে তাঁরা দৃষ্টি রাখতেন। খাওয়া-পরার ভার তাঁদের হাতে, সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষার ভার তাঁদের হাতে। এতে তাঁদের সংসার সুখশান্তিময় ছিল, ছেলে-মেয়ের স্বাস্থ্য ভাল থাকত, উন্নত মন হত। কি মন্দটা ছিল তখন, আর কি হয়েছে এখন? তুমি দাদা—তুমি চাও, মেয়েরা সেজে পুতুলটীর মত সাজানো থাকবে, তাকে তুমি শুধু নিজের আনন্দদায়িকা বলেই মনে করবে। সে সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকবে, ছেলে মেয়ে কি করে মানুষ করে তুলতে হয় তা জানবে না—"

"ওঃ তাই সতী কাজ শিখতে আসছে। বিয়ে হবে, ছেলে মেয়ে হবে—বড্ড আশা যে—"

হাসিতে হাসিতে সতীর বেণীটা ধরিয়া টানিয়া একটা পাক দিয়া মৃন্ময় চলিয়া গেল।

মালতী দেবী ভাই বোনের কথা শুনিয়া নিঃশব্দে হাসিতেছিলেন; সতী রাগ করিয়া বেণীটা খুলিতে খুলিতে বলিল, উচিত কথা বলেছি কিনা, তাই দাদার বড্ড ঘা লেগেছে। মা, আমি এখনি স্নান করে আসছি, তুমি আজ আমায় সব দেখিয়ে দাও, আমি রাঁধব।"

"মা কেন দিদি, তুমি আর আমি, আমরা দুজনে করি, মার আজ ছুটি দেওয়া গেল।"

ঊষা এতক্ষণ বাহির হইতে পারে নাই, মৃন্ময় চলিয়া গেলে সে বাহির হইয়া কথা কহিয়া বাঁচিল।

সতী আনন্দিত হইয়া বলিল, "তবে আর কি, বউদি তো আছে, আমরা দুজনে বেশ কাজ ক'রবখন। তুমি যাও মা, শুয়ে থাক গিয়ে খানিকক্ষণ।"

মালতী দেবী বলিলেন "আমি এখানে বসে থাকি না কেন?"

ঊষা বলিল "না, তা হবে না। আমি সব রাঁধতে জানি, দিদি আমায় সব শিখিয়েছিল—"

দূর ছাই দিদির কথা বলিতে বলিতে চোখে জল আসিয়া পড়ে। ঊষা মুখ ফিরাইয়া গোপনে চোখ মুছিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "একদিন দেখুন না মা, আমি তো রাঁধব না, দেখিয়ে দেব, দিদি রাঁধবে। আপনি যান, দিদিও ততক্ষণ চান করে আসুন।"

তাহাদের উভয়ের নির্ব্বন্ধানুযায়ী মালতী দেবীকে উঠিতেই হইল। সতী তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া আসিয়া মায়ের রন্ধন চাপাইল। আজ তাহারা দুইজনেই মায়ের এখানে খাইবে—ভারি আনন্দ।

মৃন্ময় ও প্রসন্ন বাবু আহারে বসিলে মালতী দেবী সতীর রান্না তরকারী পরিবেশন করিয়া বলিলেন "বি-এ মেয়ের হাতের রান্না খেয়ে দেখ; অন্নপূর্ণা দেখিয়ে দেছে, লক্ষ্মী রেঁধেছে।"

প্রসন্ন বাবু হাসিলেন।

মৃন্ময় তরকারী চাকিয়া গম্ভীর মুখে বলিল "রাঁধুনীকে একখানা খুব ভাল রকম সার্টিফিকেট দিতে হবে বাবা!"

মালতী দেবী হাসিমুখে বলিলেন "আর যে দেখিয়েছে?"

মৃন্ময় মাথা নত করিয়া খাইতে লাগিল। পুত্রের পানে একবার তাকাইয়া পিতা বলিলেন "সে সার্টিফিকেটটা আমার মাকে আমিই দেব না হয়।"

রেখা আসিয়া বলিল "ব্যাপারখানা কি ?"

সতী তখন একখানা সংবাদ-পত্র পাঠ করিতেছিল, চোখ তুলিয়া বলিল "কিসের ব্যাপার ?"

রেখা বলিল "আর যে তোমার দেখাই পাওয়া যায় না। একজামিন দিয়ে সত্যিই একেবারে কুনো ভূত হয়ে পড়লে যে দেখছি। বাইরের জগতের সঙ্গে একেবারেই সব সম্পর্ক উঠিয়ে ফেললে ? চেহারাও তো খুব ভাল হয়েছে দেখছি, সব রকমেই চরম উন্নতি !"

সতী একটু হাসিয়া হাতের কাগজখানা টেবিলের উপর রাখিল, বলিল, "বস, দাঁড়িয়ে থেকেই চলে যাবে না কি ?"

রেখা পাশের চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া বসিল, বলিল, "ব্যাপারখানা প্রায় তেমনিই বটে। ভদ্রলোককে যে অভ্যর্থনা করতে জানে না, তার ঘরে মোটে আসতেই নেই। আমি এসেছি প্রায় আধঘণ্টা, নীচে যে এতক্ষণ ধরে চেঁচাচ্ছিলুম, অবশ্য সেটাও কানে গ্যাছে ; কিন্তু তুমি না কি আমায় ভাগিয়ে দেবার চেষ্টাতেই ছিলে, তাই জেনেও কান দাও নি। ভেবেছিলে নীচে হতেই আমি চলে যাব, আর এখানে আসব না ; কিন্তু বড় দুঃখের কথা, তোমার আশাটা পূর্ণ হল না।"

সতী তাহার হাতখানা নিজের কোলে টানিয়া লইয়া একটা টিপ দিয়া বলিল, "ঠিক, মনের কথাই টেনে বের করেছ বটে।"

রেখা হাতখানা টানিয়া লইল, "থাক ভাই, অতটা টিপুনির আদর আমার সয় না। মুখে যা বলবে বল, ওরকম সাংঘাতিক টিপুনি দিও না, ওতে ব্যথাই লেগে থাকে।"

সতী বলিল, "সত্যি বলছি, কাগজটা পড়তে পড়তে ভারি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম, কোনও কথা কাজেই শুন্‌তে পাই নি।"

"কেন, এতে কোনও 'লাভ-সিকনেসের' কথা আছে না কি, কোথাও কোনও অভাগিনী জো, তার লাভারের ভাবনায় আত্মহারা—"

বলিতে বলিতে সে কাগজখানা তুলিয়া লইল।

সতী হাসিয়া বলিল, "তুমি দিন-রাত কেবল লাভের স্বপ্নই দেখছ! কোথায় কোন অভাগিনী জো, কোথায় কোন হতভাগা লাভার,—তোমার জাগন্তে ঘুমে কেবল লাভ। আমাদের তো অত লাভ দেখবার সময় নেই ভাই। যদি কোনও নভেল পড়তুম, তাও না হয় বলতে পারতে। এটা যে টাইমস পত্র, এর মধ্যে খবর ছাড়া আর কিছু নেই।"

রেখা চট্ করিয়া কাগজখানার হেডিং দেখিয়া লইয়া রাখিয়া দিল, বলিল "এ সব পত্রেও অনেক খবর পাওয়া যায়; দুঃখের বিষয় সবই ট্র্যাজেডিতেই দাঁড়ায়। আর নভেল তুমি পড়বে কি, তোমার বুকের মধ্যেই একটা জীবন্ত নভেল রয়েছে। নভেল পড়তে পড়তে যখন কোন বিরহিণীর পানে চোখ পড়ে—তখন—চোখ দিয়ে দর দর ধারে—"

সতী তাহার মুখে হাত দিয়া বলিল "দূর—তা না কি হয়?"

রেখা মুখ সরাইয়া বলিল "দেখ, যার বুকে কেবল লাভ থাকে, সে জগতে আর কিছুই দেখতে পায় না। দেখে যায় কেবল লাভ, লাভ ছাড়া এ জগতের অস্তিত্ব যে আছে, তা সে স্বীকার করতেই চায় না। তুমি কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের সায়মন লী'র পদ্যটা পড়েছ, যেখানে কবি বলছেন—হে পাঠক, তুমি যদি গল্প ভালবাস, অর্থাৎ তোমার হৃদয় যদি কল্পনা-প্রবল হয়, তবে জগতে প্রত্যেক জিনিসের মধ্যেই গল্প দেখতে পাবে; মনে হবে, গল্প ছাড়া এ জগতে কিছুই নেই। আমিও তাই বলি, যে লাভার সে জগতে লাভ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না।"

সতী বলিল "আমার মধ্যে তুমি কি দেখতে পেলে ?"

রেখা বলিল "দেখছি কেবল লাভ। এত দিন পড়ার চাপে সেটা লুকিয়ে পড়েছিল, ভারটা সরে যেতেই সে উছলে উঠেছে। তোমার চোখে মুখে ফুটে বেরুচ্ছে।"

সতী পরাভব মানিয়া বলিল, "তোমার কাছে কারও তো পারবার যো নেই। তুমি নিজেই কবি, চট্ করে একখানা কাব্য লিখে ফেল, খুব নাম হবে, লোকে একখানা কেন, পাঁচখানা করে কিনবে।"

রেখা বলিল "বাকি আছে কেবল সেইটা। দেখা যাক, লিখব ঠিকই, তা জেনো। তোমার নাম দিয়ে করব। নায়িকা হবে তুমি, আর নায়ক—"

সপরিহাসে সতী বলিল "সেটি কে হবে ?"

রেখা গম্ভীর মুখে বলিল "কেন, তা বুঝি ঠিক করি নি ভাবছ ? পথে থেকে যে সে একটা লোককে কুড়িয়ে আনা চলবে না, তুমি তাতে বেজায় চটে উঠবে। ঠিক তোমার লাভারটীকেই দাঁড় করাব, সে জন্যে ভাবনার কোন কারণ নেই।"

সতী বলিল "বুঝতে পেরেছ, সে কে ?"

রেখা বলিল "বুঝতে আবার পারা কি ? চোখের সামনে দেখেও কাণা হয়ে থাকব ? তোমার বাপ, মা, ভাই না বুঝতে পারেন, কিন্তু আমায় তা বলে অবুঝ ভেব না। তোমার মুখ, তোমার চোখ, এরাই তোমায় আমার কাছে ধরিয়ে দিয়েছে! তবু যদি জানতে চাও—"

রেখা উঠিয়া, ঠিক টেবিলের ধারেই দেয়ালে মনীশের যে ফটোখানা ছিল, সেইটা পাড়িয়া সতীর সামনে টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল—"তবে এই দেখিয়ে দিলুম। আশা করছি, আমার এই স্বলব্ধ ভাবটা সার্থক হয়েছে, নেহাৎ মাঠে পড়ে মারা যায় নি।"

সতীর মুখখানা নিমেষে বিবর্ণ হইয়া উঠিল। জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া সে বলিল, "মাঠে পড়ে মারা-ই গ্যাছে সত্যি! কোনও সার্থকতা লাভ করতে পারলে না এটা আবিষ্কার করে।"

রেখা দৃঢ়কণ্ঠে বলিল "এখনও বলছো মারা গ্যাছে? চোখ মুখের ভাব তুমি লুকাবে কি করে সতী, তোমার মুখ চোখই যে বলে দিচ্ছে, আমার আবিষ্কার যথার্থ হয়েছে। আর এতে লজ্জা করবার কি আছে, কি ভেবে তুমি লুকাতে চাচ্ছ এ কথা? আমি এর মধ্যে এত লুকালুকি করবার কারণ কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে। তুমি আমাকে বন্ধু বল, তবে বন্ধুত্ব হবে কি করে? আমার কোন কথাটা তোমার কাছে গোপন আছে তা বল?"

আজ ছয় সাত মাস হইল রেখার বিবাহ হইয়াছে, স্বামীর কথা, পত্রাদি সবই সে এই বাল্য সখীটির কাছে বলিয়া ও দেখাইয়া বড় তৃপ্তি লাভ করিত। সতী সে কথা স্মরণ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "না, তুমি সবই বল। আমারও যদি বলবার মত কথা হত রেখা, আমি সব কথা তোমায় জানাতুম। আমার কথা বলবার মত নয় বলেই আমি তোমার কাছে পর্য্যন্ত গোপন করে গেছি।"

রেখা চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া একটা হাই তুলিয়া বলিল, "এটাতে তোমায় দোষী করা যায় না; কারণ, মানুষের মনের যা স্বাভাবিক কাজ, তোমার মনেও তাই হয়েছে। আজন্মকাল মনীশবাবুকে দেখে আসছ, তাঁর প্রকৃতি কেমন তাও জানো, তবে জেনে শুনে কি করে তাঁকে ভালবাসলে আমি তাই জিজ্ঞাসা করি? আমি লোকটাকে একবার দেখেই বুঝেছি বড় সাংঘাতিক। এত তফাতে সরে গেছি—যেন তাঁর নাগাল আর না পেতে হয়। তুমি জেনে শুনে—"

বাধা দিয়া সতী বলিল "মনের ওপরে হাত নেই ভাই।"

উত্তেজিত হইয়া রেখা বলিল, "হাত নেই এমন কথা বল না। মন যা চাইবে, তাকে তাই যে দিতে হবে, এমন কোনও কথা থাকতে পারে না। মন যদি একটা অসৎ কাজ করতে যায়, তাকে ফিরাবার চেষ্টা না করে তাকে সেইটেই করতে দেবে? মনীশবাবুকে ভালবাসা—এর মত অপরাধজনক কাজ আমার বোধ হয় আর নেই। যে শিক্ষিতা মেয়েদের আদবে দেখতে পারে না—সে তার আদরও বুঝবে না। মনকে ফিরিয়ে নিয়ে এস সতী, আমি তোমার এ গর্হিত কাজে কখনই মত দেব না।"

সতী মলিন হাসিল।

রেখা রাগ করিয়া বলিল, "আরও একটা কথা—মনীশবাবু ভালবাসা কাকে বলে তা জানেন না। অস্বাভাবিক এমন এক একটা কথা বলে বসেন, যা শুনলে রাগে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে যায়। সেবার তোমাদের বাড়ীতেই আমার সঙ্গে তাঁর বেজায় রকম তর্ক বেধে গেছল ; তাতে কিছুতেই তিনি মানতে চান না, ভালবাসা একটা জিনিস। মায়ের ভালবাসা সে আলাদা কথা ; কিন্তু আর কোনটাই তাঁর কাছে দাঁড়াতে পারে না। বিশেষ শিক্ষিতা মেয়েদের ভালবাসা—এ তিনি অগ্রাহ্য করে একেবারেই উড়িয়ে দেন। তিনি প্রমাণ করতে চান, এরা কিছুতেই প্রকৃত ভালবাসতে জানে না, ভালবাসার অভিনয় করে যায় মাত্র।"

সতী বলিল, "তাঁকে সে বিষয় নিয়ে কথা বলতেই বা যাবে কে? তাঁর মনের ভাব তাঁতেই থাক।"

রেখা বলিল "তবু তুমি তাঁকে ভালবাসবে?"

সতী হাসিল, বলিল, "তুমি তোমার স্বামীকে ভালবাস রেখা!"

রেখা সলজ্জ হাসিল।

সতী বলিল, "আমিও তেমনি ভালবাসি। তোমার ভয় নেই, নিজের মর্য্যাদা হারিয়ে ফেলব না। বরং আমার মনে হয়, এতে আমার মর্য্যাদা

বাড়বে। নিজেকে নিঃস্ব করে বিলিয়ে দেব না, আমি যা—তাই-ই থাকব। কোনও দিন আপনার বলে কাছে যাব না, পর বলে এমনি দূরেই থাকব।"

রেখা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "একেবারেই অনর্থক। জীবনের সার্থকতা দেখছি কিছুই লাভ হল না তোমার।"

সতী বলিল, "অনর্থক নয় ভাই, এরই মধ্যে পাওয়ার সুর বেজে উঠছে। ত্যাগেই ভোগ, পাওয়াকে ভোগ বলে না। যদি যথার্থ সার্থকতা লাভ বল, তবেই এরই মধ্যে থেকে তা আমি পাব। তোমরা বলবে—ভালবাসার জিনিসকে কাছে পাওয়াই সুখের, কিন্তু আমার তা মনে হয় না। চাঁদ দূরে থাকে বলেই সুন্দর, বাতাস দূর থেকে এসে স্পর্শ করে যায় বলেই মনোরম। যদি এদের কাছে পেতুম, ভোগ করতুম, তবে এরা এমন সুন্দর হতে পারত না। গাছে যে গোলাপ ফুলটী ফুটে থাকে, দূর হতে দেখতেই তা ভাল, তাকে তুলে নাও, সে শুকিয়ে ঝরে যাবে। যা ভাল,যা ভালবাসার জিনিস,আমি বলি সে দূরে থাক্, দূর হতে দেখতেই সে ভাল। আমি তাকে বড় ভালবাসি—আমার নিজের চেয়েও ভালবাসি, কিন্তু তাকে কাছে পেতে চাই নে। আমি ত্যাগের মধ্যে ভোগের যে স্বাদ পেয়েছি, তা তোমরা বুঝতে পারবে না। আমি কিছু চাই নে—এমন কি—তাঁকে দেখতেও চাই নে। তাঁর কাছ হতে বহু দূরে সরে গিয়ে আমি থাকব, তাঁর স্মৃতিটা শুধু মনের মধ্যে জাগিয়ে নিয়ে। আমার এ ভালবাসাকে ব্যর্থ বল না রেখা, এর সার্থকতা তুমি বুঝতে পারবে না।"

সতী মুখ ফিরাইল, তাহার কণ্ঠস্বরটা অত্যন্ত ভারি হইয়া উঠিয়াছিল, এবং কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

রেখা স্তব্ধ ভাবে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর আবেগভরে তাহার একখানা হাত টানিয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, "যথার্থ ভালবাসতে

শিখেছ সতী। জানো সে নারীদ্রোহী, সে জগতের সব নারীকেই সন্দেহের চোখে দেখে,—কাউকে ভালবাসতে পারবে না, কাউকে বিশ্বাস করতে পারবে না। তবু তার ওপরে তোমার এই ভালবাসা, এ যথার্থ-ই অপার্থিব রত্ন। জগতে আদান প্রদান চলছেই, কেউ শুধু নিয়েই হাসতে হাসতে চলে যেতে পারে না; তাকেও দিয়ে যেতে হয়। মনীশবাবু যে শুধু নিয়ে যাবেন, জেতার অহঙ্কারে যে তাঁর বুকটা পূর্ণ হয়ে থাকবে, এ কখনই হবে না। তাঁকেও পরাভব স্বীকার করতে হবে, দিতে হবে।"

সতী হৃদয়াবেগ রুদ্ধ করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিল, বলিল, "কিন্তু সে সম্পূর্ণ মিথ্যেই হবে। আমি তাঁর কাছ হতে এক বিন্দু কিছু নেব না। যা দিয়েছি, তা আর ফিরাবার যো নেই, নইলে ফিরাবার চেষ্টাই করতুম। অনেক চেষ্টা করে দেখেছি, আমার জীবনে তাঁর স্মৃতি আমায় ছাড়বে না।"

রেখা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল, "তবু যদি বল সতী—"

বাধা দিয়া সতী বলিল "কি, চেষ্টা করবে?"

একটু কষ্টের হাসি তাহার মুখের উপর তরঙ্গ তুলিয়া গেল।

রেখা বলিল "তোমার নাম করে নয়, অন্যের নাম করে—"

সতী তাহার বড় বড় দুটি চোখ রেখার মুখের উপর রাখিয়া বলিল, "না, এ জন্মে নয় রেখা, এ জীবনে আমি তাঁর স্ত্রী হ'তে পারব না। আমার সব কথাই বলেছি, তাঁর সম্বন্ধে একটা কথা আমি জেনেছি—কিন্তু তা বলতেও—"

সে থামিয়া গেল, রেখা সাগ্রহে বলিল, "বলতে পারবে বই কি। না বললে আমার চেষ্টা আমি ছাড়ব না।"

সতী বলিল, "আমি জেনেছি, তিনি একটি মেয়েকে ভালবাসেন, কিন্তু—"

রেখা অধৈর্য্য হইয়া বলিল, "আবার কিন্তু কি ?"

সঙ্কোচ দূর করিয়া ধীর স্বরে সতী বলিল "একজনের চিন্তা তাঁর বুকে আছে,—তিনি বউদিদির বোনকে ভালবাসেন।"

রেখা চোখ দুইটী কপালে তুলিয়া বলিল, "সে তো বিধবা।"

সতী বলিল "হাঁ, সে বিধবা। আমি তোমায় এটা অনুমান করে বলেছি মাত্র। অবশ্য এটা তোমরা কেউই ধরতে পারনি। কিন্তু একটা কথা আছে—যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত পড়ে। তাই আমি এ কথাটা জানতে পেরেছি। উমার নাম করতে তাঁর আনন্দোৎফুল্ল মুখ, আমার সন্দেহের সত্যতা প্রতিপন্ন করছে। অবশ্য আমি এ বলতে পারব না, তাঁর এই গোপন ভালবাসা—ভালবাসার পাত্রীর সামনে কখনও ব্যক্ত হয়েছে। বউদির মুখে যেমন শুনি, তাতে জানতে পারি, তার দিদির মত যথার্থ শিক্ষিতা মেয়ে খুব কম। আর এটাও জেনো—লোকে চায় তার ভালবাসার পাত্র বা পাত্রী যেন উন্নতই হয়, সে যেন অবনত না হতে পারে। যথার্থ ভালবাসা দেখবে সেখানে যেখানে কেউ কাউকে অক্ষত, উন্নত রাখতে নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায়। মনীশ বাবু নিজের বুকেই নিজের কথা লুকিয়ে রেখেছেন, সে কথা আর কেউ জানে না। তাঁর ভাবে বোধ হয়—তিনি উমা ছাড়া আর কোনও নারীর অস্তিত্ব মানতে চান না। আমার দাদা, বাবা, মা আমার এ কথা কোনও ক্রমে জানতে পারলে নিশ্চয়ই মনীশ বাবুকে বলবেন আমায় বিয়ে করতে। খাতিরে পড়ে তিনি রাজি হলেও হতে পারেন। কিন্তু সে বিয়ে করে আমার লাভ কি ? আমার অভীপ্সিতকে হয় ত আমি পাব। কিন্তু যেমন ভাবে পাবার কথা, তেমন ভাবে তো পেলুম না। এ পাওয়ায়, আমার সার্থকতা কি রেখা, আমি এমন পাওয়া পেতে চাই নে।"

রেখা চুপ করিয়া রহিল। এই গভীর, মর্ম্মস্পর্শী কথাগুলার যে কি উত্তর দিবে, সে তাহা ভাবিয়াই পাইতেছিল না।

উষা বারাণ্ডা হইতে ডাকিতেছিল "দিদি—ও দিদি,"

তাহার কণ্ঠ আনন্দ-পূর্ণ।

সতী বলিল, "এই ঘরে আছি বউদি।"

শিশুর মত খিল্-খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে উষা গৃহে প্রবেশ করিয়াই রেখাকে দেখিয়া হাসি বন্ধ করিয়া ফেলিল। হাতে দুখানা পত্র ছিল—তাড়াতাড়ি কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া সে রেখার পানে চাহিয়া রহিল। বাস্তবিক রেখাকে সে মোটেই শ্রদ্ধা ভক্তি করিত না। বিবাহের পরেই এই বাড়ীতে পদার্পণ করিতে করিতে রেখা তাহার সম্বন্ধে যে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা বেশ তাহার মনে আছে।

রেখা হাসিয়া বলিল, "গলাটা কি বন্ধ করে দিলুম ভাই বউদি। আমি বাঘ কি সাপ নই যে, সামনে দেখে ভয়ে একেবারে কথা বন্ধ হয়ে যাবে?"

সতী বলিল "এস বউদি, পত্র দু'খানা এসেছে বুঝি, দেখি কার পত্র? রেখার কাছে লজ্জা কি, আমিও যা রেখাও তাই।"

রেখা মুখখানা কপট গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ করিয়া বলিল, "ইস্ তা আর হতে হয় না। তুমি হচ্ছো স্বামীর বোন, যাকে বলে ননদিনী, তাই। আর আমি তোমার একটী বন্ধু মাত্র। তাতে—আমার একটু না কি স্পষ্টবাদিতা রোগটা আছে,—যার যা দোষ গুণ সামনেই বলে দেই। এতে অনেকেই যে আমায় দেখতে পারে না, এই বউদিটী তাদের মধ্যে একজন। বউদি, রাগ করো না ভাই,—সত্যি কথা বল তো, কোনও দিন সকালে আমার মরণ প্রার্থনা না করে জল খাও কি না? আর তোমাদের ওই পাড়াগাঁ-গুলোতে মেয়েরা আঙ্গুলগুলো যেমন মাটীতে রেখে মটকিয়ে বলে, হে যম, তুমি অমুককে নাও, তেমনি বল কি না?"

উষা ভারি ব্যস্ত হইয়া উঠিল ; আরক্ত মুখে বলিল, "হ্যাঁ, তাই বলি বই কি, তোমার কথা আমার মোটে মনেই থাকে না।"

রেখা বলিল "মনে পড়লে নিশ্চয়ই বলতে ?"

সতী হাসিয়া বলিল, "কি কর ভাই, ছেলেমানুষটাকে কেন জ্বালাতন করে মারছ ? বেচারা, নেহাৎ ভালমানুষ, কিছু বোঝে না। এস বউদি, চেয়ারটাতে বস।"

উষার চোখ দুইটী অভিমানে জলে ভরিয়া উঠিতেছিল ; সতী তাহার কটি বেষ্টন করিয়া আনিয়া একটা চেয়ারে বসাইয়া দিল, বলিল, "কার পত্র এল দেখাও তো বউদি, সত্যি বলছি, আমি রেখাকে দেখাব না।"

আড়ে আড়ে রেখার দিকে তাকাইয়া উষা পত্র দু'খানা সতীর হাতে দিল। হাসিয়া উঠিয়া রেখা বলিল, "বউদি, চোখে একজোড়া চশমা দিয়ো, তোমার চাউনিটা ভাই বড্ড খারাপ। আমি না কি মেয়েমানুষ তাই ঘুরে পড়িনি,—পুরুষ কেউ হ'লে এতক্ষণ চেয়ার শুদ্ধই তিন হাত ঠিকরে গিয়ে পড়ত।"

উষা গর্জিয়া উঠিয়া যাইতেছিল,—সতী তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "পাগলামি কর বলেই তো লোকে তোমায় আরও ক্ষেপায়। চুপ করে বস দেখি, রেখা আর কথা খুঁজেই পাবে না। এখানা তোমার দিদির দেখছি, এখান হইতেই আসছে।"

উষা বলিল "দিদি এখানে এসেছে। লিখেছে দানীশ দা' কাল আমায় নিতে আসবে, মাকে পাঠাবার জন্যে আলাদা পত্রও দিয়েছে। দিদি, তুমি যাবে ?"

রেখা ধমকের সুরে বলিয়া উঠিল "ও কেন যাবে ? তোমার দিদি, সতীর কে ?"

সতী তখন আর একখানা পত্র খুলিতেছিল। উষা রাগ করিয়া উঠিয়া গেল, সে দিকে তাহার দৃষ্টিই রহিল না।

এ পত্রখানা মনীশ লিখিয়াছে তাহাকে,—পত্র আসিতেছে রংপুর হইতে। রংপুরে তাহার মামাতো ভাই কলেজের প্রফেসর, মনীশ সেখানে বেড়াইতে গিয়াছে। সে সতীকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছে, উমা কলিকাতায় যাইতেছে, সতী যেন উষাকে লইয়া অন্ততঃ একবেলা গিয়াও উমার সহিত দেখা করিয়া আসে।

সতী পত্রখানা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রেখার দিকে ফিরিল।

রেখা বলিল, "কার পত্র?"

সতী পত্রখানা তার হাতে দিয়া শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "পড়ে দেখ।"

রেখা পত্র পড়িয়া বলিল, "সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—তা হলে অবশ্য যাওয়া উচিত?"

সতী বলিল, "দেখা যাক।"

রেখা উঠিল। বিদায় লইবার সময়ে বলিল, "আমারও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ তুমি ওই লোকটার সঙ্গ এড়িয়ে চলো। ওকে জানতে দিয়ো না, তুমি-ওর কাছে পরাজিত হয়েছ, নিজের নারী-শক্তিকে এমন করে মাটীতে লুঠতে দিয়ো না। বিজেতার আসন পাওয়া মানুষের সাধনার ফল, তাকে তা তুমি স্বেচ্ছায় দিতে পারবে না।"

উমা পূর্ব্বেই মনীশদাকে একখানা পত্র দিয়াছিল আসিবার জন্য ; কিন্তু মনীশদা আসিল না, আসিল দানীশ।

উমা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল "মনীশ দা' এলেন না দানীশ ?"

দানীশ মাথা চুলকাইয়া উত্তর দিল, "তিনি তো কলকাতায় নেই, রংপুর চলে গেছেন।"

উমা সবিস্ময়ে বলিল "রংপুর, সেখানে কেন ?"

দানীশ বলিল "কি জানি ? স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে বলে বেরিয়ে পড়লেন। সেখানে আমার এক দাদা থাকেন সেই জন্যে গেছেন।"

কলিকাতা গমনের উৎসাহ উমার যেন চলিয়া গেল। সে বড় আশা করিতেছিল, কলিকাতায় গিয়া মনীশদার ভুল ধারণার জন্য তাঁহাকে খুব কথা শুনাইয়া দিবে, তাঁহাকে বিশেষরূপ জব্দ করিয়া ছাড়িবে। সে যে আবার বিবাহ করিবে, এই কথাটা মনীশদা কেমন করিয়া অসংশয়িত চিত্তে বিশ্বাস করিয়া লইয়াছেন, তাহা উমা কিছুতেই ঠিক করিতে পারিতেছিল না।

আর সেই প্রভাস লোকটা ? তাহার কথা ভাবিতে উমার হৃদয় ঘৃণায়, লজ্জায়, রাগে ভরিয়া উঠিতেছিল। সে চট করিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল ? সে যদি তাহার সামনে এখন একবার আসে, তাহা হইলে উমা তাহাকে বেশ গোটাকত কথা শুনাইয়া দিবে, তাহাও সে ঠিক করিয়া রাখিল।

অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিতই সে দানীশকে জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা দানীশ, মনীশদা গিয়ে কোনও কথা বলেছে না কি ?"

দানীশ বিস্ময়ে বলিল "কি কথা ?"

উমা বলিল "এই—কোন বিয়ে-টিয়ের সম্বন্ধে—"

দানীশ একটু ভাবিয়া শেষে মাথা নাড়িয়া বলিল, "কই, আমি কিছু শুনিনি তো। নাঃ, দাদা কিচ্ছু বলেনি, বললে শোনা যেত।"

খুব নিশ্চিন্ত হইয়া উমা যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল। বগলা-দেবীর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুর-মা, তুমি যাবে না ?"

বগলাদেবী প্রথমটায় সবেগে মাথা নাড়িলেন—"না !"

তাহার পর কি ভাবিয়া বলিলেন, "আচ্ছা চল, একবার উষাকে দেখে আসব'খন। এর পর কোন্ দিন মরে যাব—আর হয় তো দেখাই হবে না।" তাঁহার কাশী যাত্রার কথা ইদানীং বড় একটা আর শুনা যাইত না। যাত্রার সময় অমরনাথ বলিলেন, "সাত আট দিনের মধ্যেই ফিরে এস মা। খালি বাড়ীতে আমি থাক্‌তে পারব না। উষাকে যদি পাঠায়—তবে—" তিনি খানিক ভাবিলেন, তাহার পর বলিলেন, "তবে নিয়ে এস। আর যদি না পাঠায়—তবে কাজ নেই।"

উমা ও বগলাদেবী দানীশের সহিত কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিল। দানীশের মা বগলাদেবীকে বিশেষ করিয়া অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিলেন ; কারণ তিনি এই প্রথম তাঁহার বাড়ীতে পদার্পণ করিলেন। উমা কয়েকবার আসিয়াছিল, সে তাঁহাকে নিজের মায়ের মতই জানিত। তাহার সম্বর্দ্ধনা করার বিশেষ আবশ্যকতাও ছিল না।

শুচিপরায়ণা বগলাদেবী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া চারিদিক পানে চাহিতেছিলেন, "কি নোংরা বাড়ী, নীচেটা যেন সেঁতসেঁত করছে। কেমনতর বিশ্রী গন্ধ ! এখানে নাকি মানুষ থাক্‌তে পারে।"

উমা একটু হাসিয়া বলিল "কলকাতার বাড়ী সামনে দেখতেই ভাল ঠাকুর-মা, ভেতরে দেখ্‌তে গেলেই এমনি।"

তেমনি মুখখানা করিয়াই বগলাদেবী বলিলেন, "এর চেয়ে আমার সে পাড়াগাঁ অনেক ভাল। এখানে না আছে রোদ, না আছে বাতাস। কলকাতায় লোকে থাকে কি করে? গলিগুলোতে তেমনি গন্ধ ছুটছে। না, উমা, তুই শিগগির আমায় টেনে বের করে দেশে নিয়ে চল বাবু, আমি একটা দিনও এখানে থাকতে পারব না।"

উমা বলিল, "বাঃ, আজই তো সবে এলে ঠাকুরমা, এখনই যেতে চাচ্ছ? তবেই হয়েছে তোমার গঙ্গাস্নান আর কালীঘাট দেখা। উষাকে আনতে হবে, তবে তো। তার সঙ্গে দেখা শুনা না করে তুমি যাবে কি ক'রে?"

বগলাদেবীকে দ্বিতলে বসাইয়া রাখিয়া উমা মনীশের মায়ের সাহায্যার্থ চলিয়া গেল।

বগলাদেবী সন্ধ্যা লাগিতেই সেখানেই শুইয়া পড়িলেন। এখানে তিনি কোন মতেই শয়নার্থ গৃহের মধ্যে যাইবেন না। উমা বলিল, "তোমার সন্ধ্যাবেলা শোওয়া অভ্যাস ঠাকুরমা, শোও গিয়ে। রাত পর্য্যন্ত জেগে থাকলে এর পরে যদি কিছু হয়, তখন দোষ দেবে আমাদেরই।"

বগলাদেবী রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "তুই আমায় মেরে ফেলে দিতে চাস উমা? ওই ঘরের মধ্যে—একলা আমি কক্ষনো শুতে পারব না। তুই এখানে বসে থাকবি, আর আমি—"

তিনি প্রায় কাঁদিয়াই ফেলিলেন। এই পল্লীগ্রামের সেকেলে বৃদ্ধাটীর কথাগুলা মনীশের মায়ের হাসি আনিয়া ফেলিতেছিল। কষ্টে তিনি হাসি সামলাইয়া বলিলেন, "আপনি তবে ততক্ষণ এখানেই শুয়ে পড়ুন মা, উমা যাবার সময় আপনাকে ডেকে নিয়ে যাবে'খন।"

নিশ্চিন্ত হইয়া বগলাদেবী উমার পাশে শুইয়া পড়িলেন এবং মুহূর্ত্তেই ঘুমাইয়া পড়িলেন।

উমা একটু হাসিয়া মনীশের মায়ের পানে চাহিয়া বলিল, "বড় ভীতু লোক খুড়িমা, চিরটাকাল পল্লীগ্রামেই আছেন কি না। এবার কি মন হয়েছে তাই এসেছেন, নইলে এতবার আনবার চেষ্টা করেছি, কিছুতেই আসেন নি। উষা উষা করে বুড়ি পাগল হয়ে গ্যাছে—দেখতে এসেছেন। উষাকে তো তারা আর পাঠাবে না সেখানে—যে উষাকে দেখবেন।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উমা পথের দিকে চাহিল।

খুড়িমা বলিলেন, "মেয়েটার ভাঁরী কষ্ট হয়েছে উমা, আজকাল তবু কতকটা সামলে গেছে। আমার মতে—যাকে যেমন শিক্ষা দিয়ে মানুষ করা হয়, তাকে তেমনি ঘরেই দিতে হয়। তোমাদের খাঁটি হিন্দু ঘরের মেয়ে, দিয়েছ সাহেব-ঘেঁসা লোকের বাড়ী—যেখানকার আহারাদি আলাদা, আচার বিচার কিছু নেই। এরা মনে ভাবে—এই শ্রেষ্ঠ জীবন নির্ব্বাহ করা। নিজেদের যা—তা ভাসিয়ে দিয়ে একেবারে পরের মত চলা। মনীশ বলে, আমরা খপ করে ইংরেজের ভাবটা নিই, ইংরেজী আচার, আহার সবই নিই, কিন্তু ইংরেজ তো আমাদের কিছু নেয় নি। দেড়শ বছর হয়ে গ্যাছে ইংরেজ আমাদের প্রতিবেশী,—কেউ বলতে পারবে না তারা আমাদের একটা কিছু নিয়েছে। কিন্তু আমরা তাদের সবটাই নিই। এতে যে তারা আমাদের যথার্থ প্রশংসা করে তা নয়। মুখে সম্প্রীতি দেখালেও অন্তরে তারা ঘৃণার ভাবই পুষে রাখে মাত্র। কুকুরের চেয়েও অধম বলে তারা আমাদের ভাবে।"

মনীশদার উন্নত হৃদয়ের কথা মনে করিয়া উমা বলিল, "মনীশদা বুঝেছেন ঠিক। তাই যা বলেন সবই ঠিক হয়। মনীশদার সঙ্গে আমার সব মতেরই মিল হয় খুড়িমা, তাই মনীশদাকে আমার বড় ভাল লাগে।"

খুড়িমা বলিলেন, "কিন্তু একটা মতের সঙ্গে তো মিল হয় নি মা।"

কথাটা ধাঁ করিয়া উমার মনে পড়িয়া গেল, তথাপি সে জিজ্ঞাসা করিল "কি মত খুড়িমা ?"

কণ্ঠস্বর নীচু করিয়া খুড়িমা বলিলেন, "বিধবা বিয়ের।"

উমা বলিল "আগে বলুন, মনীশদা কি বলেন, তার পর আমি সব বলছি।"

খুড়িমা বলিলেন, "বিধবা বিয়ের পক্ষপাতী সে মোটেই নয়। সে বলে এতে আমাদের সমাজের অমঙ্গল সাধনই করা হবে, মঙ্গল কিছুতেই করা হবে না। যদি মঙ্গল হতো, তবে এ বিয়েটা অনায়াসেই সমাজে প্রচলিত থাকত। যখন নেই—তখন জানা যায়,—এটাতে মঙ্গল নেই বলেই নেই। সে বলছে বহু পুরাতন এক যুগে বিধবা বিয়ে আমাদের দেশেই প্রচলিত ছিল, সে তা অস্বীকার করছে না। কিন্তু সে বিয়েতে কোনও মঙ্গল উৎপন্ন করতে পারে নি বলেই সেটা সমাজে রহিত হয়ে গ্যাছে। সেই অমঙ্গলকর জিনিসটা সে আবার সমাজে ফিরিয়ে এনে একটা বিশৃঙ্খলা ঘটাতে অসম্মত। এই মতটার সঙ্গে তোমার মত তো মিলল না মা।"

উমা একটু হাসিয়া বলিল, "ঠিক মিলেছে খুড়িমা! আপনি যদি ভেবে থাকেন আমি বিধবা বিয়ের পক্ষপাতিনী, তা হলে ভুল করেছেন। মনীশদাও এই ভুল করে সেখান হতে চলে এসেছেন, আর পাছে আমার সঙ্গে আবার দেখা হয় এই ভয়েই পালিয়েছেন। আচ্ছা খুড়িমা, মনীশদা না হয় এ কথাটা সত্যি বলে ভাবতে পারলেন, আপনি ভাবলেন কি করে ?"

তাহার মুখের হাসিটা কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই মিলাইয়া গিয়াছিল, বেদনাটা কণ্ঠস্বরে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

খুড়িমা বলিলেন "তোমার সঙ্গে দেখা হবার ভয়েই যে সে পালিয়েছে তা নয় মা। সে গ্যাছে—তার স্বাস্থ্য ভারি খারাপ হয়ে গ্যাছে তাই।

বলতে গেলে আমিই তাকে জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার বিশ্বাসের কথা বলছ মা, সে যে-রকম ভাবে বললে—সত্যি, তাতে অবিশ্বাস করবার মত আমি কিছুই খুঁজে পাইনি। আর এ রকম আজকাল হচ্ছেও তো। তবে অবিশ্বাস করবার মত কি থাকতে পারে?"

উমা মুখ ফিরাইয়া বলিল "সে কথা ঠিক। একজন যদি খারাপ হয়, লোকে সকলকেই সেই রকম ভেবে থাকে। একটী বিধবার হয় তো বিয়ে হয়েছে, লোকে সহজেই ধরে নিয়েছে সকল বিধবাই আবার বিয়ে করবার গোপন বাসনা বুকের মধ্যে পূরে রাখে। আপনাকে কি মনীশদাকে আমি দোষ দিচ্ছি নে খুড়িমা, এটা মানুষের স্বাভাবিক ধারণা। বিধবা মানে কি খুড়িমা? বিধবার মানে যদি এতটুকু একটা কথাতেই ফুরিয়ে যায়, তা হলে তো কথাই নেই। বিধবা কি ছেলেখেলার জিনিস? বিধবাকে আবার সধবা করা যায় কখনও? তার কর্ম্মফল যা—তা তাকে ভোগ করতেই হবে, নইলে সে বিধবাই বা হবে কেন? বিশ্বের নিয়ম বিশ্বপিতা যা ঠিক করে রেখেছেন, সেই নিয়ম অনুসারে আমাদের চলতেই হবে। যদি তার বিরুদ্ধাচরণ করি, সেটা ভগবানেরই আদেশ লঙ্ঘন করা হয়। আমার যদি এতটুকু ক্ষমতা না থাকে, আমি যদি নিয়মানুসারে চলতেই না পারি, তবে মানুষ হয়ে জন্মেছিই বা কেন? আমাকে আমার প্রবল শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করতে হবে, আমার দেবতার জিনিস বলে ঠিক রাখতে হবে, তবে আমি মানুষ, তবে আমি যথার্থ শিক্ষালাভ করেছি। আমি লীন হয়ে যেতে তো আসি নি, পরাজয় লাভ করতে আসি নি। মানুষের কাছে ভগবান আমায় নত হতে দেন নি, আমি দাঁড়িয়ে থাকব। এরা তা কেউ বোঝে না, এরা আমায় চিনতে পারে নি—তাই আমার ওপরে জোর চালাতে চায়।"

উমার দুই চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। খুড়িমা

তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া অঞ্চলে তাহার মুখ মুছাইয়া দিতে দিতে আদরের স্থরে বলিলেন—"পাগলি, কেঁদেই যে সারা হলে। ছি, মা, ছোট্ট মেয়ের মত কান্না তোমার সাজে না। কান্না মানায় যে দুর্ব্বলহৃদয়া তার, তোমার বুক যে লোহার চেয়েও শক্ত, ওখানে কোন ঘা ত বসবে না। কেঁদ না উমা. দৃঢ় হও।"

উমা তাঁহার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ক্ষুদ্র বালিকার মতই কাঁদিল। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া, শেষে চক্ষু মুছিয়া মুখ তুলিল, রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, এই জন্যেই আপনার কাছে এসেছি খুড়িমা। বাবাকে সব কথা বলতে পারিনে, জানিনে কেন লজ্জা হয়। ঠাকুর-মা এ সব কথা মোটে শোনেনই নি। উষাকে এই রকম ঘরে দেওয়া হয়েছে বলে একেই কেঁদে মরছেন। তাতে যদি এ কথা শোনেন, তবে নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করবেন। আমি বাবাকে বলেছি—এ কখনই হতে পারবে না। তিনি আর কোনও কথা বলেন নি, চুপ করে আছেন।"

উমার মাথায় হাতখানা রাখিয়া গভীর স্থরে খুড়িমা বলিলেন, "আমি আশীর্ব্বাদ করছি মা—তুমি সংসারের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হবে। মনকে এমনই উন্নত রাখ, এমনই উদার রাখ। আমাদের সংসার তোমার মত পুণ্যবতীর স্পর্শে ধন্য হয়ে যাক। যে সব অভাগিনী বিধবা হয়ে আছে, তাদের হৃদয় তোমারই মত জ্ঞানের কিরণ দ্বারা, তারা আপনাদের ভগবানের শ্রীচরণে উৎসর্গ ফুল বলেই ভেবে নিক, সংসারের কোনও আকর্ষণ তাদের লক্ষ্যচ্যুত করতে পারবে না।"

পরদিন প্রভাতেই উমা দানীশকে উষার শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিল। বেলা প্রায় নটা দশটার সময় দানীশ ফিরিয়া খবর দিল, উষা বৈকালে আসিবে, কিন্তু আবার সন্ধ্যাবেলাই তাহাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

বগলাদেবী নির্ব্বিষ সর্পিণীর মতই গজরাইতে লাগিলেন—"ওঃ, মেয়ে

একেবারে যেন বেচে খেয়েছি। বিকেলে আসবে, সন্ধ্যাবেলা ফিরে যাবে। এর চেয়ে একেবারে না পাঠালেই ভাল। দিলুম সব তবু নাম নেই। ছেলেমানুষ মেয়েটাকে আটকে রেখে ভারি বিদ্যের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। ঝাঁটা মার অমন সব বিদ্বানের মুখে, উনানে পুড়িয়ে ফেলি অমন বিদ্যেকে।"

উমা বলিল "মিথ্যে বকছ তুমি ঠাকুর-মা। বিয়ে দিলে তার উপরে আমাদের আর স্বত্ব থাকে কি। যখন দান করা হয়েছে তখন সে তাদেরই, আমাদের কেউই নয়।"

গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় দানীশ পথে বাড়ী সব দেখাইয়া আনিতেছিল। দানীশ দেখাইল, "ওই দেখ সতী—উষার ননদ।"

মটরখানা পাশ দিয়া বাহির হইয়া গেল। বগলাদেবী গালে হাত দিয়া বলিলেন "ওমা, এই না কি উষার ননদ? এ যে খাঁটি মেম সাহেব।"

দানীশ হাসিয়া বলিল "খাঁটি মেমসাহেব হবে না তো কি আপনাদের মত হবে? ওদের বাড়ীখানা দেখবেন? চলুন না একটু ও-পথটা দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি আপনাদের। যাবে উমা?"

উমা তাহার সমবয়স্কা, সুতরাং পরস্পর পরস্পরের নাম ধরিয়া ডাকিত।

উমা ঠাকুর মায়ের স্বেদক্লিষ্ট মুখখানার পানে চাহিয়া বলিল, "না, একাদশী, বুড়ো মানুষ আর হাঁটতে পাচ্ছে না।"

বাস্তবিক বৃদ্ধা ঠাকুরমায়েরও আর বেশী হাঁটিবার সামর্থ্য ছিল না। তিনি বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে বলিলেন "হ্যাঁ দানীশ, ওদের বাড়ীর সবাই অমনি?"

দানীশ বলিল "না, উষার শাশুড়ী আপনাদেরই মত!"

আশ্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঠাকুর-মা বলিলেন "তবু ভাল—একজনকে উষা নিজেদের মত পেয়েছে।"

উমা ব্যাপার সবই মনীশের মুখে শুনিয়াছিল, তাই সে বেদনাভরে একটু হাসিয়া মুখ ফিরাইল।

বগলাদেবী তখন দ্বিতলে ছাদে বসিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কলিকাতা নগরী দেখিতেছিলেন ; উমা নীচে পূজার ঘরে বসিয়া সন্ধ্যা সারিয়া লইতেছিল। ঊষা আসিবে,—তাহার প্রাণটা ভারি ছটফট করিতেছিল।

"দিদি !"

এই আহ্বানটী তাহার কানে ভাসিয়া আসিতেই, সে চাহিয়া দেখিল, প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ঊষা। তাহার পিছনে আরও দুটী মেয়ে দাঁড়াইয়া ছিল,—একটিকে সে আজই মোটরে দেখিয়াছিল, অপরা তাহার অপরিচিতা।

সতী সাদাসিদা পোষাকেই আসিয়াছিল। তাহার গায়ে একটী ব্লাউস, একটী পেটিকোট, তাহার উপর একখানি সরু কালাপেড়ে ধুতি। কিন্তু রেখা খুব বেশী করিয়াই সাজিয়া আসিয়াছিল। তাহার পায়ে পাতলা ফুলতোলা ষ্টকিং, উঁচু গোড়ালীর জুতা, শাড়ীখানাও খুব পরিপাটী করিয়া পরিয়াছে। সে সতীকেও সাজাইবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু সতী কিছুতেই রাজী হয় নাই। রেখা আসিয়াছিল অত্যন্ত রাগ করিয়া,—মূল হইতেছে মনীশ। তাহার সখী যাহাকে ভালবাসে, তাহার প্রণয়িনীকে সে সম্পূর্ণ ছাঁটিয়া ফেলিতে চায়। সে দেখাইতে চায়—তাহারা কি আর উমা কি ! কিন্তু সতী তাহা বুঝে নাই, সে অত্যন্ত অবনত ভাবেই আসিয়াছিল। সে যথার্থ জানিয়াছিল, যাহার কাছে সে যাইতেছে, তাহার মত ধনী কেহ নাই, আবার তাহার মত নিঃস্বও জগতে পাওয়া দুর্ল্লভ।

উমা তাড়াতাড়ি একটা প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িল। সে বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। ঊষা দূর হইতেই তাহাকে প্রণাম করিল। পুণ্যবতী

তাপসী দিদিকে স্পর্শ করিতে সে ভারি সঙ্কুচিতা হইয়া উঠিতেছিল। উমা তাহার সঙ্কোচ বুঝিতে পারিয়া একটু হাসিল,—দুই হাতে তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার ললাটে একটা স্নেহ-চুম্বন দিয়া বলিল, "কিরে, আমায় ছুঁতে তোর ভয় হচ্ছে? তোর দিদি কি এতই উঁচু হয়েছে, আর তুই কি এতই নীচু হয়ে পড়েছিস উষা? তুইও যেমন তেমনি আছিস, আমিও যেমন তেমনি আছি, তবে এত দূরে থাকছিস কেন?"

বহুদিন পরে দিদির স্নেহময় বুকে মুখখানা রাখিয়া উষার চোখে জল আসিয়া পড়িল,—কত পুরাতন কথায় তাহার বুকখানা ভরিয়া উঠিল।

উমার চোখেও জল আসিতেছিল। সে তাহা সামলাইয়া, একটু হাসিয়া, মেয়ে দুটীর পানে চাহিয়া বলিল, "এস ভাই, আমি প্রথমেই তোমাদের সঙ্গে কথা বল্‌তে পারি নি, তার জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি। উপরে চল—নীচেটা বড় স্যাঁতসেঁতে, জল উঠছে।"

বগলা দেবীর কাছে গিয়া সে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, "উষা এসেছে ঠাকুর-মা।"

বগলা দেবী বিস্ফারিত নেত্রে উষার পানে চাহিলেন; সদুঃখে বলিলেন, "আ পোড়া কপাল, এই নাকি উষা? হ্যাঁরে উমা, তবে যে বলেছিলি, উষা খিষ্টেন হয় নি, সে হিন্দুই আছে। এ যে একেবারে খিষ্টেন হয়ে গ্যাছে, সে উষা তো আর নেই।"

তিনি যে ভাবে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন ও অমরনাথের উদ্দেশে গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে সাহস করিয়া উষা তাঁহাকে একটা প্রণামও করিতে পারিল না।

উমা একটু বিরক্ত হইয়া বলিল "কি বলছ ঠাকুর-মা তার কিছু ঠিক নেই। উষার কি বদল হতে দেখলে তুমি? আমি তো দেখছি, যেমন উষা তেমনই রয়েছে, কিছুই বদলায় নি।"

ঠাকুর-মা নাক ঝাড়িয়া ফেলিতে, খানিকটা তরল পদার্থ ছিটকাইয়া গিয়া সতীর কাপড়ে লাগিয়া গেল। রেখা অস্ফুটস্বরে বলিল "হ্যাষ্টি!"

ঠাকুর-মা সে দিকে মনোযোগ না দিয়া সানুনাসিক স্বরে বলিলেন "তুই বলছিস উমা, কিছুই বদলায় নি,—আমি দেখছি সব বদলেছে। আমায় একটা প্রণাম পর্য্যন্ত করলে না, আবার বলছিস কিছু হয় নি। তোরা সবাই মিলে আমার এমন সর্ব্বনাশটাও করলি,—আমার বুকটাকে একেবারে ভেঙ্গে দিলি।"

সেই সময় মনীশের মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উমাকে স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ও উষার মুখ দেখিয়া তিনি বগলা দেবীকে একটা ধমক দিয়া বলিলেন, "আপনি তো আচ্ছা লোক মা। শুধু শুধু এমন ভাবে কাঁদতে আরম্ভ করেছেন, যেন কি একখানা ব্যাপার ঘটেছে! উমা যাও তো মা, সতরঞ্চিখানা এনে এঁদের বসবার জন্যে পেতে দাও। হাঁ করে তুমিও দাঁড়িয়ে রয়েছ ছেলেমানুষের মত!"

উমা তাড়াতাড়ি সতরঞ্চ আনিয়া পাতিয়া দিল। মনীশের মা রেখা ও সতীর হাত ধরিয়া বসাইয়া দিলেন—"বস মা, ওর কথা কিছু ধরো না। অতিরিক্ত বুড়ো হলে মানুষের অম্‌নি হয়ে থাকে।"

উমা একটু হাসিয়া বলিল, "মানুষকে একেবারে তাজ্জব করে দিতে আমার এই ঠাকুর মাটী যেমন, তেমন আর কেউ নয়। তোমরা কিছু ভেব না ভাই, দেখ না, এখনি আবার যে মানুষ সেই মানুষ হয়ে যাবেন 'খন। আজ একাদশী কি না, তাইতেই আরও অমনি করে উঠেছেন।"

সতী শান্ত হাসি হাসিল, রেখা ঈর্ষাপূর্ণ কটাক্ষে চাহিল।

সে কিছুতেই উমাকে সরল চোখে দেখিতে পারিতেছিল না। উমার জন্যই তাহার বাল্য-সখী আজ এত কষ্ট পাইতেছে, এ কথাটা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। উমার মধ্যে যে পবিত্র সত্যটা জাগিতেছিল,

তাহা তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিতেছিল, রেখা তাহা দেখিয়াও দেখিতে চাহিতেছিল না।

দুই একটা কথা বলিয়া উমা মনীশের মায়ের সহিত নীচে চলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে উষাও ছুটিল। বগলা দেবীও তাহার একটু পরে গা-ঢাকা দিলেন

নির্জ্জন পাইয়া রেখা জিজ্ঞাসা করিল, "উমাকে কি রকম দেখছ ?"

সতী বলিল, "খুব ভাল। যা দুই একটা কথা আমি শুনলুম, তাতে বেশ জানা যাচ্ছে, উমার হৃদয় খুব উন্নত, মার্জ্জিত। আমার বউদিটা যেমন,—না এ দিক না ওদিক, কোন দিকেই না।"

বউদির ছেলেমানুষির কথা মনে করিয়া সতীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

রেখা কি বলিতে যাইতেছিল, সেই সময় উমা ফিরিয়া আসিল। নিকটে বসিয়া হাসিমুখে বলিল, "দেখ তো অন্যায়, খাবার করতে গেছি, সঙ্গে সঙ্গে উষাও গিয়ে হাজির। তার পরে ঠাকুর মা—তিনিও দেখি কোনও রকমে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। ওঁকে আমি কোথায় বসিয়ে রেখে গেলুম—"

সতী মৃদুকণ্ঠে বলিল, "ওঁর বোধ হয় ভয় হয়েছিল, পাছে আমরা দুটিতে আধাআধি বখরা করে ওঁকে খেয়ে ফেলি।"

তিনজনেই হাসিয়া উঠিল। উমা বলিল, "হ্যাঁ, সেটা ভাবতে পারেন বটে ; কারণ উনি দেশ ছেড়ে কখনও বার হন নি। তোমরা ভাই ওঁর কোনও দোষ নিয়ো না। একে লেখাপড়া জানেন না, কাকে কি বলতে হয় তাও জানেন না, যে জায়গায় আছেন সেখানে সভ্যতার ধার কেউ ধারেও না, কাজেই সে সবও জানেন না।"

সতী বলিল, "না, না, দোষ ধরব কেন ? আমাদেরও তো ঠাকুর মা উনি—শুধু তোমাদেরই তো নন। অমনি একটা ঠাকুর মা থাকা ভাল, মেয়ে বউ অনেকটা বশে থাকে।"

উমা তাহার মুখের দিকে বিস্ময়ের ভাবে একটু তাকাইয়া তাহার পর একটু হাসিল।

এই দুইটী মেয়ের মধ্যে সতীই তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল খুব বেশী রকমেই। সতীর চোখে মুখে সে নম্রতা দেখিতেছিল; কিন্তু রেখার মুখে জাগিয়াছিল গর্ব্বের চিহ্ন। সেই জন্য সে রেখাকে বেশী নাড়িতে সাহস করিতেছিল না,—যা কথাবার্ত্তা চলিতেছিল সবই সতীর সঙ্গে।

রেখা বলিল "ঘরগুলো দেখাও না ভাই, মনীশ বাবুর ঘরটায় না কি ভারি জ্ঞান ভরা আছে, সেই জন্যেই আমার আসা। সেদিন কথায় কথায় তিনি বলেছিলেন, আমার ঘরটা জ্ঞানের ভাণ্ডার; সে জ্ঞানের ভাণ্ডারটা একবার দেখে যাওয়া উচিত নয় সতী?"

সতী মৃদু হাসিয়া বলিল, "সেটা তুমিই জানো।"

রেখা গম্ভীর ভাবে কেবল মাথা দুলাইল। উমা বলিল, "দেখতে চাও এস, কিন্তু জ্ঞান তো সেখানে আমি একটুও দেখতে পাই নে।"

মনীশের গৃহের দ্বার সে খুলিয়া দিল।

গৃহের এক পাশে ছোট একটা টেবিল, তাহার পাশে একখানা চেয়ার মাত্র। টেবিলের উপর খানকতক বই, খাতা সাজানো। দেওয়ালে বইয়ের আলমারী, বইগুলা পরিষ্কার ভাবে সাজানো। এক পাশে একটা স্প্রীংয়ের খাট,—মনীশের বিছানাটা গুটানো পড়িয়া আছে। দেয়ালে মনীশের বৃহৎ একখানা অয়েল পেন্টিং, তাহাতে মা বসিয়া, পায়ের কাছে মনীশ ও দানীশ। দেয়ালে আরও কয়েকখানা ছবি ছিল,—তাহাতে সতীদের বাড়ীর আধুনিক সভ্যতার ছবির মত একখানাও ছিল না।

রেখা মুখখানা বক্র করিয়া বলিল, "মনীশ বাবুর রুচি চমৎকার। এই ঘরে বসে তিনি যে কি জ্ঞান উপার্জ্জন করেন, তা আমি বলতে পারি নে।

দেখা যাক, এই বই কয়খানা নেড়ে চেড়ে—এতে যদি কোনও জ্ঞান থাকে।”

উমা হাসি মুখে বলিল “বই গুলোয় যথার্থ জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানটাই মনীশদা পেয়েছেন। ওগুলো আমাদের শাস্ত্র।”

রেখা মুখ ফিরাইয়া একটা খোঁচা দিয়া বলিল “তুমিও তো শাস্ত্র জান ভাই, সেই জন্যেই মনীশ বাবুর সঙ্গে তোমার অত মেলে।”

উমা বলিল “শাস্ত্র আমি কিছুই জানিনে, তবে যেটা মনীশদা বলেন সেইটেই শুনে যাই, মেনে যাই। অনেক সময় তাঁর মতের সঙ্গে হয় তো আমার মতের মিল হয় না, তাতে তিনিই চটে উঠেন। এই একটা কথা সেদিন হয়েছিল, তিনিও ত ভুল বুঝেছিলেন, আমিও ভুল বুঝেছিলুম, সেই ভুলের কথাতেই তিনি পালিয়েছেন।”

সতী উৎসুক চোখ দুটি তাহার মুখের উপর রাখিল; বলিল “কি ভুল ?”

উমা একটু হাসিয়া সে কথা চাপা দিবার চেষ্টায় বলিল “সে একটা কথা। বলতে পারতুম—যদি সময় পাই কোনও দিন তবে বলব। আজ আমায় মাপ করতে হবে ভাই, সে কথা আজ বলতে পারব না।”

সতীর মুখটা গম্ভীর হইয়া উঠিল, সে সরিয়া গিয়া একখানা ছবির কাছে দাঁড়াইয়া উর্দ্ধদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল।

রেখা ততক্ষণ টেবিলের বই খাতাগুলা নাড়াচাড়া করিতেছিল। একখানা খাতা তুলিয়া সে সতীর পানে চাহিয়া বলিল “মনীশবাবুর একটা লেখা পড় সতী, দেখ, আমি যা বলেছি তাই ঠিক কি না ?”

প্রবন্ধটী স্ত্রীশিক্ষা, বিবাহ প্রভৃতি লইয়া লিখিত। স্ত্রীলোককে যেভাবে শিক্ষিতা করা আদিমকালে হইত, আজকালকার শিক্ষার সহিত সেই শিক্ষার তুলনা করা হইয়াছে। মনীশ তাহার লেখায় ইহাই দেখাইতে

চেষ্টা করিয়াছে—পূর্ব্বকালেও মেয়েরা খুবই শিক্ষিতা হইতেন, কিন্তু সেটা সংযমের মধ্য দিয়া—ব্রহ্মচর্য্যের মধ্য দিয়া। শুধু পুরুষদের জন্যই যে শিক্ষা, সংযম, ব্রহ্মচর্য্য ছিল তাহা নয়, মেয়েদের জন্যও ছিল। আজকালও মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে—কিন্তু তাহাতে সুনীতি ও সংযমতার একেবারেই অভাব।

লেখা পড়িয়া সতী একটু হাসিয়া বলিল, "মনীশবাবু আমাদের একেবারে অপদার্থ বলে মনে করেন।"

রেখা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল "শুধু কথাতেই তাঁর সেই ঘৃণার ভাবটা ফুটে ওঠে না, লেখার মধ্যেও সে ভাব ফুটে বেরিয়েছে।"

উমা শান্ত কণ্ঠে বলিল "তোমরা তাঁর কথা বুঝতে পার নি ভাই। তাঁর কথা বলবার রকমটা এমনি—হঠাৎ কেউ বুঝতে পারে না; কাজেই তাঁর উপরে বিরক্ত হয়। আমি মনীশদাকে বেশ চিনি। তিনি এতে তোমাদের নিন্দে করেন নি। তিনি বলতে চাচ্ছেন—এই লেখাপড়ার মধ্যে দিয়ে যদি সংযমটাকে আনতে পারা যায়, সেই যথার্থ শিক্ষালাভ হয়। শূন্যগর্ভ লেখাপড়া কোনও কাজের হতে পারে না। অবশ্য আমি বাইরের কাজ বলছিনে, অন্তরের কাজ বলছি—যা আমাদের সঙ্গে ভগবানের সংযোগ করে রাখে।"

রেখা কথাটা চাপিবার চেষ্টা করিতেছিল, পারিল না, বলিয়া ফেলিল "তুমি পেরেছ ?"

উমা বিস্ময়ে বলিল "আমি! আমি কি পারব? আমার শিক্ষা কতটুকু ভাই! তবু তার মধ্যে যেটুকু হতে পারে তা' পেরেছি। আমি তো সব বিলিয়েই বসে আছি ভাই, আমার আর কি আছে? আমি যে বিধবা, ব্রহ্মচারিণী।"

রেখা বলিল "আজ একাদশী তুমিও করেছ ?"

উমা বলিল "করেছি।"

রেখা হাতের খাতাখানা টেবিলে রাখিয়া বলিল "আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, একাদশী করে কি লাভ?"

"লাভ?" উমা হাসিয়া ফেলিল; স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল "লাভ আমাদের প্রবৃত্তিকে দমনে রাখা। ভগবানকে পাওয়া যদি কথার কথা হতো, যদি হাত বাড়িয়েই পাওয়া যেত, তবে ভাবনা কি থাকত ভাই? কত উপরে আছেন তিনি, আমাদের যেতে গেলে ধাপে ধাপে উঠতে হবে। সংযম সব সময়েই দরকার। ধাপ—জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি প্রভৃতি। সংযম না করতে পারলে আমি পারব কি করে উঠতে? আমরা উপবাস করি অভ্যাসের জন্যে, সকল ইন্দ্রিয়কে বশে আনবার জন্যে। তারা আমাদের চাকরের মত খাটিয়ে নেয়। আমরা তাদের খাটাতে চাই, এই জন্যেই আমাদের একাদশী করা।"

রেখা বলিল "দেহকে কষ্ট না দিলে বুঝি ভগবানকে পাওয়া যায় না?"

তাহার কথার মধ্যে শ্লেষোক্তি ফুটিতেছিল!

উমা তেমনি স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল "কই আর তা পাওয়া যায়? তবে যাঁরা জন্মজন্মান্তর ধরে এই একই লক্ষ্য নিয়ে আসছেন—তাঁদের কথা, এ জন্মে, আলাদা। কিন্তু তেমনি এটাও জানতে হবে, তাঁরা কত জন্ম ধরে এমনি করে উপবাস করেছেন—কোনও দিন অর্দ্ধাশনেও কাটিয়েছেন। দেহকে কষ্ট দেওয়া তো এতে হয় না, ইন্দ্রিয়কে বশে আনবার জন্যে এটা করতে হয়। ভগবানকে ভোগের মধ্যে দিয়ে পাওয়া যায় না, ত্যাগের মধ্যে দিয়ে পাওয়া যায়। এই ত্যাগের মধ্য দিয়েই ভগবানকে অনেকে পেয়েছেন। সংযম ত্যাগেরই একটা দিক। আমরা যে ত্যাগ করতে পারব—এই সংযমের দ্বারাই তা প্রতিপন্ন হবে।"

উমার কথাগুলো সতীর বুকের মধ্যে বাজিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল। উমার মুখে সে মনীশের কথাই পাইল। সে ঠিক বুঝিতে পারিল না—ইহা মনীশের কথা না উমারই কথা।

রেখা তর্কে হটিল না, বলিল "অনেকে ত্যাগ না করেও ভগবানকে পেয়েছেন। যাঁরা ব্রহ্মবাদী—"

উমা স্থির কণ্ঠে বলিল "সে আলাদা কথা নয়, তারও মূলে এই সংযম। আমাদের শাস্ত্র বলছে, মানুষ মরলেই ফুরায় না, কর্ম্মফলে আবার তাকে টেনে আনে। আমরা হিন্দু, আমরা কর্ম্মফল মানি, জন্মান্তরবাদ মানি। আমরা জানি, একটা জন্মেই আমাদের সব ফুরিয়ে যায় না, আমাদের অনেক অসম্পূর্ণতা থেকে যায়! সেই অসম্পূর্ণতাটা পূর্ণ করতেই আমরা বারবার সংসারের বুকে আসা যাওয়া করছি। যাঁকে বলছ ত্যাগ না করেও ভগবানকে পেয়েছেন, তিনি কত জন্ম-জন্মান্তর ধরে ত্যাগের সাধনা করে আসছেন, কঠোর সংযম প্রতিপালন করে আসছেন। এ জন্মে তিনি ত্যাগের ভাব দেখান নি, কিন্তু অন্তর তাঁর যথার্থ ত্যাগী! তাঁর কাছে আসা যাওয়া সমান,—কোনটাই তাঁকে সুখ বা দুঃখ কিছুই দিতে পারে না।"

রেখা আর কথা কহিতে পারিল না, বলিবার মত আর কিছু সে খুঁজিয়া পাইল না।

সতী প্রশংসমান নেত্রে উমার পানে চাহিয়া রহিল। শুধু রূপ নয়, জ্ঞানেও যাহার হৃদয় এত উন্নত, সে যে যথার্থ-ই সকলের কাছে ভক্তি ভালবাসা পাইবার যোগ্য। সম্মুখে পুণ্যতোয়া সুশীতল গঙ্গাবারি থাকিতে কূপজল পান করিতে ছুটিয়া যায় কে? মনীশের সম্মুখে ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী উমা,—সে ব্রহ্মচারিণী; ত্যাগই যাহার মূলমন্ত্র, সংযম যাহার সঙ্গিনী। মনীশ বিলাসের পানে চাহিবে কি করিয়া? সে যাহা চায়, এখানে যে

তাহাই মিলে। উমার কিছু নাই; কিন্তু সতী দেখিতেছে, উমার যাহা আছে, তাহা তাহার নাই। তুচ্ছ ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি; তুচ্ছ সে বাহিরের জ্ঞান! সে যদি যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে পারিত তাহার বিনিময়ে,—নিজের জীবনকে সে যে তাহা হইলে সার্থক বলিয়া ভাবিতে পারিত।

মনীশের মা বাহিরে জায়গা করিয়া খাবার দিয়া ডাকিলেন।

সতী বাহির হইয়া খাবার দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, বলিল "এসব কেন দিচ্ছেন? আজ উমার মুখে যা শুনেছি, তাতেই পেট ভরে গ্যাছে। খাবারের দরকার নেই মা, ও সব তুলুন।"

মনীশের মা হাসিয়া বলিলেন, "কি শুনেছ মা উমার মুখে?"

উমা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "কিছু না খুড়িমা। জিজ্ঞাসা করছিলেন একাদশী করে কি লাভ হয়; তাই বলছিলুম।"

জলখাবার খাইয়া সতী ও রেখা বিদায় চাহিল। ঊষা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে সকলকে প্রণাম করিল।

উমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আমি তো কাল পরশুই চলে যাব ঊষা, তোকে ওঁরা পাঠাবেন না—বাবার সঙ্গে তোর দেখা হ'ল না। যাই হোক, মনে কিছু দুঃখ করিস্ নে ঊষা, ভগবানের উপরে মনটা ঠিক করে যে যা বলবে তাই করে যাবি।"

সতীর পানে চাহিয়া বলিল "একদিন তোমার দাদাকে পাঠিয়ে দিয়ো ভাই, পরশু বিকেলে আমরা যাব। কালকের মধ্যে যাতে তোমার দাদা একবার আসেন, তাই বলে দিয়ো।"

তাহার পর একটু হাসিয়া বলিল, "আর এ তো ভাই কুসংস্কারভরা প্রসাদপুর নয়—যেখানকার মেয়েরা অনায়াসে পুরুষের গায়ে হাত পর্য্যন্ত তোলে, কত রকম কথা বলে, যে সব কথার মধ্যে তোমার দাদা

ঢুকতেই পারেন না। সেখানকার শিয়ালের ডাক শুনে না কি তোমার দাদা একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। আর আমাদের ঠাকুর বাড়ীতে যখন আরতির শাঁক ঘণ্টা বেজে উঠেছিল, তোমার দাদা তখন না কি দুই কানে আঙ্গুল দিয়ে ছুটে পালিয়েছিলেন। তাঁর ডাক্তারী শাস্ত্রে না কি লেখা আছে, বেশী শব্দে মাথার কোন শিরা ছিঁড়ে যায়। এ ভাই কলিকাতা; আর এ তাঁর বন্ধুরই বাড়ী, এখানে তিনি, অনেকবারই এসেছেন। আসতে বল তাঁকে একবার, ঠাকুরমা একবার দেখতে চেয়েছেন।"

সতী বলিল "নিশ্চয়ই বলব।"

তাহারা চলিয়া গেল।

উমা খানিক শূন্য হৃদয়ে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া উপরে গেল।

"আচ্ছা খুড়িমা, সতী মেয়েটী তো বেশ। ওর সঙ্গে মনীশদার বিয়ে দিলে ভাল হয় না?"

খুড়িমা মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিলেন "মেয়ে খুব ভাল, কিন্তু মনীশ বিয়ের উপরে একেবারেই চটা। এক দিন তোমার ভগ্নিপতিই মনীশকে বলেছিল,—মনীশ একেবারে রুখে ওঠায় বেচারা ভয়ে চুপ।"

উমা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "কিন্তু খাসা মেয়ে। এত যে লেখাপড়া শিখেছে, তা একটু জানা যায় না। উষাও বললে, সে বড় ভাল মানুষ। আর সে চুপে চুপে বললে, মনীশদাকে না কি বড্ড ভালবাসে। তাই শুনেই তো আমার ভারি ইচ্ছা হয়েছে। যখন মনীশদা আসবে। তখন আমি থাকব না,—নইলে আমিই জোর করে বলতুম।"

খুড়িমা হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা, সে এলে পরে আমি তাকে প্রসাদপুরে পাঠিয়ে দেব,—দেখব, কেমন করে তাকে রাজী করতে পার।"

উমা ফিরিয়া আসিল।

অমরনাথ হর্ষোৎফুল্লনেত্রে কন্যার পানে চাহিয়া বলিলেন "গঙ্গাস্নান করে এসে মা আরও রোগা হয়ে গেছিস।"

উমা নিজের পানে চাহিয়া পিতার পানে চাহিল, "না বাবা, তুমিই রোগা হয়ে গ্যাছ। বামুন ঠাকরুণের হাতের রান্না, দেখ্‌বার শুনবার লোক ছিল না, রোগা আর হবে না? আমি গঙ্গাস্নান করতেই যে গেছলুম তা নয় বাবা, উষাকে একবার দেখ্‌তে গেলুম, সে কেমন আছে তাই ঠিক করে শুনতে গেলুম। দেখ্‌লুম, সে বেশ ভালই আছে।"

কন্যার কথা মনে করিয়া অমরনাথ একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

উমা বলিল "তুমি একবার গিয়ে দেখে এস না বাবা। মৃন্ময়ও এক দিন এসেছিল, বেশ কথাবার্ত্তা বলেছে। তোমায় একবার দেখ্‌বার জন্যে উষার যে কান্না—"

অমরনাথ অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "সুখে থাক সে আশীর্ব্বাদ করছি। তাকে গিয়ে দেখে আসতে বলছ মা, আমি মেয়েকে দেখতে যেতে পারব না।"

উমা বলিল "আমি যদি কোথাও থাকতুম বাবা, তা হলে আমায় দেখ্‌তেও তো তুমি যেতে না?"

স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি তাহার মুখের উপর রাখিয়া অমরনাথ বলিলেন "তুই যে আমার মা, উমা,—মাকে ছেড়ে ছেলে কোথায়ও থাকতে পারে স্থির

হয়ে ? তোকে আমি কোথায় যেতেই দেব না। আর দুদিন যদি কলকাতায় থাক্‌তিস্‌, আমাকে বাধ্য হয়ে যেতেই হ'ত।"

সে মাত্র আট নয় দিন বাড়ী ছিল না, ইহারই মধ্যে সংসারটা আগোছালো হইয়া গিয়াছে। দাসী চাকরগুলি যতদূর ফাঁকি দিবার তা দিতেছিল। উমার চোখের সামনে সকলেই সংযত থাকিত, উমাকে সকলেই ভয়মিশ্রিত ভালবাসিত।

এখানে আসিবার দুই চারি দিন পরে উমা উষার একখানা ও মৃন্ময়ের একখানা পত্র পাইল। উষা অনেক কথায় পত্রখানা ভরাইয়া ফেলিয়াছে। পিতাকে যে সে দেখিতে পাইল না। সেই কথা যেখানে লিখিয়াছে, সেখানটা চোখের জলের চিহ্নে পূর্ণ। সে লিখিয়াছে—জোর করিয়া সে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছে। বাস্তবিক, আর লেখাপড়ার তাহার কি-ই বা দরকার।

মৃন্ময় যে পত্রখানা লিখিয়াছে সেখানা বেশ উঁচু ধরণের। সে সতীর মুখে শুনিয়াছিল এবং মনীশের বাসায় যাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টাও করিয়াছিল, কিন্তু তাহার বড় দুর্ভাগ্য যে সহরের বাহির হইতে ডাক আসায় সে আসিতে পারে নাই। সে পূজার সময় নিশ্চয়ই আসিবে এবং অমরনাথের সহিত দেখা করিয়া যাইবে।

পত্র দুখানা সে অমরনাথকে দিল।

উষার পত্র পড়িয়া অমরনাথ হাসিলেন, মৃন্ময়ের পত্র পড়িয়া গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। পত্রখানা উমার হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "দয়া করে সে যে আসবে বলেছে, এই যথেষ্ট। তার আসা আমাদের কাছে দুরাশা মাত্র। বেশী লেখাপড়া শিখলে আমাদের দেশের ছেলেরা যথার্থ মানুষ হতে পারে না,—আমি বলি, তারা একেবারে বয়েই যায়।"

উমা বলিল "কেন বাবা—মনীশদা তো বয়ে যায় নি ?"

অমরনাথ বলিলেন "ওই রকম কদাচিৎ এক আধটী দেখা যায়, এদের কথা ধরা যায় না। আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক বলে কলকাতার লোকেরা আমাদের চাষা বলে ভাবে—তা দেখছ উমা ?"

উমা একটু হাসিয়া বলিল, "ভাবনাটা করাই অন্যায় বাবা। দেড়শো বছর আগে কলকাতা পাড়াগাঁ ছিল শুনেছি, তখন এই সব দেশগুলোই সভ্য উন্নত ছিল। তুমিই তো সেদিন বলছিলে বাবা, কলকাতায় কিছুই ছিল না, ক্রমে ক্রমে উন্নত হতে হতে আজ কলকাতার নাম সব দেশেই জানতে পেরেছে। তা বলে—কলকাতার লোকদের পাড়াগাঁকে এতটা নীচু বলে ভাবা উচিত নয়। এখনও পাড়াগাঁ হতে অনেক জিনিস যায়, তবে তারা খেতে পায়।"

বগলাদেবী অমরনাথের কথার সাড়া পাইয়া আসিয়া পড়িলেন। এখানে আসিয়া তিনি এক দিন কয়েক মিনিটের জন্য মাত্র অমরনাথের দেখা পাইয়াছিলেন। উমার মুখে তাঁহার প্রতি বগলাদেবীর তর্জ্জনগর্জ্জন শুনিয়া অমরনাথ প্রমাদ গণিয়াছিলেন,—স্বেচ্ছায় তাঁহার সম্মুখে তিনি আসিতে চান নাই।

বগলাদেবীকে দেখিয়া তিনি আস্তে আস্তে উঠিতেছিলেন। ইঁহার মুখের কথার সম্মুখে তিনি যে কোনও রকমে দাঁড়াইতে পারিবেন না তাহা বেশ জানিতেন। বিপদটাও অবশ্যম্ভাবী, তাই তিনি সরিয়া পড়িবার উদ্যোগ করিতেছিলেন।

বগলাদেবী একেবারে সামনে আসিয়া বসিয়া আগেই কান্না আরম্ভ করিয়া দিলেন !

অমরনাথ খানিক নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "শুধু শুধু কাঁদছ কেন পিসীমা ?"

চোখ মুছিতে মুছিতে বগলাদেবী বলিলেন "শুধূ শুধু মেয়েটার এমনি

করে সর্ব্বনাশ করলি,—বাপ হয়ে তাকে সত্যিই তুই ভাসিয়ে দিলি,—আবার বলছিস্ শুধু শুধু কাঁদছ কেন? আমি যে তার কথা ভেবেই কাঁদছি। তার মা নেই বলে কি এমনি করে তাকে ভাসিয়ে দিলি রে? এই তো উমা দেখে এসেছে, জিজ্ঞাসা করে দেখ না—সেই উষা—সে আজ কি হয়েছে? আনবার কথা বললুম, তার ননদ বললে এখন আসবে না। কোথায় রেখে না কি লেখাপড়া শেখাচ্ছে।”

অমরনাথ বলিলেন “লেখাপড়া শেখাচ্ছে সে তো ভাল কথাই।”

বগলাদেবী মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন “ভাল কথাই বই কি? কি করে ভাল কথা হল, বল দেখি? তোর উষা যে একেবারে খিষ্টেন হয়ে গেল, তাকে বাড়ীতে আনলে এর পর যে তোর জাত যাবে!”

শান্তকণ্ঠে অমরনাথ বলিলেন “বাড়ীতে এনেই বা কি লাভ আর? সে থাকবে সেখানে, এখানকার সঙ্গে আর তার কি সম্পর্ক আছে? যে দিন তাকে দান করেছি, সেই দিনই তো সে পরের হয়ে গ্যাছে,—এখানকার সঙ্গে তার সকল সম্পর্ক সেই দিনই তো ফুরিয়েছে। মেয়ে জন্মায় পরের জন্য, সে আপনাদের জন্যে তো নয় পিসীমা। উমাকে কাছে পেয়েছ, তাকে কাছে পাবার প্রার্থনা কর না,—আশীর্ব্বাদ কর, সে চিরজন্মটা সেখানেই থাক, তাকে যেন এখানে না আসতে হয়।”

এই কথাটার পর আর কথা বলিতে বগলাদেবীর সাহস হইল না। অমরনাথ সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়া বলিলেন, “এবার পূজোর আগে কাশী যাব,—যাবে পিসীমা? আমার আর এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না, দিন কতক সব দেশগুলো বেড়িয়ে আসা যাক্, কি বল?”

পিসীমা মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিলেন “আমি তো কতবারই গেলুম,—যেতে বাকি আছে এইবার।”

হাসি চাপিয়া অমরনাথ বলিলেন “না, এবার সত্যিই যাব। এত দিন

তোমার মনেই বৈরাগ্যটা ছিল, আমার মনে তো হয়নি। এদিককার ব্যবস্থাগুলো করে ফেলে মাস ছয় সাতের জন্যে বেরুব। আমিও যে কিসের জন্যে সংসারে এমন করে জড়িয়ে বসে আছি তা জানিনে,—আমার তো কিছুই নেই। একটা মাত্র মেয়ে—সেও ব্রহ্মচারিণী। ঊষার দায়ে তো নিশ্চিন্তই হয়েছি—সে ভাবনা আর ভাবতে হবেও না। মনীশের মাকে একখানা পত্র লিখে তাঁদের বিষয়গুলো বুঝে নিয়ে যেতে বলি। আমার ঘাড়ে কেন আর এ জোয়াল রাখা। আমার বইবার ক্ষমতা আর নেই, দিন দিন বয়েস হচ্ছে তো!"

পিতার এমনিধারা আভাস কিছুদিন হইতেই উমা পাইতেছিল। অমরনাথের স্বাস্থ্যও দিন দিন খারাপ হইতেছিল। পূর্ব্বের মতই সব কাজ তিনি জোর করিয়া করিতে যাইতেন, কিন্তু পারিয়া উঠিতেন না।

দেওয়ান এক দিন আসিয়া চুপি চুপি উমাকে ডাকিয়া বলিল, "বাবু যে উইল করেছেন, তা জানো মা?"

উমা বিস্ময়ে বলিল "কই না, বাবা তো কিছু বলেন নি!"

দেওয়ান বলিলেন, "তা হ'লে সে কথা তিনি তোমায় জানান নি। তিনি কাল সহরে গেছলেন, উইল করে এনেছেন।"

উমা উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল "কি উইল করেছেন—জানেন কাকা?"

দেওয়ান বলিলেন "জানি বই কি মা! এই সব বিষয় সম্পত্তি, সমস্তই তিনি তোমায় দিয়ে যাচ্ছেন।"

উমা বলিল "ঊষা!"

দেওয়ান মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তাকে কিছু দেবেন না। আমি বলেছিলুম; তাতে তিনি বললেন, ঊষাকে দিয়ে আমার কোনও লাভ হবে না। তিনি আরও বললেন, যদি উইল না করে রেখে যান, মৃন্ময় এসে গোল বাধাতে পারে। তোমায় সামান্য একটা দাসীর মত একপাশে

ফেলে রেখে সে নিজে সব নিয়ে নেবে! এতে কোনও উপকার হবে না। কারণ সে হিন্দু হলেও হিন্দুর কোনও প্রথা, কোন কাজ করতে চায় না।"

উমা স্থিরভাবে বলিল "এ কিন্তু কিছুতেই উচিত নয় কাকা। আচ্ছা, আমি বাবাকে বলব'খন,—দেখি, কি বলেন তিনি।"

প্রথম আষাঢ়ের বৈকাল—আকাশ মেঘে ভরিয়া গিয়াছিল, কড় কড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিতেছিল, চোখ ধাঁধিয়া বিদ্যুৎ ছুটিতেছিল। অমরনাথ খোলা জানালার পাশে বসিয়া নূতন মেঘের খেলা দেখিতেছিলেন। শরীরটা খারাপ বোধ হইতেছিল,—শীত শীত লাগিতেছিল বলিয়া গায়ে একখানা মোটা লুই জড়াইয়াছিলেন।

উমা গৃহে প্রবেশ করিয়াই বলিল "এই গরমে গায়ে মোটা লুইখানা জড়িয়ে বসে আছ যে বাবা? শরীর খারাপ করেছে বোধ হয়। আর ওই জানালাটা খুলে রেখেছ, ঠাণ্ডা বাতাসটা এসে সমানে গায়ে লাগছে।"

অমরনাথ একটু হাসিয়া বলিলেন "বাতাস লাগতে পারবে না বলেই তো লুইখানা গায়ে দিয়েছি উমা।"

উমা জিজ্ঞাসা করিল "অসুখ করেছে?"

অমরনাথ বলিল "কি জানি, বুঝতে পারছিনে।"

উমা পিতার ললাটে হাত রাখিয়া দেখিল ললাট গরম। বলিল "এই তো, বেশ জ্বর হয়েছে তোমার। ওঠো বাবা, বিছানায় শুয়ে পড়বে চল, আমি জানালাটা বন্ধ করে দেই। কাল মাথা ধরেছিল,—আজ যদি স্নানটা না করতে, জ্বরটা হত না। তুমি কথা শুনবে না, আর রোজ এমনি করে অসুখ কর্‌বে। এর পরে যদি তোমার কিছু হয় বাবা—আমি কি করব বল তো?"

তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, সে জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল। কন্যার এই স্নেহের শাসনের কাছে পিতা আপনাকে ধরা দিলেন,—দ্বিরুক্তি না করিয়া আস্তে আস্তে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলেন। উমা লুইখানা দিয়া বেশ করিয়া তাঁহার সমস্ত দেহটা ঢাকিয়া দিয়া মাথার কাছে বসিল, বলিল "মাথা টিপে দেব বাবা, মাথা ব্যথা করছে ?"

পিতা চক্ষু মুদিত করিয়াছিলেন, বলিলেন "না মা।"

"না, তোমার মাথা ব্যথা করছে।" উমা মাথা টিপিতে লাগিল। অমরনাথের মুদিত নেত্র-কোণ বাহিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়িতেছিল, উমা তাহা মুছাইয়া দিল।

"আচ্ছা বাবা, তুমি যত বুড়ো হচ্ছো, তোমার তত দুরন্তপনা বাড়ছে কেন বল তো ? যা বলি তা কিছুতেই শোন না। এমনি করলে তুমি কয়দিন বাঁচবে বল তো ? আগে তোমার কেমন চেহারা ছিল, এখন এত বুড়ো হয়ে পড়েছ যে, কেউ তোমায় দেখলে বিশ্বাসই করতে চাইবে না—তোমার যথার্থ বয়স হয়েছে পঞ্চাশ বছর মাত্র।"

মাত্র পঞ্চাশ বছর—পিতা হাসিলেন "বড় কম বয়েস দেখছিস উমা ? পঞ্চাশ বছরের ঝড় বৃষ্টি রোদ যার মাথার উপর দিয়ে চলে গ্যাছে, সে বুড়ো হবে না ? আর আমার কর্ত্তব্য যা ছিল সব শেষ হয়ে এসেছে। এতদিন উৎসাহ ছিল, কাজেই আমায় শক্ত দেখেছিলি ! উষার বিয়ে একটা লক্ষ্য ছিল, তা হয়ে গেল। তোর সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করা দরকার ছিল, কাল তাও করে এসেছি। এখন বাকি আছে মনীশেরটা। তাকে আসতে বলেছি। সে কিম্বা তার মা এলে, সবগুলো বুঝিয়ে দিলেই, আমার একেবারে ছুটি।"

উমা উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলিল "আমার সম্বন্ধে কি করেছ বাবা ? কাকা বলছিলেন—কি উইল করে এনেছ, কিসের উইল বাবা ?"

পিতা বলিলেন "এই জমিদারীর।"

উমা বলিল "জমিদারীর কি উইল বাবা? শুনলুম আমাকেই সব দিচ্ছো, উষাকে কিছু দেবে না, সে কি রকম বাবা?"

অমরনাথ বলিলেন "এ ভালই করেছি মা। দেখ, মানুষের দেহের কথা কেউ বলতে পারে না। আমি আজ আছি কাল থাকব না। তুমি বালিকা, বিধবা, তোমায় ঠকিয়ে নিতে কারও দেরী হবে না। বিশেষ তুমি সংসার সম্বন্ধে কিছুই জান না। আমার যা, তা তুমি উষা, দুজনে পাবার অধিকারিণী বলছ—উষাকে আমি কিছুই দিলাম না কেন? উষাকে যে ঘরে দিয়েছি, তাতে তার কখনই অভাব হ'তে পারবে না। তা হ'লেও অর্দ্ধেক সে পেতে পারে—কিন্তু তাতে আমার সার্থকতা কি? মৃন্ময় থাকবে কলকাতায়, এখানে সে আসবে না, আমার প্রজাদের দেখবে না, তাদের অভাব অভিযোগ কিছুই শুনবে না। নিজের যখন দরকার পড়বে, তখন সে এদের বুক বাঁশ দিয়ে ডলে যাবে। আমার এই দেশ তার মত শিক্ষিতের কাছে ভাল কিছুরই প্রত্যাশা করতে পারবে না,—আবেদন জানিয়ে লাভ করবে অপমান। মা আমার, আমি এই সব ভেবেই আমার দেশকে, আমার আত্মীয়ের মত প্রজাদের মৃন্ময়ের হাতে তুলে দিলুম না, এদের তোমারই করে দিলুম। আমি যত দিন বেঁচে থাকব তত দিন আমার কাজ আমিই করব। তার পরে এ সব তোমারই কাজ, তুমিই করবে। আমি ভাল থাকতেই উইল করে রাখলুম—ভবিষ্যতে এ নিয়ে আর কোনও গোল হবে না। মৃন্ময় আশ্বিন মাসে আসবে বলেছে—কেন আসবে তা জানো? সে আসবে দেখতে, তার স্ত্রী কি পেতে পারবে। আজকাল সংসার ভারি কুটিল হয়ে পড়েছে মা,—অর্থের দিকে সবারই দৃষ্টি। কে বলবে যে উষাই তোমাকে শত্রুর চোখে দেখবে না?"

কথাটা তীক্ষ্ণ ছুরিকার মতই উমার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দিল,—আর্ত্ত-কণ্ঠে সে বলিল "না বাবা, তা হ'তে পারে না।"

পিতা হাসিলেন, "মা, তোমার চেয়ে আমি ঢের বুঝি,—সংসারকে আমি বেশ চিনি। আমি একমাত্র এই জ্ঞানলাভ করেছি—সংসারে অর্থ-ই মূল। এই অর্থের জন্যে ভাই ভাইয়ের বুকে ছুরি বসায়, বাপ ছেলেতে পৃথক হয়। মা আমার, তোমার জগতে আর কেউ নেই। নিজের বলে জানছ তুমি তোমার বাপ, ঠাকুরমা, আর বোনটীকে; কিন্তু তার যে আলাদা একটা সংসার আছে, দুদিন বাদে সে সন্তানের মা হবে। তোমাদের উপরে মায়া তার এখনও যা আছে, এর পরে তাও থাকবে না। আমি তোমায় তাদের দয়ার দানের উপরে ফেলে রেখে যাব না। তারা তোমার সঙ্গে যা ব্যবহার করবে, তা আমি বেশ জেনেছি। আমার প্রাণের ঠাকুর গোবিন্দজী পূজা পাবেন না। আমার দেশ হাহাকারে ভরে উঠবে। তাদের সেই হাহাকার, তোমার দুঃখ, আমার গোবিন্দজীর পূজার বাধা—এ আমার মরণের পরেও আমায় আকর্ষণ করবে। না মা, আমি যা করেছি, তা আর বদলাবার চেষ্টা কর না। মৃন্ময়কে কিছু জানিয়ো না, উষাকে কিছু জানিয়ো না। তারা যেমন আছে তেমনি থাক, জানব শুধু আমরা—আর কেউ নয়।"

উমা নীরবে পিতার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। পিতার কথা শুনিয়া সে একটুও খুসী হইতে পারে নাই। উষাকে যে কিছুই দেওয়া হইবে না—ইহাতেই সে যেন দেখিতে পাইল, উষা যথার্থই তাহাদের কাছ হইতে অনেক দূরে সরিয়া গেল। এই ব্যবস্থায় উষার শ্বশুর বাড়ীর সকলে যে কিরূপ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিবেন, তাহা ত জানা কথা।

উমা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

পূজা আসিয়া পড়িল, দেশ আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। অমরনাথ বৈবাহিক মহাশয়কে একখানা পত্র দিলেন,—যদি দুই তিন দিনের জন্যও উষাকে পাঠাইয়া দেন, তবে মনীশ তাহাকে লইয়া আসে।

মনীশ গিয়া দাঁড়াইবামাত্র উষা ছুটিয়া আসিল—"মনীশ-দা, আমায় নিয়ে যেতে হবে প্রসাদপুরে।"

মনীশ হাসিয়া তাহার বেণীটায় একটা টান দিয়া বলিল,—"ভারি স্ফূর্ত্তি দেখছি যে! বাপের বাড়ী যাওয়ার নামে পাড়া-গাঁয়ের মেয়েগুলো যেন লাফিয়ে মরে। সহুরে মেয়েরা বেশ,—বাপের বাড়ী তারা যেতেও চায় না।"

উষা রাগ করিয়া বলিল,—"সহুরে মেয়ে বড় ভাল, না মনীশদা? তুমি একটা বিয়ে কর না কেন সহুরে মেয়ে—বাপের বাড়ী যেতে চাইবে না। বেশ তোমাদের কাজ-কর্ম্মও করে দেবে, খুড়িমাও বেঁচে যাবেন।"

মনীশ বলিল, "ওই তো, ওইখানটাতেই যা বাধে। সহুরে মেয়ে আমাদের মত লোকের ঘরে মানায় না ভাই, কাজকর্ম্ম করা তাঁদের পোষায় না। আমাদের বাড়ী নিজেদের রাঁধতে হয়, দরকার পড়লে বাসন মাজতে হয়, ঘর ধুতে হয়, তাঁরা সেদিকে ঘেঁসতে চান না।"

উষা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "তারা কি চায়?"

মনীশ বলিল, "তারা চায়—চাঁদের কিরণ, ফুলের হাসি, তারা চায়—ছাদের উপরে শুয়ে পড়ে আকাশ পানে চেয়ে থাকা, দিনের বেলা বই পড়া ইত্যাদি ইত্যাদি। ও-সব ঝঞ্ঝাট আমার মত গরীবের পোষায় না ভাই।"

উষা বলিল, "যাক ওসব কথা, আমায় নিয়ে যেতে হবে যে?"

মনীশ বলিল, "কবে—আজই না কি ?"

উষা বলিল, "হাঁ, আজই বিকেলে। আমি সব গুছিয়ে রেখেছি,—তোমায় ডাকতে দিদিকে বলেছিলুম কাউকে পাঠাতে।"

মনীশ বলিল, "কেউই যায় নি আমায় ডাকতে, আমি আপনিই এসেছি। আমায় কেন আর সেখানে যেতে বলছিস উষা,—আমি ভাবছি এবার কলকাতা ছেড়ে যাব না। প্রত্যেকবার পূজায় তো প্রসাদপুরে যাই, এবার এখানে পূজোটা দেখা যাক। মৃন্ময়কে বলছি—যদি সে যায় তবে নিয়ে যাবে তোকে।"

সানুনাসিক সুরে উষা বলিল, "না, তোমাকে যেতেই হবে, দিদি আমায় লিখেছে, যেন তোমাকে সঙ্গে করে অবশ্য নিয়ে যাই। এই দেখ দিদির পত্র।"

পত্রখানা অঞ্চল হইতে খুলিয়া সে মনীশের হাতে দিল।

চকিতে তাহার মনে পড়িয়া গেল, উমা আর তাহাকে পত্র দেয় না। সে নিশ্চয়ই রাগ করিয়াছে, নহিলে পত্র দিল না কেন ?

সে ভাবিয়াছিল, কখনই আর প্রসাদপুরে যাইবে না, কিন্তু অমরনাথ তাহাদের জমীদারীর ব্যবস্থা করিয়া লইবার জন্য মাকে পত্র দিয়াছেন। মা তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন বলিয়াছেন। দানীশ ছেলে-মানুষ, জমীদারীর কাজকর্ম্ম কিছুই সে বুঝে না।

পত্রখানায় উমা লিখিয়াছে মনীশদাকে সঙ্গে করিয়া আনা চাই-ই, মনীশদার সঙ্গে তাহার কথা আছে। উষা যদি তেমন করিয়া ধরিয়া বসে, তাহা হইলে মনীশদা কখনই তাহার হাত এড়াইতে পারিবে না, তাহাকে প্রসাদপুরে আসিতেই হইবে।

সেখানা উষার হাতে দিয়া মনীশ চাপাস্বরে বলিল, "ইস্, ভারি জোর মনীশদার ওপরে,—মনীশদা যেন ওদেরই। যদি আমি না যাই, কি করবি তা হলে ?"

উষা তাহার জামার প্রান্ত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "দেখি কি করে তুমি যেতে পার। তোমার জামা ছিঁড়ে দেব, জুতোয় তেল ঢেলে দেব—"

শশব্যস্তে মনীশ বলিল, "না ভাই, অতটা আত্মীয়তা করে কাজ নেই, ছেড়ে দে জামাটা, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তোকে নিয়ে যাব।"

সতা সিঁড়ি বাহিয়া নামিতেছিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, "এ বড় শক্ত হাতে পড়েছেন মনীশবাবু, তাড়া দিলে উল্টে তাড়া খেতে হয়,—দরকার হলে পিঠেও দু'চার ঘা বসিয়ে দিতে পারে। ওকে ঘাঁটাবেন না, ছেড়ে দিন।"

মনীশ তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "হাম্‌তো কমলিকো ছোড়তা, লেকেন কমলি ছোড়তা নেই। জামাটা চেপে ধরেছে দেখ তো। এই গুলোই হচ্ছে পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিতা মেয়ের দোষ,—যে-সে লোকের গায় তারা হাত তুলতে যায়। সহুরে শিক্ষিতা মেয়ে হলে এতক্ষণ তিন হাত তফাতে দাঁড়িয়ে সানুনাসিক সুরে কেবল বলত—অনুগ্রহ পূর্ব্বক, এ ছাড়া আর কিছু করবার ক্ষমতা তাদের ছিল না।"

সতী আহতা হইয়া বলিল, "নিতান্ত আপনার লোক হলে সহুরে শিক্ষিতা মেয়েও অমনি করে চেপে ধরে মনীশ বাবু,—আপনার লোকের কাছে ছদ্মবেশের আবরণ দেওয়া যায় না। বউদি আপনার নিজের লোক বলেই আপনার জামাটা চেপে ধরতে পেরেছে, আমরা তো তা পারি নে, কারণ, আপনার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক দাদার বন্ধু বলে। নচেৎ আপনি পর বই আপনার ন'ন।"

মনীশ তাহার দিকে ফিরিল "কি বললে সতী? আমি তোমাদের পর? রোসো—এখনি গিয়ে মাকে বলে তোমায় বিলক্ষণ জব্দ করছি। লেখাপড়া শিখে বুঝি এই জ্ঞান হয়েছে?"

সতী নিঃশব্দে হাসিয়া বলিল, "তবে আমিও আপনাকে ধরব। এক-

জনকেই ছাড়াতে পারছেন না,—আমি শুদ্ধ গিয়ে যদি ধরি—পার্‌বেন আপনি ছাড়াতে ?"

মনীশ বলিল "রক্ষা কর, তোমায় আমি সে রকম জায়গায় পর হয়েই থাকতে বলি। উষা, ছেড়ে দিবি তো দে, নইলে—কিছুতেই তোকে প্রসাদপুরে নিয়ে যাব না।"

উষা জামা ধরিয়াই বলিল "আগে প্রতিজ্ঞা কর—"

"দূর তোর প্রতিজ্ঞা, ওই আসছে কে—দেখ—"

মুখ তুলিয়াই উষা দেখিল কাছে দাঁড়াইয়া মৃন্ময়! ঘোমটা টানিয়া গৃহের মধ্যে দৌড়াইয়া যাইতে সে রীতিমত একটা আছাড় খাইল। সতী গিয়া তাহাকে তুলিবার আগেই সে উঠিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

মৃন্ময় সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিয়া এক মুখ ধোঁয়া নাসা ও মুখপথে নির্গত করিয়া বলিল, "আস্ত একটী পাগল। আমার মতে একে গার্ডেনে রাখলেই মানায়,—লোকের পয়সা দেওয়া সার্থক হয়। গৃহস্থের ঘরে ও-রকম অদ্ভুত জীব কোন মতে মানায় না।"

সতী মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল, "তা বল না দাদা, বউদি ভারি সাদাসিদে মানুষ। অমন মেয়ে শিক্ষিতাদের মধ্যে থেকে একটা খুঁজে আনো দেখি। বেচারার মনটাও যেমন, বারটাও তেমনি।"

মনীশ মৃন্ময়ের হাত হইতে পাইপটা কাড়িয়া লইয়া নিজে বেশ স্বচ্ছন্দে ধূমপান করিতে করিতে বলিল, "তবু ভাল যে চিনেছ। মাঘমাসের সেই দিনটার কথা মনে কর দেখি—যে দিন নূতন বউটি এসে এইখানে দাঁড়িয়েছিল। তোমরাই না বেচারাকে দেখে হেসে লুটোপুটি খেয়েছিলে ?"

সতী বলিল, "সে আমি বুঝি!—রেখা না ?"

মনীশ তাহা মানিয়া লইল—"কিন্তু সত্যি বল তো সতী—তুমিও একটা অদ্ভুত জীব ঠাউরেছিলে কি না ?"

সতীর মুখখানা দেখিয়াই মৃন্ময় বুঝিয়া লইল সে অত্যন্ত চটিয়াছে। সে মনীশের হাতখানা ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল. "চল চল, ও-সব কথা তুলে আর মিথ্যে ঝগড়া বাধাতে হবে না। আমার ঘরে চল, দুদণ্ড গল্প করা যাবে'খন।"

মনীশ সতীর পানে একবার আড়চোখে চাহিয়া চুপি চুপি বলিল, "বাঃ, শিক্ষিতা মেয়েদের রাগটাই বা কি সুন্দর! পাছে মুখ দিয়ে বার হয়ে পড়ে' কোমলতা নষ্ট করে ফেলে, এই জন্যে কি কষ্ট স্বীকার! আর সেই কষ্ট স্বীকারের ফলে মুখখানা একেবারে লাল টকটকে হয়ে ওঠে। অশিক্ষিতা মেয়েগুলো রাগলে পরে চেঁচাবে, কাঁদবে—পাড়ার লোকগুলো পর্য্যন্ত জানতে পারবে সে রেগেছে। শিক্ষিতা মেয়ের রাগটুকুও যথার্থ প্রশংসার যোগ্য।"

সে এমন চুপে চুপে কথা বলিল যে, প্রত্যেকটাই সতীর কানে বেশ স্পষ্ট হইয়াই বাজিল।

সতী আর সেখানে দাঁড়াইল না, কোন মতে চোখের জল চাপিতে চাপিতে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল। নিজের গৃহে প্রবেশ করিয়া সে শুইয়া পড়িয়া নিঃশব্দে চোখের জল ফেলিতে লাগিল।

আচ্ছা—কেন? কেন মনীশ বার বার তাহার বুকটাকে এরূপ এক একটা আঘাত দিয়া ভাঙ্গিয়া দেয়? মনীশ জানে না, সতী তাহাকে কত ভালবাসে, তাহার মুখে একটা প্রশংসা পাইবার জন্য সে অক্লেশে সংসারের কাজ পর্য্যন্ত করিতেছে। তবু মনীশ—নিষ্ঠুর মনীশ তাহাকে বার বার শিক্ষিতা বলিয়া আঘাত দিয়া দূরে ফেলিতেছে।

সতী অনেকক্ষণ কাঁদিয়া শেষে আপনিই ঠাণ্ডা হইল। কান্না—ছি, কাঁদিবার জন্য জগতে তো আসা হয় নাই, সে কাঁদিবে কেন? ইহার চেয়ে বড় আঘাত পাইবার জন্য তো মনকে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে, এতে কাঁদিবার মত কি আছে?

কিন্তু—এখানে তো আর থাকা হয় না। মনীশ যেখানে আছে, সেখানে থাকা তাহার চলিবে না, তাহাকে দূরে যাইতে হইবে। দেবতার সহিত বাস করিবার মত চিত্তকে দৃঢ় করিবার ক্ষমতা তাহার আজও হয় নাই। তাহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, কোন দিন নিজেকে সে প্রকাশ করিয়া ফেলিতে পারে; যেহেতু মানুষের মনের কথা তো বলা যায় না। মনীশকে কিছুতেই সে জানিতে দিবে না। জানিতে না দিতে হইলে তাহার অন্য কোথাও যাওয়া দরকার।

অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া সতী একটা উপায় ঠিক করিয়া লইল।

সেই দিন বৈকালে উষা ও মনীশ ও মৃন্ময়ের প্রসাদপুরে যাইবার সময়। উষা বিদায়ের আগে তাহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "যাবে দিদি, চল না সেখানে, পাড়াগাঁটা বেশ দেখে আসবে'খন।"

সতী একটু হাসিয়া তাহার বাহুবেষ্টন হইতে কণ্ঠ ছাড়াইয়া বলিল, "তোমার দিদি তো আমায় যেতে বলেনি বউ দি।"

উষা বলিল "দিদির কি আর সময় আছে একটু, আমায় কদিন মোটে পত্রই দিতে পারে নি। বাড়ীতে ভারি মুস্কিল। ঠাকুর মা আর পেরে ওঠেন না, দিদির ঘাড়েই তো সব ভার।"

সতী বলিল "আমি একবার যাব বউ দি, কিন্তু এখন না, কিছুদিন পরে যাব। তোমার দিদিকে আমায় নিমন্ত্রণ করতে হবে না, আমি নিজেই যাব।"

তাহারা চলিয়া গেল, বাড়ীটাও যেন অন্ধকার হইয়া গেল। প্রফুল্লমুখী উষা বাড়ীটাকে সর্ব্বদা সচকিত করিয়া রাখিত, চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইত, কোনও সভ্যতার ধার সে বড় একটা ধারিত না। সতী এজন্য মাঝে মাঝে তাহাকে শাসন করিত; কিন্তু আজ সে বেশ বুঝিল, উষা না থাকিলে চলে না। তাহার সেই অস্থিরতাটাই বেশ সহিয়া গিয়াছে, সে দুষ্টামীটা না হইলে বাড়ীঘর-গুলাও যেন প্রাণহীন বলিয়া মনে হয়।

তাহার একান্ত আত্মীয় রেখাও এখানে ছিল না ; তাহার স্বামী ডেপুটী ছিলেন, তিনি রেখাকে মুঙ্গেরে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখান হইতে কয়েক খানি পত্র দিয়াছিল সতীকে সেখানে একবার যাইবার জন্য। সতী এত দিন সে দিকে অত মনযোগ দেয় নাই। শেষ পত্রখানা পাইয়া সে মাকে গিয়া বলিল, "আমি দিনকতক মুঙ্গেরে যাব মা ?"

মা বলিলেন "মুঙ্গেরে কি করতে যাবি ?"

সতী রেখার পত্র দেখাইয়া বলিল, "রেখা বার বার লিখছে যাবার জন্যে ; বাড়ীটা ত একেবারে ফাঁকা হয়ে গ্যাছে, এই সময়ে বেরুতে পারলে ভাল হয়। আমার আর এখানে থাকতে মোটে ইচ্ছে করছে না। আরও একটা কথা—"

কথাটা বলিতে সে একটু সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িতেছিল। মুখ খানা অন্যদিকে ফিরাইয়া বলিল, "আর, এখন একটা কাজের চেষ্টা করছি। এখানে কোন কাজকর্ম্ম নেই, পড়াও নেই,—চুপ করে বসে থাকা ভারি অসহ্য হয়ে উঠেছে। রেখাকে লিখেছিলুম, রেখা লিখেছে—ওখানকার গার্লস্ স্কুলের হেডমিষ্ট্রেস চলে যাবেন, এই সময়ে অ্যাপ্লাই করলে কাজটা পেতে পারি।"

মা বলিলেন "চাকরী করতে যাবি এখন তুই সতী ? তোর ঘরে অভাব কিসের আছে বল তো ? না, ও সব আমি হতে দেব না। এখন বিয়ে করে সংসার ধর্ম্ম করবি, না, চাকরী নিয়ে দেশে দেশে ঘুরবি।"

সতী একটুখানি নীরব থাকিয়া বলিল, "বিয়ে করব না মা।"

মা অতিরিক্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন. "বিয়ে করবি নে কি রকম ?"

সতী নীরবে দাঁড়াইয়া পদাঙ্গুলির পানে চাহিয়া রহিল।

বিরক্ত হইয়া মাতা বলিলেন, "এ নূতন ভাবটা পেলি কোথা সতী ? বেশী লেখাপড়া শিখলে বুঝি বিয়ে করতে হয় না ? তোরা বলিস পরাধীনতা

স্বীকার করা—কিন্তু আমি বলি এ কি পরাধীনতা? মেয়ের জন্ম স্বামীর গৃহে যাওয়া জন্য, স্বামীর কাজ করার জন্য। সেও তোকে দেবে, তুইও তাকে দিবি,—এই পরস্পরের আদান-প্রদান; একে পরাধীনতা বলে না। রেখাও তো তোর সঙ্গে পড়েছে,—সে তবে বিয়ে করলে কেন,—সে তবে স্বামীর কাছে গিয়ে বাস করছে কেন? বিয়ে করবি নে এ কথা বলিস নে সতী। জগতে কেউ বরাবর দৃঢ়তার উপরে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারে না,—কখন না কখনও তাকে ভেঙ্গে পড়তেই হবে। আমার কথা শুনে চল সতী! বিয়ে করব না বলে দৃঢ়পণ করে চলিস নে,—এর পর এর জন্যে তোকে আপ্‌শোষ করতে হবে।”

সতী উত্তর দিল না।

মাতা অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু সতী একটারও উত্তর দিল না। অত্যন্ত রাগ করিয়া মাতা বলিলেন, “আমার কথাই যখন শুনবি নে, তখন আমায় জিজ্ঞাসা করতে এসেছিস কেন? তোর যা খুসি তাই কর গিয়ে—আমায় কোন কথা বলিস নে। মৃন্ময় আসুক, তাকে, ওঁকে বলে তোর যেখানে খুসি তুই চলে যা, আমার সঙ্গে তোর সম্পর্ক নেই।”

অত্যন্ত রাগ করিয়াই তিনি সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

স্বামীকে গিয়া কন্যার এই কথাগুলি সব জানাইয়া বলিলেন, “দেখ, এখন তুমি যদি কোন রকমে মেয়ের বিয়ে দিতে পার। এই জন্যেই আমি মেয়েকে আগে লেখাপড়া শিখতে বারণ করেছিলুম। আমার কোন কথাই কোন দিন তুমি গ্রাহ্য কর না, তার ফল শেষকালে পাও। এখন সতীর এ আব্‌দার পূর্ণ করবে—বল করব?”

প্রসন্ন বাবু স্মিতমুখে বলিলেন, “তা, এটা কি এমন মন্দ কথা? সে লেখাপড়া শিখেছে, জোর করে এখন বিয়ে দেওয়া তো যাবে না। তার যখন ইচ্ছা হবে, যাকে খুসি বিয়ে করবে।”

মালতীদেবীর আপাদ মস্তক জ্বলিয়া গেল, তীব্র কণ্ঠে তিনি বলিলেন "এখন তা বলবে না কেন? জানছ; এখন তোমার কোন কথা সে গ্রাহ্যের মধ্যে আনবে না, কাজেই তার মতের ওপরে সব ছেড়ে দিচ্ছ। যাক, তোমাদের যা খুসি তাই কর, আমি তোমাদের কাউকেও আর কোনও কথা বলব না।"

নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া প্রসন্নবাবু সিগারেট টানিতে লাগিলেন ও সামনের বইখানা খুলিয়া পাতা উল্টাইতে লাগিলেন।

২০

উমার স্কন্ধে সংসারের সব ভার পড়িয়াছিল, তাহার এক মুহূর্ত্ত নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ ছিল না। উষা আসিয়া তাহার হাতের কাজ অনেকটা লইল, উমা একটু বাঁচিল।

সপ্তমী পূজার দিন উষা আসিয়া পৌছিয়াছিল, সমস্ত দিন মৃন্ময় বা মনীশের সহিত কথা বলিবার অবকাশ উমার হয় নাই। রাত্রে আরতি ভোগ শেষ হইয়া গেলে, শ্রান্ত দেহে উমা ঠাকুরবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিল।

মৃন্ময় বা মনীশ কেহই আরতি দেখিতে যায় নাই, তাহারা জ্যোৎস্নালোকিত ছাদে বসিয়া বেশ গল্প আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। উষা ফিরিয়া আসিয়া বগলাদেবীর নিকট ছুটিল। উমা কাপড় ছাড়িয়া উপরে যাইতেই তাহার দৃষ্টি পড়িল মনীশ ও মৃন্ময়ের উপর।

"বেশ লোক তো তুমি উমা, সকালে এসেছি আমরা, সারাদিন এক-বার দেখা করারও অবকাশ হ'ল না তোমার ?"

মৃন্ময় মৃদু হাসিয়া বলিল "আমাদের তো উনি চান নি মনীশ, উনি চেয়েছিলেন ওঁর বোনকে। তা যখন পেয়েছেন, আমাদের আর কি দরকার ?"

সঙ্কুচিতা হইয়া উমা বলিল "না, তা নয়। দেখছ তো মনীশদা, সংসারের কত কাজ। এই তিনটে দিন বাবা তাঁর জমীদারীর ছোট বড় সবাইকে খাওয়ান। যদিও অন্য লোকে রাঁধে, তাও আমায় দেখতে হয় সব। তাদের খাওয়াতেই তো সন্ধ্যে হয়ে গেল। তার পর আরতি, ভোগ, এ সব বন্দোবস্ত করা—"

মনীশ বলিল "এখন ছুটি হয়েছে তো ?"

উমা বলিল "হ্যাঁ, তবুও এখনো কাজ আছে। বাবাকে খাওয়াতে হবে, ঠাকুরমাকে খাইয়ে শুইয়ে দিতে হবে।"

মনীশ হাসিয়া উঠিয়া বলিল "শুইয়ে দিতে হবে ?"

উমা নীরবে হাসিয়া বলিল "তা নয় তো কি ? তাঁকে সব করিয়ে দিতে হয়, তবে তিনি করেন। তোমরা আরতি দেখতে যাও নি কেন ? আমি চারিদিকে তাকিয়ে দেখলুম, তোমাদের কাউকেই দেখতে পেলুম না।"

মনীশ মৃন্ময়ের গায়ে একটা ঠেলা দিয়া বলিল "এই ভদ্রলোকের জন্যে আমি যেতে পারি নি। ও সব পৌত্তলিক পূজা ভদ্রলোকের চোখে শূল বিঁধিয়ে দেয় যে, তা বুঝি জানো না। ভদ্রলোক চোখ বুজে নিরাকারকে ধারণা করেন মনের মধ্যে, আকারবিশিষ্ট কিছু মানতেও চান না, দেখতেও না,—ওতে না কি মনের অধোগতি হয়।"

উমা মৃদু হাসিয়া বলিল, "আর বাজনা শাঁখ ঘণ্টার শব্দে মাথার মধ্যে যে সূক্ষ্ম শিরাটা আছে, তা ছিঁড়ে যাবে।"

মৃন্ময় ভারি ব্যস্ত হইয়া পড়িল, "না, সে কোনও কথা নয়, তবে—"

উমা শান্ত কণ্ঠে বলিল "তবে কি ভাই ? ভগবতী আদ্যাশক্তির অসীম রূপ সামনে বিকাশ হচ্ছে দেখলে চিত্তের অধোগতি হয়, না উর্দ্ধগতি হয় ? এ তো তুমি ভোগের মূর্ত্তিতে দেখতে পাবে না, এ যে ত্যাগের আদর্শ মাতৃমূর্ত্তি। নারী স্ত্রী, আবার নারীই যে মা। মাতৃমূর্ত্তি সামনে দেখলে হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠে, চিন্তা উর্দ্ধদিকেই উঠে, নিম্নগামী হয় না, হতে পারে না।"

মৃন্ময় বলিল "সে আমি মানছি। মা বলে দেখতে পারি, কিন্তু দেবতা রূপে দেখতে পারি নে। দেবতা আছেন তা আমি মানছি, কিন্তু দেবতা

যে ওই পুতুলের মধ্যেই নির্দ্দিষ্টরূপে বাস করছেন, তা আমি মানতে রাজি নাই। দেবতা আছেন জগতের প্রত্যেক বস্তুতে, প্রত্যেক জীবে,—সব হতে গুটিয়ে দেবতাকে একটা মাটীর পুতুলের মধ্যে জড় করবার চেষ্টা একটা মস্ত বড় ভুল ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই ভুলের পথ ধরে যারা চলেছে তারাও ভ্রান্ত।"

উমা স্থির কণ্ঠে বলিল, "তারা ভ্রান্ত না যারা কাটিয়ে দিতে চায় তারা ভ্রান্ত। আমরা ত জানি, জগতের মধ্যেই ভগবান আছেন, সব জিনিসের মধ্যেই তিনি,—কিন্তু তাতে আমাদের প্রবল পিপাসা নিবৃত্ত হতে পার্‌ছে কই? আমাদের মন এত উন্নত নয় যে, খপ করে মূলটাকেই ধরে বসব। আমরা তাই মনের সব ভাবটা দিয়ে একটা প্রথম গঠন করি—সেটী এই মাটীর পুতুল। একে দেখতে দেখতে আমরা বিভোর হয়ে যাই, এর পূজা করে, একে ভালবেসে আমাদের প্রাণে শান্তি আসে, আমাদের অভাব কতকটা পূর্ণ হয়ে উঠে। সকল জিনিসের মধ্যে যখন ভগবান বিরাজ কর্‌ছেন, তখন মাটীর পুতুলের মধ্যেই বা তিনি বাস করবেন না কেন? এটা তো বিশেষ কিছু অসম্ভব নয়। এই একটায় ভালবাসা ঢেলে আমরা যে তৃপ্তি, যে শান্তি লাভ করি, জগতের বুকে তা বিলিয়ে দিয়ে নিজের জীবন সার্থকও তো করতে পারি।"

ধর্ম্ম সম্বন্ধে মৃন্ময়ের অভিজ্ঞতা বড় বেশী ছিল না, সে তাই আর জবাব দিল না। মনীশ তাহার হাতে একটা চাপ দিয়া বলিল, "উপরের বিদ্যেগুলো যেমন আয়ত্তে এনেছ মৃন্ময়, দুঃখের কথা, ভেতরেরটাকে তেমন আয়ত্তে আনতে পারনি! একটী মহিলার কাছে কথায় পারলে না, এই তোমার বিদ্যা। তোমায় দুদিনে খাঁটি হিন্দু করা যেত যদি উষা উমার মতই শিক্ষালাভ করত। তোমার সঙ্গে তর্ক করে তাহলে সে তোমায়

হারিয়ে দিত। কিন্তু সে শিখেছে খালি হাসতে আর দৌড়াতে, আর কোনও কাজে যদি আসে।”

উমা অপ্রস্তুত ভাবে বলিল, “না, আমি তো তর্ক করিনে। সত্যি আমি বেশী কিছু জানিনে, আমার শিক্ষা ভারি কম। তবে মৃন্ময় যে আমার দেবী মাকে মাটীর পুতুল বলে উড়িয়ে দিতে চায়, এতে আমার ভারি দুঃখ হয়েছিল। আমরা জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখে আসছি মাতৃপূজা। মায়ের কথা মনে করতে আমাদের বুকটা আনন্দে ভরে ওঠে। আমাদের মনে যখন কষ্ট হয়,—আমরা মাকে ডাকি,—মায়ের রূপটা মনে করে আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠি। উপাদান যাই হোক না কেন, আমরা উপাদান খুঁজিনে,—উপাদান দেখ্‌তে গেলে মাকে দেখা হয় কই। আমরা দেখি শুধু মাকে,—আমাদের একটা বছরের বেদনা যাতনা মায়ের চরণতলে অর্ঘ্য সাজিয়ে দিয়ে পড়ে থাকি। তাতে এমন তৃপ্তি—এমন শান্তি,—আঃ, সে রকম আর কিছুতেই নেই। আমি আর কিছু বলব না মৃন্ময়! এ মাটীর পুতুল না ভেবে একবার মা বলে ডেকো,—দেখো; প্রাণটা কি রকম শান্তিতে ভরে যাবে।”

মনীশ বলিল, “আমি বলি শোন, ব্যাপারখানা যা, তা আমিই ঠিক করে বলছি। মৃন্ময় দুই নৌকায় পা দিয়েছে,—না পারছে এটায় উঠতে, না পারছে ওটায় উঠতে। তার মা তোমারই মত আস্তিক হিন্দু। মায়ের কাছ হতে যে সংস্কার দোষগুলো পেয়েছে, তা কাটাতে পারে নি। আবার বাপ হচ্ছেন একেবারে নাস্তিক; অর্থাৎ তাঁর কথাগুলো এই মাত্র ফুটেছে—পুতুল পূজো মানা যায় না। তাঁরা দুজনে পরস্পরের মনটাকে ঠিক দাঁড় করিয়েই রেখেছেন। ভগবানের নাম কেউ কারও কাছে করেন না, সে বরং হয়েছে ভাল,—দুটো পৃথক শক্তি দুদিকে জাগছে, কিন্তু এই দুটো শক্তি উপভোগ করছে যে,—তারই হয়েছে

মুস্কিল। সে না এদিক, না ওদিক, কোন দিকেই যেতে পারছে না। একেবারে বলতেও পারছে না ভগবান এতে আছেন,—একেবারে বলতেও পারছে না ভগবান নেই।”

উমা বলিল “ভারি খারাপ এটা,—এতে কিছুই লাভ হয় না,—উপরন্তু ক্ষতিই হয়ে যায়। মনের মধ্যে দুটো ভাব রাখতে নেই,—একটা যাতে হয় তারই চেষ্টা করা ভাল। হয় তুমি একেবারেই আস্তিক হিন্দু হও, নয় একেবারেই নাস্তিক হও,—ভগবানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত মেনো না। এ রকম লোকদের ভগবান দয়া করেন। কিন্তু মাঝখানে যারা থাকে—একবার বলে আছে, একবার বলে নেই,—এ রকম লোককে ভগবান কখনই দয়া করেন না।

মৃন্ময় হাসিয়া বলিল “নরক বলে যদি কোনও জিনিস থাকে, তবে সেটা আমার জন্যে ঠিক করে রাখুন। আসল কথা কি জানেন, আমি ভগবানকেই মানতে চাইনে। ভগবান যে আছে, সে আমি বিশ্বাস করতে চাইনে।”

মনীশ বলিল “আর বিদ্যার পরিচয় দিয়ো না, যথেষ্ট হয়েছে। তুমি মুখে কখনও বলবে আছে, কখনও বলবে নেই, এতেই জানা যাচ্ছে, ‘দু’ নৌকায় পা দিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছ।”

উমা বলিল, “তোমার উচিত ছিল মনীশদা, বন্ধুকে একটা কোন নৌকায় উঠিয়ে ঠিক করে বসিয়ে দেওয়া। বন্ধুর শুভাশুভ বন্ধুর উপরে নির্ভর করে তা তো জানো।”

মনীশ বলিল, “জেনে করব কি? ওর জন্যে আমি তো মরতে পারিনে। হাতখানা বাড়িয়ে দিলুম—ধর, একটা নৌকায় ওঠ,—তা বেচারা মোটেই ধরতে পারলে না।”

উমা বলিল “আবার দেওয়া উচিত।”

মনীশ বলিল, "তুমি যদি হতে উমা, তা হলে একবারের চেষ্টাতেই উঠিয়ে দিতে পারতে।"

উমা বলিল "বোনের সাহায্যের দরকার বোধ হয় যদি, বোন নিশ্চয়ই ভাইকে সাহায্য করবে মনীশদা। বোন তো সংসারে ভাইয়ের উপকার করবার জন্যে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে, কিন্তু ভাই যে সাহায্য নিতে চায় না,—সে যে সে সাহায্য ঠেলে ফেলে দেয়। নিজেকে সে খুব গর্ব্বান্বিত মনে ভাবে কি না, কারণ সে পুরুষ ; বোন যে মেয়ে, তার সাহায্য তাকে আর কতদূর উন্নত করতে পারে, তাই সে বোনের দিকে ফিরেও চায় না।"

"উমা—"

"বাবা ডাকছেন—" বলিয়া উমা ত্রস্তপদে চলিয়া গেল।

মৃন্ময় একটু হাসিয়া বলিল "কি অন্ধ বিশ্বাস!"

মনীশ বলিল, "কিন্তু ওতেই মুক্তি পাওয়া যায়। আমাদের মত আলো আলো করে লাফিয়ে বেড়ায় না,—শেষে আলোর কাছে গিয়ে পুড়েও মরে না।"

মৃন্ময় পকেট হইতে সিগারেটকেশ বাহির করিয়া একটা নিজে লইল, একটা মনীশের হাতে দিল। সিগারেট ধরাইয়া টানিতে টানিতে বলিল, "ও রকম বিশ্বাসটা মেয়েদেরই সাজে—আমাদের নয়। মেয়েগুলো হাজার লেখাপড়া শিখুক, তবু তাকে নুইয়ে পড়তেই হবে। এই সতীটা—এতখানি পড়লে, তবু দেখ গিয়ে তার মনটা কি রকম গোঁড়ামিতে ভরা। জীব মাত্রই তার চোখে নারায়ণ। মাঝে মাঝে ব্রহ্মতত্ত্ব, জ্ঞানযোগ, এ সব বই প্রায়ই তার হাতে দেখতে পাবে, আবার তার উপাসনাও তেমনি। লেখাপড়াই শিখুক, আর যাই করুক, দার্ঢ্যতা তাদের মধ্যে একটুও নেই। নইলে চোখ বেয়ে এত জল পড়ে! আমাদের কথা আলাদা,—চোখে জল আসা তো দূরে থাক,—নিঃশ্বাসটাও পড়ে ভারি কম।"

মনীশ গম্ভীর হইয়া বলিল, একটা কথা আছে। প্রাণের মধ্যে একটা বড় গোছের অভাব অনুভব হলেই আমাদের মনটা স্বভাবতঃ ভগবানের দিকে ফিরে যায়, নইলে কখনই ফেরে না। সুখ বলতে আমরা বুঝি সংসার সুখ। যা চাচ্ছি, তাই যখন পাচ্ছি, তখন ভগবান যে কোথায় আছেন, কে তার খোঁজ নিতে যাবে। তোমার অভাব নেই—তাই তুমি জোর করে প্রতিপন্ন করছ ভগবান নেই, স্বর্গ নেই, নরক নেই,—ও সব কল্পিত কথা মাত্র। কিন্তু—যদি কখনও অভাব বুঝতে পার, একটা বড় গোছের ধাক্কা যদি তোমার মনে লাগে—তখন বুঝবে, সত্যই সব আছে। একদিন যেটা শূন্য বলে উড়িয়ে দিচ্ছিলে,—একমাত্র তাতেই আছে পূর্ণতা। আর যেটা নিয়ে ভুলেছিলে, তাকে মনে হবে শুধু ছেলেখেলা।"

মৃন্ময় বলিল, "আচ্ছা, তুমি কি বলতে চাও—এই মেয়েটী খুব বেশী রকম অভাব বোধ করছে বলেই ভগবানকে চিনেছে? আমি বলি—এ কিছুই চেনেনি। তোমার আমার মধ্যে যা আছে, এর মধ্যেও তাই আছে। এ শুধু মুখস্থ দুটো ঈশ্বরের কথা বলে গেল।"

মনীশ হাত যোড় করিয়া বলিল "রক্ষা কর,—পরের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কোন কথা বলতে আমি একেবারে নারাজ। কার মনের মধ্যে কি কথা জাগছে, তা আমি জানবই বা কি করে? ভগবান আমায় কিছু লোকের মনের গোপন কথা জানবার জন্যে ভবিষ্যদ্বক্তা করে পাঠাননি।"

মৃন্ময়ের হাতের সিগারেটটা পুড়িয়া গিয়াছিল। আর একটা সিগারেট ধরাইয়া একটা টান দিয়া সন্দিগ্ধ ভাবে মাথা দুলাইয়া বলিল "নাঃ, এটা নেহাৎ বাইরের বাধ্যতামূলক শিক্ষা,—অন্তরের জ্ঞান নয়। কখনই নয়।"

আহারাদির পরে মনীশ নিজের জন্য নির্দ্দিষ্ট গৃহটীতে গিয়া বসিল।

রাত্রি তখন এগারটা বাজিয়া গিয়াছে,—মিনিটের কাঁটা পঁচিশ মিনিট ছাড়াইয়াছে। টেবিলের উপর বড় ল্যাম্প জ্বলিতেছিল, তাহার আলোতে সমস্ত গৃহখানা উজ্জ্বল।

মনীশ চেয়ারের উপর বসিয়া টেবিলের উপর দুই কনুই রাখিয়া দুই করতলের মধ্যে মুখখানা রাখিয়া কি ভাবিতেছিল।

"মনীশদা—"

চকিতে মনীশ মাথা উঠাইয়া দেখিল, দরজার উপর দাঁড়াইয়া উমা। সপ্তমীর চাঁদ তখন অস্তে ঢলিয়া পড়িয়াছে, তাহার আলোক-রেখা অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া দরজার উপর পড়িয়াছিল।

মনীশ তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল, "এত রাত্রে—তুমি—উমা ?"

উমা বলিল, "তুমি বস, আমি কয়েকটা খুব দরকারী কথা বলতে এসেছি মনীশদা। রাত হয়েছে তাতে কি ? তুমি আমার বড় ভাই যে, রাত হয়েছে বলে এ কথা বলতে আসব না, তবে বলব কখন ? শুনছি, একাদশীর দিন সকালেই তোমরা যাবে। আজ একটু ছুটি পেয়েছি। এ কয়দিন আর হয় তো ছুটিই পাব না,—কথাটা বলতেও পারব না।"

সে দরজার উপরেই বসিয়া পড়িল, "আচ্ছা মনীশদা, তুমি কলকাতা হতে পালিয়েছিলে কেন বল দেখি ? খুড়িমাকে বলে গেছলে, স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে। আমি জানি, তোমার সেটা মিথ্যে কথা।"

মনীশের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। এই ভয়েই সে আজ মৃন্ময়ের সঙ্গ ছাড়ে নাই। নচেৎ উমার সঙ্গে দেখা করা তাহার পক্ষে কিছু কঠিন ব্যাপার ছিল না। সে ভাবিতেছিল, এ কয়টা দিন উমার এমনি কাজের হাঙ্গামাতেই কাটিয়া যাইবে,—সে তাহাকে নির্জ্জনে কখনই পাইতে পারিবে না।

উমা তাহার বিশুষ্ক মুখখানার পানে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা, সত্যি

তুমি জেনে নিলে মনীশদা, আবার আমি বিয়ে করব? আমি কি তোমার সেই বোন, যে, ক্ষণিকের পার্থিব মোহে ভুলে যাব, আবার নিজেকে বন্ধ করে ফেলব? আমি মুক্ত—আঃ, এ কথাটা যখন ভাবি, তখন জানো কি মনীশদা, কি আনন্দে আমার বুকটা ভরে ওঠে? তোমারই বা কি আক্কেল মনীশদা, যে, কথাটা আমায় একবার জানালে না,—উল্টে তোমার বন্ধুটীকে পর্য্যন্ত ঠিক করে দিলে যে, তারই সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। তবে তোমার রাগটা—এ ভারি অন্যায় হয়েছিল মনীশদা—তুমি আমায় একটুও চিনতে পার নি। এখনও বোধ হয় তোমার সে ভুলটা মনে জেগে আছে? এখনও বোধ হয় ভাব তুমি,—বিয়ে করবার, সুখী হবার গোপন ইচ্ছাটা আমার মনের মধ্যে জেগে আছে?"

মনীশ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। একটু হাসিয়া বলিল, "পাগল তুমি উমা,—সত্যি আমি তা ভাবি নি, তা ভেবে পালাই নি।"

উমা বলিল, "তবে কি ভেবেছিলে তুমি?"

মনীশ চুপ করিয়া রহিল।

উমা বলিল "বলতে যদি তোমার অনিচ্ছা থাকে, তবে বোলো না, আমি শুনতে চাই নে। আমি এই শুধু বলতে চাই, তুমি আমায় যা ভেবেছিলে আমি তা নই। আমায় যা দেখছ আমি তাই, আমি তোমারই বোন মনীশদা, আর কেউ নই। তুমি যেমন ব্রহ্মচারী, আমিও তেমনি ব্রহ্মচারিণী। তোমার বোনকে তুমি অত মন্দ বলে কখনই ভাবতে পারবে না মনীশদা।"

তাহার কণ্ঠস্বরে বেদনা ঝরিয়া পড়িল,—তাহার দুইটী চোখ জলে পূর্ণ হইয়া আসিল,—সে চোখ ফিরাইয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। মনীশ দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া নিস্তব্ধে বসিয়া রহিল,—কোনও সান্ত্বনার বাণী তাহার মুখ দিয়া বাহির হইতেছিল না। তাহার বুকের মধ্যে

হৃৎপিণ্ডটা কে যেন দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিয়া সজোরে ঝাঁকানি দিতেছিল,—মেঘের মত গর্জ্জিয়া বলিতেছিল—হতভাগা—তুই বড় হতভাগা।

সে ব্রহ্মচারী? না, তাহা তো নয়। সেই পাপ বাসনা বক্ষে জাগিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য দূর হইয়া গিয়াছে। তাহার হৃদয় পাপের সহিত যুদ্ধ করিয়া পারিয়া উঠিতেছে না,—সে অন্তরে ক্ষত বিক্ষত হইতেছিল। এই কথা—এই পাপের একটী কথা যদি উমার কানে গিয়া পশে, সে কি বজ্রাহতের মতই চমকাইয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িবে না? তাহার নিষ্পাপ পবিত্র হৃদয় হইতে আদর্শ মনীশের উজ্জল মূর্ত্তিখানা নিমেষে মুছিয়া যাইবে, ঘৃণায় আর্ত্তকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিবে—"না, আর দেখিতে চাহি না, আর শুনিতে চাহি না। যথেষ্ট দেখিয়াছি—যথেষ্ট শুনিয়াছি।"

সে হতভাগা, বাস্তবিকই সে হতভাগা। সকলের সহিত সে যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিল—জয়ী হইল না প্রেমের সহিত যুদ্ধ করিয়া। এ প্রেম তো সে প্রেম নয়, যাহা একেবারে কামনারহিত, বাসনারহিত। এ যে প্রেম রূপে অন্ত্যজ ভালবাসা। এ ভালবাসা উর্দ্ধ দেশের নয়,—এ এই পৃথিবীর বক্ষ হইতেই উৎপন্ন, ইহার লয়ও পৃথিবীর বুকে। এই ভালবাসা প্রকাশ হইলে শুভ উৎপন্ন করিবে না, তাহাকে দেবতা প্রতিপন্ন করিবে না,—তাহাতে অশুভ উৎপন্ন করিবে, তাহাকে পিশাচ প্রতিপন্ন করিবে।

উমা অনেকক্ষণ পরে চোখ ফিরাইল। মনীশের ভাব দেখিয়া সে একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। মনীশদা একটাও কথা বলিল না, নীরবে এরূপে বসিয়া রহিল, ইহা যে মনীশদার মত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব!

উমা নিশ্চিতই বুঝিয়া লইল, তাহার কথা মনীশদার বিশ্বাস হয় নাই। মনীশদার মনে যে ধারণাটা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, তাহা উঠানো তাহার

পক্ষে সম্ভব নহে। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে ভাবিল, সংসারটাই এমনি। পিতার কথা মনে পড়িল—এখানে কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না।

তাহার নিঃশ্বাসের শব্দে সচকিত হইয়া মনীশ মুখ তুলিল। উমা বলিল, "আচ্ছা, না হয় তাই মেনে নাও মনীশদা, ধরে নাও, আমি আবার সংসারীই হব। যে বিশ্বাস মনে এঁকে গিয়েছ ঠিক করে—ধরে নাও সে সত্যি। আমি সে সম্বন্ধে আর কোনও কথা বলতে চাই নে। ঊষা আর আমার সম্বন্ধে একটা কথা বলতে চাই তোমায়, সেটা বেশ শুনবে তো ?"

মনীশ শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "অন্যায় কথা তোমার উমা, কোন কথা না শুনি তোমার বল। আজ তুমি যে উল্টো চাপ দিচ্ছ আমায়।"

উমা গম্ভীর মুখে বলিল "বাধ্য হয়ে দিতে হয় মনীশদা। এখন শোন, বাবা একখানা উইল করেছেন, তাতে সব আমাকেই দিয়েছেন, ঊষাকে কিচ্ছু দেন নি।"

মনীশ শান্তভাবে বলিল, "সে কথা তিনি আজ বিকেলে আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে সব বলেছেন।"

উমা মলিন মুখে বলিল "তুমি কি বল মনীশদা ?"

মনীশ বলিল "আমি বলছি এ খুব ভাল কাজ হয়েছে।"

নৈরাশ্যপীড়িত কণ্ঠে উমা বলিল, "তুমিও বলছ ভাল ? ভাল হল কি করে মনীশদা ? বাপের সম্পত্তিতে আমার কোনও অধিকার থাকতে পারে না, ঊষাই সব পেতে পারবে। তিনি যে এটা করলেন—আমি বলছি মোটে ভাল হয় নি এ কাজটা। মৃন্ময় এতে রাগ করবে, ঊষাও মনে একটু ক্ষুণ্ণ হবে। না মনীশদা, তুমি বাবাকে বুঝিয়ে বল—ঊষাকেই সব দিতে। স্বধু দুটো খাওয়া আর পরা পেলেই আমার খুব হয়ে গেল। আমি ও সব জমীদারীর হাঙ্গামে যেতে চাইও নে,—কারণ, ও সব আমি বুঝিও না।"

মনীশ বলিল, "তিনি যা করেছেন, তা বেশ করে ভেবেই করেছেন। তোমার মত ছেলেমানুষ তিনি নন যে, না ভেবে চিন্তে একটা কাজ করে বসবেন। উপযুক্ত পাত্র বুঝেই তিনি বিষয়ের ব্যবস্থা করেছেন। তোমার সে জন্যে এত ভাবনা কেন? তিনি যত দিন বেঁচে থাকবেন, তত দিন কোন গোলই বাধবে না। তার পরে—সে যা হয় ভেবে দেখা যাবে। তোমার কথা শেষ হয়েছে উমা, যাও এবার তা হলে। সারাদিন খেটেছ, আবার কালও ভোরে তোমায় উঠতে হবে; রাত বারটা কখন বেজে গেছে।"

উমা উঠিল।

২১

উষার একটী সন্তান হইয়াছে শুনিয়া সতী কর্ম্মস্থল মুঙ্গের হইতে বাড়ী আসিল। রেখা তখনও সেখানে ছিল, 'উষার ছেলে' কথাটা শুনিয়া সেও আসিবার লোভ সামলাইতে পারিল না।

পদ্মফুলের মত শিশুটীকে বুকে তুলিয়া লইয়া, তাহার মুখখানা অজস্র স্নেহ-চুম্বনে ভরাইয়া দিয়া সতী বলিল, "বউদি, এবার সত্যিই তা হলে মা হলে ? নারীজন্ম এবার তা হলে সার্থক হয়ে গেল তোমার।"

উষা লজ্জিত ভাবে হাসিয়া মুখ ফিরাইল।

রেখা বলিল, "তুমি আর সে কথা বল না সতী। বুঝতে পারছ, নারীজন্মের সার্থকতা এই—তবু কেন যে—"

সতী হাসিয়া বলিল, "কি করব ভাই, অদৃষ্টে না থাকলে কেউ তো মা হতে পারে না। অদৃষ্টে না থাকলে বিয়েও হয় না, তাও তো দেখছ। বিয়ে জন্ম আর মৃত্যু—মা বলেন এই তিনটীই ভগবান নির্দ্দিষ্ট করে দেন। আমার দুটো ঠিক করা আছে—একটার ঘরেই মস্ত বড় একটা শূন্য বসানো। একটার সার্থকতা লাভ করেছি, অর্থাৎ জন্ম যে লাভ করেছি—এটা ঠিক। আর একটা হলেই হয়। সেইটার প্রতীক্ষায় বসে আছি,—ডাক আসবে যখন—চলে যাব।"

রেখা তাহাকে একটা ধাক্কা দিয়া বলিল, "এই বয়সেই এতটা উদাস ভাব ভাল লাগে না। সময় সব কাজেরই এক একটা আছে। নিয়ম ধরে পৃথিবীর বুকে সবই আসা যাওয়া করছে। অনিয়মে কিছু এলেই সেটা বড় খারাপ ঠেকে। তোমার এখন অতটা উদাসীন হতে যাওয়া কোন মতেই মানায় না সতী ; একবারে লয়ে দৃষ্টি—এ বড় সাংঘাতিক কথা।"

বৈকালে মনীশ আসিয়া সতীকে দেখিতে পাইল। হাতখানা কপালে ঠেকাইয়া সে সম্ভ্রমের ভাব দেখাইয়া বলিল, "নমস্কার হেড মিষ্ট্রেস মহোদয়া,—শরীর গতিক ভাল তো ?"

"যান, আপনার আর ঠাট্টা করতে হবে না" বলিয়া সতী তাহার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।

মনীশ বিস্ময়ের সুরে বলিল, "ইস, এতটা ভক্তি! কোন দিন না বোঝা বইতে পেরে মরে যাই। আশীর্ব্বাদ করা অবশ্যই উচিত। সুতরাং কি আশীর্ব্বাদ যে করব, সেটা আগে ঠিক করে নেই ; কারণ, সে কথাটা ভেবে আসিনি। আচ্ছা—আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি চির-এয়োস্ত্রী হও।"

রেখা পার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছিল, খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "আপনি দিন-চার মাথাটার চিকিৎসা করালে ভাল হয় মনীশবাবু, ডাক্তার বন্ধুর কাছে দেখাবেন একবার ?"

মনীশ মুখখানা নিরীহ ভাল মানুষের মত করিয়া বলিল, "কেন বলুন তো ?"

রেখা বলিল, "আপনি জানছেন সতী বিয়ে করেনি, তবু আশীর্ব্বাদ করলেন চির-এয়োস্ত্রী হও।"

মনীশ বলিল, "বিয়ে করেনি, বিয়ে করবে তো।"

রেখা বলিল, "কে বললে বিয়ে করবে ? বিয়ে যদি না করে—তবে আপনার আশীর্ব্বাদটাই তো মাঠে মারা গেল।"

মনীশ মুখখানা অত্যন্ত কুঞ্চিত করিয়া সতীর পানে তাকাইয়া বলিল, "তা বটে, একেবারেই মাঠে মারা যায়। কিন্তু বিয়ে করবে না কেন ?"

সতী রেখাকে ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল, "আঃ, কি কর রেখা, তোমার একটু কিছু জ্ঞান নেই। তা মনীশ বাবু, আপনার আশীর্ব্বাদ ঠিক হয়েছে—আমি বলছি। আমার বিয়ে লৌকিক না হলেও হয়েছে।"

সে চলিয়া গেল।

মনীশ এই মেয়েটীর ভাব কিছুই ধরিতে পারিল না। রেখা বলিল, "আমি আপনাকে সব বুঝিয়ে বলব মনীশ বাবু। একটু সন্ধ্যা হোক, আপনি পাশের বাগানটায় যাবেন, আমিও যাব'খন। এখন বলতে গেলে সে যদি কোনও রকমে শুনতে পায়, তা হলে আমায় আস্ত রাখবে না। আপনি যখন মৃন্ময়বাবুর বন্ধু, তখন সে কথা আপনাকে আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি; কারণ, আমি জানছি, যদি উপকার পাওয়া যায়, তবে তা আপনাকে দিয়েই পাওয়া যাবে।"

মনীশ মুখখানাকে অত্যন্ত বিষণ্ণ ভাবের করিয়া বলিল, "আমাকে দিয়ে উপকার পাবার আশা করছেন আপনি, আমি তো ভেবে ঠিক করতেই পারছিনে আপনি কি বলবেন। বেশ, আমি সন্ধ্যা বেলা যাব'খন আপনি তখন বলবেন সব কথা।"

সে মৃন্ময়ের সন্ধানে চলিয়া গেল।

রেখা অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেকগুলা কথা আনিয়া মনের মধ্যে বেশ করিয়া সাজাইয়া রাখিল। প্রথমে নরম নরম কথা, তাহার পর খুব শক্ত শক্ত কথা; তাহাতে যদি মনীশের চৈতন্য হয়।

সতীর গৃহে যাইতেই সতী তাহাকে চাপিয়া ধরিল, "কি বলছিলে তুমি এতক্ষণ মনীশবাবুকে,—নিশ্চয়ই আমার কথা।"

রেখা একেবারে আকাশ হইতে পড়িল, "বিলক্ষণ! তোমার কথা জানাতে আমার ভারি দায় পড়েছে। তুমি নিজেই যখন গোপনে থাকতে চাও, তখন তোমায় প্রকাশ করে দিয়ে আমার লাভটা কি?"

সতী স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বাঁচালে আমায়। আমায় যদি যথার্থ ভালবাস রেখা—তবে আমার দিব্য, আমার কথা কিছু যেন

মনীশ বাবু না শুনতে পান। আমি যে তাঁকে ভালবাসি, এ কথা শুন্‌লে তিনি কি ভাববেন আমায়! না—ছিঃ।”

তাহার মুখখানা আরক্তিম হইয়া উঠিল।

রেখা হাসিয়া বলিল, “ভয় নেই গো, ভয় নেই, কিছু বলব না।”

সন্ধ্যার সময়ে সে কেমন করিয়া সকলের চোখ এড়াইয়া বাগানে গিয়া উপস্থিত হইল। মনীশ অনেক আগেই সেখানে গিয়াছিল,—সে তখন পাদচারণা করিয়া বেড়াইতেছিল।

রেখা বলিল, “এই যে আপনি এসেছেন মনীশ বাবু,—আপনার কথার বেশ ঠিক আছে। এই বেঞ্চটায় বসুন।” সে এক পাশে বসিল, মনীশ বলিল, “আপনি বলুন, আমি শুনছি।”

রেখা বলিল, “দাঁড়িয়ে কি শুনবেন, বসুন না কেন?”

অগত্যা মনীশ একপাশে বসিয়া পড়িল, বলিল, “বলুন।”

প্রথমটা যে কি ভাবে কথাটা উত্থাপন করা যায়, রেখা তাহাই ভাবিতেছিল। মনীশ তাহার সে ভাবের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বলিল, “আমার দ্বারা সতীর যে কি উপকার হতে পারে,তা আমি কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারছিনে। আমি ত নিজেকে ব্যর্থ মানুষ বলেই ধরে রেখেছি।”

রেখা বলিল, “ব্যর্থতাও কখনও কখনও সার্থকতা লাভ করতে পারে মনীশ বাবু। সতী আমায় বিশ্বাস করে তার সব কথাই বলেছে—কোনও কথাই গোপন করেনি। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে, যেন এ কথা কাউকেই বলা না হয়।”

ব্যস্ত হইয়া মনীশ বলিল, “তবে আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা কোন মতে উচিত কাজ হচ্ছে না। একটী মেয়ের গুপ্ত কথা জানতে আমার প্রবৃত্তি নেই,—এ রকম কথা শোনা আমি ঘৃণাকর বলেই মনে করি। আমায় মাপ করবেন আপনি, আমি উঠলেম।”

রেখা যেন বিস্মিত হইয়া তাহার পানে তাকাইয়া রহিল ; যখন সত্যই দেখিল, মনীশ অভিবাদন জানাইয়া আস্তে আস্তে সরিয়া যাইতেছে, তখন সে ত্রস্তভাবে বলিয়া উঠিল, "বাঃ, আপনি যাচ্ছেন যে ? আমার কথাটা শুনবেন বলেছেন আপনি, নচেৎ এই সন্ধ্যাবেলা এরূপ নির্জ্জনে আমি কখনই একলা এমন ভাবে আপনার সঙ্গে দেখা করতুম না ! আর সেটা আমার মত মেয়ের পক্ষে যুক্তিযুক্তও নয়। আমি যখন এসেছি, তখন জোর করে আপনাকে সে কথাটা শুনতেই হবে। আপনার কথার ওপরে একজনের জীবন সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করছে,—আপনি তাতে এত উদাসীন থাকলে চলবে না। সে যে গোপনেই নিজের ব্যথা বয়ে যাবে, তা হবে না,—আপনাকে তা শুনতেই হবে, অনুভব করতেই হবে।"

বিস্মিত মনীশ তাহার মুখের পানে চাহিল, কোন কথা বলিতে পারিল না।

রেখা জোর করিয়া বলিল, "হাঁ, অবশ্যই আপনাকে শুনে যেতে হবে। আপনি এক জনকে আজীবন দুঃখের সাগরে ভাসিয়েছেন—অথচ তা আপনি জানবেন না—ভগবানের বিচারে এ হতে পারে না। যে যাকে সুখ দুঃখ দেবে, সে তাকে জানতে পারবেই—এই সংসারের নিয়ম। আপনি যে এই চিরন্তন নিয়ম উল্টে যাবেন জোর করে, তা কখনই হতে পারবে না। আমিই আপনার বন্ধু হয়ে আপনার এ ভুলটা সংশোধন করে দেব ! আপনি তাতে আমায় যদি শত্রু ভাবেন—তা ভাবতে পারেন,—আমার তাতে কোনই আপত্তি নেই।"

মনীশ দুইটী চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "আপনি এ সব কি কথা বলছেন,—আমি এর একটা কথাও বুঝতে পারছিনে।"

রেখা কঠোর কণ্ঠ কোমল করিয়া বলিল, "তা হলে জানতে হবে, আপনার প্রকৃত হৃদয় নেই। আপনার মধ্যে ভগবানের আসন কখনই

নেই—সেখানে বাস করছে শুধু শয়তান—যে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে মানুষকে শুধু দুঃখ দিয়ে নিপীড়িত করেই যায়। ভগবান থাকলে—যে আপনার দ্বারা দুঃখ পাচ্ছে—তার দুঃখ দূর করবার চেষ্টায় থাকতেন।"

মনীশ বলিল,"আমি বুঝতে পারছিনে, কাকে আমি ব্যথা দিয়েছি, কার কাছে আমায় অপরাধী রূপে দাঁড়াতে হবে। আমার হৃদয়ে শয়তানই থাক আর ভগবানই থাক, সে কথা আমি জানতে চাইনে, কাউকে জানাতেও চাইনে। আমি জানি, আমি সংসারের একটা ব্যর্থ বোঝা। আমার মধ্যে এমন কিছু নেই, যার দ্বারা কাউকে দুঃখ দেওয়া বা কাউকে সুখী করা যায়।"

রেখা দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "তা আছে। আপনি আপনাকে যা ভাবছেন, তা আপনি ন'ন। আপনার মধ্যে এমন কিছু আছে, যাতে কেউ না কেউ মুগ্ধ হয়ে যায়; কিন্তু আপনাকে পেতে সে পারে না,—মাঝখানে আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকে আপনার হৃদয়ের গর্ব্বগুলা। আপনি মনে ভাবেন, আমি অত্যন্ত বিনয় প্রকাশ করছি; কিন্তু ওইগুলো যে ঠিক গর্ব্ব রূপেই ফুটে বেরুচ্ছে, তা তো জানেন না।"

অধীর হইয়া মনীশ বলিল, "আপনার হেঁয়ালিভরা কথার অর্থ করা আমার পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠছে। আমায় সোজাসুজি বলে দিন, আমি কার দুঃখের কারণ হয়েছি।"

রেখা উত্তর দিল "সতীর।"

"সতীর!—" মনীশ বিস্ময় দমন করিতে পারিল না।

চকিতে তাহার মনে হইয়া গেল—হাঁ, ইহাও সম্ভব হইতে পারে,—অসম্ভব তো কিছুই নাই। চির-তপস্বিনী উমার সে অনুরক্ত হইল কেন? সে তো পুরুষ, হৃদয়ে তো তাহার দৃঢ়তার কিছুমাত্র অভাব নাই,—তবে কেন এরূপ হইল? সতী স্বভাবকোমলা স্ত্রীলোক,—তাহার হৃদয়ে এ অনুরাগ—ইহা তো অসম্ভব হইবার নয়।

সতীর এ পর্য্যন্ত সে যত কথা পাইয়াছে, সব গুলি মনে করিল। আজ যখন সে সতীকে আশীর্ব্বাদ করিল, কুমারী সতী তাহা হাস্যমুখে গ্রহণ করিল; ফিরাইয়া দিল না তো।

বুকের মধ্যে তাহার সহস্র বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা জ্বলিয়া উঠিল। তাহাকে পতিত করিবার এ কি বিশাল আয়োজন! না, ইহা কখনই হইবে না। সতীর সহিত মিলন,—ইহা কল্পনারও অযোগ্য। সে হৃদয় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। মনকে যখন কিছুতেই আয়ত্তে আনিতে পারে নাই, সে চিন্তা যখন কিছুতেই হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিতে সমর্থ হয় নাই—তখন সে নিজের মনের কাছে ধরা দিয়াছে। থাক, অশান্ত হৃদয় যাহা লইয়া শান্ত থাকিতে চায়, তাহা লইয়াই থাক, কিন্তু বাড়াবাড়ি আর যেন না করিতে পারে;—সে দিকে তাহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। সে হৃদয় তাহার নিজের নয়, সে হৃদয় পাইবার আকাঙ্ক্ষা অন্য নারী করিতে পারে না।

সতীর কথা ভাবিয়া সে বিলক্ষণ রুষ্টও হইয়া উঠিল। মেয়েরা এতই অসংযমী—ছিঃ!

কিন্তু না, সে নিজে কি? সে তো পুরুষ; সে তবে চিত্ত-সংযম করিতে কিছুতেই পারিতেছে না কেন? কে বলিবে—সতীও কি এই-রূপ করিতেছে না? হয় তো বালিকাকাল হইতেই সে হৃদয়ে এই অনুরাগ পোষণ করিয়া আসিতেছে,—কিন্তু তাহা তো সে এক দিনও ব্যক্ত করে নাই। সে যাহাই হোক, সতী নারী ব্যতীত আর কিছু নয়। নারী যতই দৃঢ়চিত্তা হোক, কোনও না কোনও এক সময়ে হয়তো সে দৃঢ়তা হারাইয়া ফেলে। রেখার কাছে সে তাহার হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছে—এই মাত্র তাহার অপরাধ। কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই তাহার দৃঢ়তা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে; নচেৎ সে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছে কেন?

কিন্তু হায়, স্বহস্তে নিজের প্রাণটা ছিঁড়িয়া অগ্নিতে দগ্ধ করা যে এ! সতী কি তাহার নারীবিদ্বেষ জানে না? জানিয়া শুনিয়া কেন সে এই নারী-দ্বেষীকে বরণ করিল,—কেন নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিল? হায় অন্ধা নারী, তোমার এ অন্ধ-ভালবাসা এখনও ফিরাইয়া লও। যদি এখনও এই মুহূর্ত্তে তোমার হৃদয়ে ও চিন্তা উঠিয়া থাকে—তুমি মনীশের সুখ-দুঃখভাগিনী, সহচারিণী হইবে—সে তোমার ভ্রম, একেবারেই ভ্রম।

মনীশ একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, রেখা তাহারই মুখের পানে চাহিয়া আছে।

একটু ক্ষীণ হাসি টানিয়া আনিয়া, মনেরও বাহিক বিষণ্ণতাটা দূর করিবার চেষ্টা করিয়া মনীশ বলিল, "আমি এ কথা শুনে হৃদয়ে যা আঘাত পেলুম, তা আর আপনাকে কি করে জানানো যায়? আমি কখনও আশা করিনি যে, বাস্তবিক এ রকমটা ঘটতে পারে, আমাকে দিয়ে কেউ ব্যথা পেতে পারে! আমি নিজেকে একেবারে সকলের বাইরে রেখেই আপনাদের সঙ্গে মিলেছি। আপনারা যে তাতে আমাকেই একেবারে চোর, প্রবঞ্চক বলে ধরে নিয়েছেন, এ কখনই উচিত নয়। আমি আশা করছি, আপনি সতীকে বেশ করে বুঝিয়ে বলবেন, যাতে সে আমার উপর থেকে তার এ আনুরক্তিটা ফিরিয়ে নেয়। আমার দুর্ভাগ্য, আমি তাকে কিছুই দিতে পারলুম না; কিন্তু তারটা যে তাকে আবার ফিরিয়ে দিতে পারছি, এইটুকু আমায় একটু সান্ত্বনা দেবে। ভগবান তাকে সুখী করুন, আমি এই প্রার্থনা করছি।"

রেখা হাসিল "অদ্ভুত আপনি—সে আমি বরাবরই জানি। আপনার কথাগুলো তার চেয়ে বেশী অদ্ভুত। ভালবাসা কাকে বলে তা আপনি কখনই জানেন না, তাই এ কথা বলতে পেরেছেন। আপনার সঙ্গে এ সব বিষয় নিয়ে কথা বলা আমার পক্ষে একেবারেই অনুচিত, সম্পূর্ণ

বিরুদ্ধ কাজ, তবুও আমায় বলতে হবে—কারণ, আমি সতীকে বোনের মতই ভালবাসি ; আর সে যে এ রকম হ'য়ে থাকবে, তা আমি মোটেই চাইনে। ভালবাসা যদি ফিরিয়ে নেওয়া যেত মনীশবাবু, তা হ'লে জগতে এত ব্যথা, এত চোখের জল থাকত না। আপনি যদি কাউকে ভালবাসতেন, তা' হলে বুঝতেন, ভালবাসাটা ফিরিয়ে নেওয়া যায় কি না! আপনার কথাগুলো অতি উচ্চাঙ্গের,—ওগুলো নাটক নভেলে ঠাঁই পেতে পারে,—আমাদের দৈনিক জীবনের মধ্যে আসতে পারে না, কোন ফল দিতেও সমর্থ হয় না। হতে পারে, আপনি পুরুষ, আপনার মনের ভাব আলাদা,—আপনি নিত্য ভালবাসা পরিবর্ত্তন করতে পারেন। কিন্তু মেয়েদের তা হয় না মনীশ বাবু। তারা যেটা একবার আঁকড়ে ধরে, সেটা আর ছাড়তে পারে না। তাদের মনও যেমন কোমল, ভালবাসাও তেমনি কোমল। আবার ছিঁড়তে গেলে তেমনিই শক্ত হয়ে ওঠে, যা মৃত্যু পর্য্যন্তও ছিঁড়তে ভয় পায়।"

মনীশের মুখে হতাশার হাসি ফুটিয়া তখনই মিলাইয়া গেল। সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আপনি তাকে বলবেন—"

রেখা অধীর ভাবে বলিল, "না, আমি তাকে একটা কথাও বলব না। আপনার যদি হৃদয় থাকে—আমি আপনাকে গোপনে বলে গেলুম,—আমার কর্ত্তব্যও শেষ হয়ে গেল। এখন আপনার যা খুসি আপনি করতে পারেন, বলতে পারেন তাকে।"

হাতের ঘড়ির পানে সে চাহিল। কাছেই একটা আলো জ্বলিতেছিল, তাহার আলোতে একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি আসি এখন, এখনি আমার খোঁজ পড়বে। আপনার যা কর্ত্তব্য আপনি বেছে নিন, আমি ছুটি পেয়ে গেলুম, নমস্কার।"

অভিবাদন করিয়া সে চলিয়া গেল।

অন্যায়—সম্পূর্ণ অন্যায় এ! মনীশকে ভালবাসিবার অধিকার কে সতীকে দিল? সতী কেন আপনা হারাইয়া তাহাকে ভালবাসিল,—কেন সাধ করিয়া দুঃখকে চির জীবনের জন্য বরণ করিয়া লইল?

সারাজীবনের জন্য? হাঁ, তা বই আর কি! মনীশ নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতেছে,—এই মেয়েগুলির সামনে স্পষ্টতঃই তাহাদের নিন্দা করিতেছে,—যেন ইহারা তাহাকে ঘৃণা করে, নারীদ্বেষী বলিয়াই ভাবে। ভাবেও তো তাই. কোন মেয়েই তো তাহাকে নিজের বলিয়া ভাবিতে ভালবাসিতে পারে নাই,—তাহার মধ্যে ভালবাসিবার মত, মুগ্ধ হইবার মত কিছুই তো তাহারা দেখিতে পায় নাই তবে সতী,—সে কেন মুগ্ধ হইল,—সে কেন এই নারীদ্বেষীকে ভালবাসার চোখে দেখিল?

সতীর সম্মুখে সুন্দর জগৎ,—ভবিষ্যৎ তাহার জন্য স্বামী, পুত্র, কন্যা, সোণার সংসার সাজাইয়া রাখিয়াছে,—সে মোহের বশে পড়িয়া কেন স্বেচ্ছায় সব হারাইবে?

এই গোপন উপাসিকার এ অর্ঘ্য নেওয়া মনীশের কখনই উচিত নয়—যখন সে করুণা-কটাক্ষে চাহিতে পারিবে। এ যেন তাহার অজ্ঞাতে আসিয়া পায়ের কাছে স্তূপীকৃত হইতে হইতে বুক পর্য্যন্ত ভরিয়া উঠিয়াছে, এখন তাহার সে দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। না, এ অর্ঘ্য যখন সে লইতে পারিবে না, তখন ভাল ভাবেই ফিরাইয়া দেওয়া উচিত,—পদাঘাতে ছড়াইয়া দেওয়া কোন মতে উচিত নয়।

মনীশ স্থির করিল, সে গোপনে সতীকে এক দিন সব কথা বলিয়া বুঝাইয়া দিবে,—নিজের হৃদয়ের গোপন কথাটি পর্য্যন্ত সে প্রকাশ করিবে,—ইহাতে সতী নিজের ভালমন্দ বুঝিয়া সাবধান হইবার সময় পাইবে।

২২

সতীর ছুটি ফুরাইয়া আসিল, সে কর্ম্মস্থলে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

সে দিন দুপুরে মনীশ ও আর কয়েকটী বন্ধুকে মৃন্ময়, নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। তাহাদের আহারাদি মিটিয়া গেলে, সতীকে মালতী দেবী আহার করাইয়া ছাড়িয়া দিলেন। রেখা ও উষা আগেই আহার করিয়া গিয়াছিল,—সতী এতক্ষণ কিছুতেই খায় নাই।

মৃন্ময় ডাকিল—"সতী, একটা কথা শুনে যাস।"

সতী যখন গেল, তখন বন্ধুরা কেহই ছিল না, শুধু মনীশ ও মৃন্ময় তর্কে প্রবৃত্ত ছিল। তাহাদের তর্কও ভারি অস্বাভাবিক গোছের ছিল,—মাঝখানে কেহ আসিয়া না দাঁড়াইলে কিছুতেই তাহার মীমাংসা হইত না।

সতী ঘরে প্রবেশ করিতেই মনীশ তর্ক ছাড়িয়া দিল, বলিল "আর আমি তর্ক করতে চাইনে। আমি স্বীকার করছি, তোমারই জিত হল।"

মৃন্ময় গর্ব্বের সহিত বলিল, "তা বললে হবে না মনীশ, তোমায় তর্ক করতেই হবে। অমনি ছেড়ে দিলে লোকে বলবে, আমি যেন জোর করেই জিতলুম। তর্ক করে জেতার যে গৌরব, তা থেকে যে বঞ্চিত করবে আমায়, তা আমি কর্‌তে দেব না। কর তর্ক, চুপ করে থাকলে হবে না।"

মনীশ একটু হাসিয়া বলিল, "তুমি যে দেখছি আচ্ছা লোক। তোমার সঙ্গে কথা বলাও ঝকমারি। গরীব বন্ধুটাকে কেন আর এমন করে নির্য্যাতন করছ বাপু? সতী, আমি তোমার সামনেই পরাজয় স্বীকার করছি, তোমার দাদাকে বল ওঁর তর্কের জালখানা গুটিয়ে নিতে।"

মৃন্ময় বলিল, "তা কখনই হবে না। সামনে আমার আদর্শকে দেখে ভয় পেয়ে গ্যাছ। তোমার আদর্শ যিনি, দেখ গিয়ে—তিনি এতক্ষণ ছেলেটিকে কাছে নিয়ে আচ্ছা করে ঘুম দিচ্ছেন। বুঝেছিস্ সতী—তর্ক আমাদের কি নিয়ে হচ্ছে জানিস? মেয়েদের বাল্য-বিবাহের বিপক্ষে আমি, আর মনীশ তার স্বপক্ষে—অর্থাৎ যেটা গোড়া হতে তার স্বভাব, যে যা বলবে ঠিক তার বিরুদ্ধাচরণ করা। বিশেষ তো আমি যা বলব তাই ওর গায়ে বিষের জ্বালা দেবে, আরও চেঁচিয়ে রসাতল কাণ্ড করবে। ভাগ্যে বাবা, কোর্টে গ্যাছেন, নইলে এই দুপুর বেলায় চেঁচামেচি শুনলে তাঁর মাথা গরম হয়ে যেত,—আর তখন বাতাস, ঠাণ্ডাজল নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে হত। যাই বল মনীশ, ছোট বেলায় মেয়েদের বিয়ে দেবার অনুমোদন আমি একটুও করতে পারি নে। বড় হোক, ইচ্ছা হয় বিয়ে করবে, না ইচ্ছা হয় বিয়ে করবে না,—ফুরিয়ে গেল। এতে তর্কই বা কি, আর রাগারাগিই বা কি।"

মনীশ শান্ত স্বরে বলিল, "তর্ক আমি করিনি মৃন্ময়, তর্ক করছ তুমি। আমি যা বলছি সেটা খাঁটি সত্য কথা। তুমি কি বলতে চাও—বিলাতই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা লাভ করেছে? অবশ্য তুমি বিলাতে বছর কতক বাস করে এসেছ—আমার চেয়ে অভিজ্ঞতা তোমারই বেশী;—কারণ, সেই দেশের মেয়েদের পরিচয় আমি প্রত্যক্ষভাবে পাই নি। তবে পরোক্ষভাবে যা পরিচয় পেয়েছি, তাতে জেনেছি, সেখানে—সেই উচ্চশিক্ষিতের দেশে বড় একটা কেউ আন্তরিক সুখী নয়। মেয়েদের যে সবার সঙ্গে মিশে শিক্ষার যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে, এতে তাদের এক দিক হতে সুখী করবার চেষ্টা করা হয়, আর এক দিক হতে অসুখীও করা হয়। তাদের চিত্তবৃত্তি যখন প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, তারা তখন একটা কাউকে কেন্দ্র করে বুকের সব ভালবাসাটা ঢেলে দেয় তার উপরে;

কিন্তু শেষে কি তার সঙ্গে তার বিয়ে হয়—যাতে সে সারাজীবন বাস্তবিক অনন্ত সুখের অধিকারিণী হতে পারে? আমার মনে হয়—জগতে অনেকেই এমনি লক্ষ্যহারা ভাবে ঘুরছে,—অভীপ্সিতকে অনেকেই পায়নি। বুকের মধ্যে ব্যর্থতার আগুন,—কিন্তু মুখে দেখ্‌বে বেশ তারা সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে যায়, কিন্তু তাদের বুকের মধ্যে জাগে কেবল হাহাকার।"

কথাটা বলিতে বলিতে মনীশ সতীর পানে চাহিয়া দেখিয়াছিল। সতীর মুখখানা মুহূর্ত্তে শবের মত মলিন হইয়া গেল, সে টেবিলটায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের পানে চাহিল।

মৃন্ময় বলিল, "সেটা শিক্ষার দোষ বলো না মনীশ,—সেটা মনের দোষ। মনের এ রকম জড়তার ভাব কাটাতে পারবে বলেই তো শিক্ষা দেওয়া, নচেৎ শিক্ষার কি প্রয়োজন ছিল? জগতে ভালবাসে অনেকেই অনেককে; কিন্তু ভালবেসে ব্যর্থতায় একেবারে মাটিতে লুটিয়ে পড়া এ শিক্ষিতার কাজ নয়। কারণ শিক্ষাই তাকে আবার উপরের দিকে ঠেলে তুলে দেবে। কি রে সতী, তুই যে এখনও দাঁড়িয়ে আছিস্? তোকে আর দরকার নেই, ওই পানের ডিবেটা এদিকে এগিয়ে দিয়ে যা দেখি। বলতে গেলে—ওইটে দেবার জন্যেই তোকে ডেকেছি।"

মনীশ হাসিয়া বলিল, "বল যে মীমাংসা করবার জন্যে। পানের ডিবে এগিয়ে দিতে—অমন নিছক মিথ্যে কথাটা বোলো না, পাপ হবে। নিজে পেরে উঠছিলে না, তাই বোনকে ডাকা হলো। জ্ঞানের ভাণ্ডার কি না—কিছু তর্কের শক্তি যদি দেয়।"

তাহার হাসিতে মৃন্ময় রাগিয়া উঠিল, বলিল "তা তো ঠিক কথাই। তোমার বোনের মত তো নয়, যে, একটা কথা যদি বললুম, অমনি দেখ, দেড়হাত ঘোম্‌টা টেনে দৌড়ে পালায়।"

সতী নিঃশব্দে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

বৈকালে সে খোকাকে কোলে লইয়া ত্রিতলের খোলা ছাদে বেড়াইতেছিল ; সেই সময় মনীশ আসিয়া পড়িল—দেখি খোকাকে।

অত্যন্ত সঙ্কুচিতা সতী খোকাকে মনীশের কোলে দিল।

মনীশ তাহাকে দুই চারিবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, দুইটা চুম্বন পুরস্কার দিয়া সতীর কোলে ফিরাইয়া দিল। সতী ভাবিয়াছিল, সে এখনি চলিয়া যাইবে ; কিন্তু মনীশ গেল না, রেলিংয়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া দূর আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

ফাল্গুনের শেষ, আকাশ বেশ পরিষ্কার, সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে, পশ্চিম গগনের লাল আভা ছুটিয়া আসিয়া ধরাবক্ষ লাল করিয়া তুলিয়াছে! মৃদু বাতাস বহিয়া টবের ফুলগাছগুলি দুলাইয়া গন্ধ ছড়াইয়া দিয়া যাইতেছিল।

দাসী আসিয়া খোকাকে চাহিল, তাহাকে দুধ খাওয়াইতে হইবে। সতী খোকাকে তাহার কোলে দিল।

পিছন ফিরিয়া দেখিল, মনীশ রেলিংয়ে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া তাহারই পানে চাহিয়া আছে। মুহূর্ত্তে সতীর মুখখানা আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে আস্তে আস্তে চলিয়া যাইতেছিল, মনীশ বাধা দিল, "একটা কথা আছে সতী।"

সতী থমকিয়া দাঁড়াইল, চকিত দৃষ্টি মনীশের উপর নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "বলুন কি কথা ?"

মনীশ বলিল, "তোমার এখন ওদিকে কোনও কাজ না থাকে তো আমি বলি।"

সতী বলিল "কোনও কাজ নেই।"

মনীশ আর একটু নিকটে সরিয়া আসিয়া, মৃদুকণ্ঠে বলিল, "সতী,

আমার দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য তা আমি বলতে পারি নে—আমি যা জানতে পেরেছি তাতে আমি ভারি অসুখী হয়েছি। আমি কখনও আশা করিনি সতী, যে তুমি আমায় এ চোখে দেখবে। এটা আমার পক্ষে অসম্ভাবিত পাওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি তো এ চাইনি সতী—"

সতী আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল, নীরবে সে নতচোখে মাটীর পানে চাহিয়া রহিল। তাহার বুকটা কাঁপিতেছিল, সে যেন চুরি করিয়া ধরা পড়িয়াছে।

মনীশ বলিল "লজ্জা কর না সতী, যখন আমাকে ভালবেসেছ, আমায় সর্ব্বস্ব দান করেছ, তখন লজ্জা করবার কোন কারণ নেই। তুমি আপনাকে গোপন করবার চেষ্টা করেছিলে, কিন্তু ভগবান তোমায় আমার কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন। ভালবাসা মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি, এ প্রত্যেক জীবের বুকেই আছে, এতে লজ্জা করবার কিছুই নেই। কিন্তু আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি, এই ভেবে সতী—তোমার একাগ্র প্রেম একেবারেই ব্যর্থ হয়, আমায় শুধু দিচ্ছ, কিন্তু কিছু পেলে না।"

সতী একবার চোখ তুলিয়া চাহিল, দেখিল, মনীশ জিজ্ঞাসু নেত্রে তাহার পানেই চাহিয়া আছে। মুখ নত করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমি কিছুই পেতে চাই নে।"

উদ্বেগভরা কণ্ঠে মনীশ বলিল, "কিছুই পেতে চাও না, শুধু দিয়ে যেতে চাও? আমি যতদিন কিছু না জেনেছিলুম সতী, যা দিয়েছিলে সবই আমার কাছেই ছিল। এখন জেনেছি, জেনে শুনে আমি কিছুই তো নিতে পারব না সতী, তোমার সব তোমাকেই ফিরিয়ে দিতে চাই যে।"

সতী সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া উজ্জ্বল চোখে মনীশের পানে চাহিল, ধীরকণ্ঠে বলিল "আপনি সবই জেনেছেন, আমার গোপন কথা আপনার

কাছে প্রকাশ হয়ে গ্যাছে, আর আমায় লুকিয়ে রাখা আমার মিথ্যা আয়োজন মাত্র। আপনি বলছেন সব ফিরিয়ে দেবেন,—কি ফিরিয়ে দেবেন আপনি? আপনার ফিরিয়ে দেবার তো কোনও অধিকার নেই। আমি যা দিয়েছি, তা আমি আর নেব না, নেবার ক্ষমতা আমার আর নেই।"

মনীশ ব্যথাভরা চোখে তাহার পানে চাহিল। হায় নারী, মিথ্যাকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইবার এ কি চেষ্টা তোমার? এ যে তাসের ঘর সাজানো, একটী ফুৎকারের জোরও যে ইহার সহে না। মিথ্যা ঘর সাজাইতেছ, সব ভাঙ্গিয়া যাইবে, সব উড়িয়া যাইবে।

মনীশ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কিন্তু আমার এ যে একেবারেই অসহ্য সতী,—আমি যে এ বইতে পারব না।"

সতী বলিল "কিসে আপনার অসহ্য হল? আপনি যেমন আগেও ছিলেন, তেমনি এখনও থাকবেন। কে কোথায় আপনার কথা ভাবছে, তা এত দিন যেমন ভাবেন নি, এখনও তেমনি ভাববেন না, তেমনি নির্ব্বিকার থাকবেন। আপনাকে কি বোঝা বইতে হবে মনীশ বাবু, আপনাকে কি জ্বালা সইতে হবে? সূর্য্য আকাশে ওঠে, প্রচুর কিরণ বর্ষণ করে, তার পর চলে যায়। কোথায় ক্ষুদ্র ফুল টি ফুটে তার পানে তাকিয়ে থাকে, সেদিকে সে তাকিয়েও দেখে না। আপনি কেন আমার দিকে তাকাবেন, আমার কথা ভাববেন? আপনি জগতে এসেছেন যা করতে, তাই করে যান। আমার কথা ভেবে নিজেকে একটুও ব্যথিত করবেন না, এই আমার প্রার্থনা। আমি যে বালিকা কাল হতে আপনাকে ভালবেসে এসেছি, এত দিন তা তো জানেন নি। রেখা নিশ্চয়ই আমার কথা আপনাকে বলেছে, তাই আপনি আমায় বুঝাতে এসেছেন।"

মনীশ তাহার পানে চাহিয়া রহিল। সে নিজে ভালবাসিয়াছে,—সে ভালবাসাও এমনি ব্যর্থতায় ভরা। তাই সে সতীর হৃদয়ের ব্যথা বুঝিল।

এই নারীর ভালবাসা লইয়া সে নিজেকে একটুও সুখী ভাবিতে পারিল না, দুঃখে তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিল।

মনীশ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল, "তোমার ভালবাসা স্বর্গীয়, একে ফিরিয়ে নিতে বলাই মূর্খের কাজ। আমি এই ভেবে কষ্ট পাচ্ছি সতী, তোমার স্বর্গীয় ভালবাসা যোগ্য পাত্রে ন্যস্ত হল না। এ ভালবাসা উর্ব্বর জায়গায় পড়েনি, পড়ল অনুর্ব্বর জায়গায়, যেখানে কিছুই ফল হল না। সতী, আমার কষ্টের কথা তোমায় বলছি, আমার সব কথা শুনলে তুমি আমায় ঘৃণাই করবে,—তোমার সেই ঘৃণাই আমার প্রার্থনীয়। আমি একজনকে ভালবাসি, তুমি যেমন সারা প্রাণমন ঢেলে দিয়ে আমায় ভালবাস সতী, আমিও তাকে তেমনি ভালবাসি। আমিও আমার মনকে ফিরাবার এত চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারি নি। যদি আমার নিজের বলে কিছু থাকত, তবে তা তোমায় দিয়ে—"

সতী শান্তকণ্ঠে বলিল, "না, আমি কিছু কোন দিন চাই নি, কখনও চাইব না। আমি বরাবর জানি, আপনি অন্যকে ভালবাসেন। সে যে কে, তাও জানি।"

"তাও জানো—সতী, তুমি তাও জানো ?"

আবেগে মনীশ সতীর হাতখানা চাপিয়া ধরিল, তখনি অপ্রস্তুত হইয়া সরিয়া গিয়া বলিল, "তুমি জানো—সে কে ?"

সতী একটু হাসিল, বলিল, "আপনি আমার কাছে কি লুকাবেন মনীশ বাবু,—আপনার গোপন কথা আমার কাছে গোপন নেই। আমি আপনার কথা শুনে বহুকাল আগেই জেনেছি, আপনি উমাকে ভালবাসেন।"

মনীশের মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল। সে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ঠিক কথা বলেছ সতী। তবে দেখছ, আমার বুকখানা কি রকম ব্যর্থতায় ভরা ? উমা যে কি, তা তুমি দেখেছ, তাকে চিনেছ ?

সতী উত্তর করিল, "হ্যাঁ, তাকে আমি দেখেছি, চিনেছি। সে পৃথিবীর মানুষ নয় মনীশ বাবু, সে স্বর্গের দেবী। যে তাকে দেখেছে, সেই তাকে ভালবেসেছে। আমিও যে তাকে আমার চেয়েও বেশী ভালবাসি মনীশবাবু!"

মনীশ বিষণ্ণ হাসিয়া বলিল, "সে কেবল তুমি আমায় নিঃস্বার্থ ভাবে ভালবাসতে পেরেছ বলে; যদি স্বার্থজড়িত ভালবাসা হত, তবে আমার ভালবাসার পাত্রীকে তুমি ঘৃণাই করতে সতী! তোমার ব্যর্থ ভালবাসা আমি উপলব্ধি করছি নিজের ব্যর্থ ভালবাসা দিয়ে। তবু এতে অনেক পার্থক্য আছে যে সতী। আমার ভালবাসার যে পাত্রী সে নিখুঁত, তার চরিত্রে, তার রূপে কেউ ত্রুটি বার করতে পারবে না। তোমার ভালবাসার যে পাত্র, তার যে অনেক ত্রুটি আছে। আমার মন যে অন্যাসক্ত, সে ছাড়া আর সব নারীকেই আমি ঘৃণা করি, এ জেনেও তুমি এমনি অটুট ভাবে আমায় ভালবাসবে?"

দৃঢ়কণ্ঠে সতী উত্তর দিল, "হ্যাঁ, এমনি অটুট ভাবে। মনীশ বাবু, আপনি আমার চোখে যে কি—তা আমি জানাতে চাইনে। আমি দেখছি, ভালবাসার বস্তুকে উপভোগ করলেই সব ফুরিয়ে যায়। আমি উপভোগ করতে চাইনে, ভক্ত যেমন দেবতাকে ভালবাসে, আমি তেমনি আপনাকে ভালবাসি। আপনাকে পাবার জন্যে আমি আপনাকে ভালবাসি নি। আপনার দেহের কামনা আমি রাখি নি। আমি চাই দেহের ভিতরে যে আছে তার সঙ্গে আমার প্রাণের সম্মিলন। এই যথার্থ বিবাহ, এই জগতে স্বর্গ। তাই আপনি যখন আবার আশীর্ব্বাদ করলেন—চির এয়োস্ত্রী হও, আমি সে আশীর্ব্বাদ মাথা পেতে নিলুম, কারণ, আমি জানছি, আমার বিয়ে হয়ে গ্যাছে, আমি কুমারী নই। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এই ভালবাসা আমার অটুট থাকে, আমি যেন দূরে থেকে আপনাকে পূজা করে যেতে পারি।"

মনীশের পায়ের কাছে সতী অবনত হইয়া পড়িল। তাহার পায়ের ধূলা মাথায় দিতে গিয়া, তাহার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িল।

মনীশ ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া ছিল,—তাহার দৃষ্টি তখন বড় উদাস। অনেক-ক্ষণ পরে চোখ নামাইয়া সে যখন সতীর উপর রাখিল, সতী তখন চোখ মুখ মুছিয়া বেশ শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে।

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে মনীশ বলিল, "এত ভালবাসা জীবনে কখনও অনুভব করিনি সতী, তাই ভাবছিলুম, ভগবানের রাজ্যে সত্যই কি এ রকম থাকে! আমি নিজেকে তোমায় দান করছি, সতী,—যদি আমায় স্বামীরূপে পেতে চাও, বল, আমার হাত ধর, চল, আমি তোমার বাপমায়ের কাছে এখনি এ প্রস্তাব কর্‌ছি।"

সে সতীর দিকে দুখানা হাত বাড়াইয়া দিল।

সতী সে হাত দুখানা দুই হাতে লইল, একবার নিজের ললাটের উপর, মাথার উপর রাখিল। তাহার পর ছাড়িয়া দিয়া অশ্রু সজল চোখে মৃদু হাসিয়া বলিল, "বড় অধিকার আমায় দিলে। আজ তোমায় আপনি বলব না, আজ তুমি আমার স্বামী। কিন্তু, মাপ কর দেবতা আমার, আমি তোমায় ভোগের বস্তু বলে জ্ঞান করতে পারব না। তুমি আমার স্বামী, বহু ঊর্দ্ধে তোমার আসন, তোমায় আমি আমার এত কাছে পেতে চাইনে। তুমি যে কামনা বাসনার অতীত, তুমি যে আমার চিরজীবনের বাঞ্ছিত। তুমি তফাতে থাক, আমি শুধু তোমার পূজা করে যাই।"

কঠিন হৃদয় মনীশেরও চোখ দুইটা মুহূর্ত্তের তরে সজল হইয়া উঠিল, "বড় দমন করতে পেরেছ সতী,—হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলে? আমি তোমার হাতে আমায় দিলুম, তুমি তা তেমনিই ফিরিয়ে দিলে। ভালবেসে তুমি পরাজিত হও নি, ভগবান তোমারই মাথায় যশের কিরীট পরিয়ে দিলেন, কারণ তুমি যথার্থ ত্যাগী, তুমিই বিজেতা।"

নীচে মৃন্ময় ভারি গণ্ডগোল করিতেছিল "কোথা গেল মনীশটা, খুঁজে খুঁজে হায়রাণ! আসুক সে রাস্কেল, আচ্ছা করে তার কান মলে দেব।"

মনীশ মুহূর্ত্তে আপনাকে সরস করিয়া লইল, রেলিং ধরিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাসিমুখে বলিল, "যাচ্ছে রাস্কেল, কানমলা তোমারও পাওনা আছে।"

সতীর পানে ফিরিয়া সরিয়া আসিয়া বলিল "যাই সতী?"

সতী রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "যাও, হয় তো এই জন্মের মত দেখা। আমি তোমার সামনে আর আসব না, কারণ ত্যাগের আদর্শ যদি বরাবরই না ঠিক রাখতে পারি। আজ তোমায় পেয়ে ছেড়ে দিলুম,—হয় তো এমন দিন আসবে, আমিই আবার তোমায় পাবার জন্যে লালায়িত হব। তুমিও মনে বুঝে দেখ, আমাদের দুজনের দেখা শুনা হওয়া আর কিছুতেই কর্ত্তব্য নয়। আমি কাল সকালে চলে যাব এখান হতে। যখন আবার আসব, তোমার সঙ্গে দেখা করব না। কিন্তু তবু—যদি কোনও দরকার পড়ে, আসবে তো?"

মনীশ বলিল, "আসব বই কি সতী!"

সতী বলিল "আর যদি তোমার কোনও দরকার পড়ে, বল আমায় ডাকবে? বল ডাকবে কি না?"

আর্দ্রকণ্ঠে মনীশ বলিল "ডাকব সতী, তখন তোমায় নিশ্চয়ই ডাকব।"

"তবে যাও তুমি—"

সতী সরিয়া গেল, মনীশ চলিয়া গেল।

তখন অন্ধকারে সারা আকাশপথ ছাইয়া গিয়াছে। নীচে রাজপথে আলো জ্বলিতেছে, তাহার জ্যোতিঃ অন্ধকার ভেদ্ করিয়া খানিকদূর পর্য্যন্ত উঠিতে সক্ষম হইয়াছে।

যেখানে মনীশ দাঁড়াইয়া ছিল, সতী সেইখানে লুটাইয়া পড়িল—সার্থক ওগো, তার শিক্ষা, তার ভালবাসা! সে নিজে সবই সার্থকতা লাভ করিয়াছে, কিছুই তাহার ব্যর্থ যায় নাই। তোমার হাতখানা সে ললাটে মুখে মাথায় দিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহার বেশী আকাঙ্ক্ষার জিনিস আর কি আছে? আজ সে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, আজ তাহার প্রাণ পূর্ণ, তাহার জগৎ আজ শূন্য নয়, পূর্ণ। সব পূর্ণ, শূন্যতা কোথাও নাই!

দুই বৎসর ধরিয়া নানা দেশে ঘুরিয়া উমা পিতা ও ঠাকুর মায়ের সহিত আবার প্রসাদপুরে ফিরিল।

তখন পূজা শেষ হইয়া গিয়াছে, ছেলেদের মধ্য হইতে পূজার গল্পও শেষ হইয়া গিয়াছে। মাঠে তখন ধান পাকিয়াছে, কৃষকেরা কাস্তে হাতে, কোমরে মলিন গামছা বাঁধিয়া ধান কাটিতে অগ্রসর হইয়াছে; তাহাদের মুখ আনন্দে দীপ্ত, চক্ষু উজ্জল।

শরতের আকাশ শুভ্র নির্ম্মল। তাহার তল দিয়া দলে দলে পাখীরা গান গাহিয়া উড়িয়া যায়। উমা মুক্ত ছাদে আসিয়া এই দৃশ্যটী প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইল। তাহার বুভুক্ষিত হৃদয়খানাও শান্ত হইয়া গেল। সে হৃদয়ের প্রচুর খাদ্যলাভ করিল। যদিও পূজা শেষ হইয়া গিয়াছে, তথাপি উমার মনে হইল, পূজা এখনও শেষ হয় নাই; জগজ্জননীর চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান; প্রকৃতি এখনও এক সুরে গান গাহিয়া তাঁহার বন্দনা করিতেছে।

পার্শ্বে-ই ভাগীরথী বহিয়া যাইতেছে। তাহার তরঙ্গবেগ মন্দ হইয়া আসিয়াছে, জলের মলিনত্ব কমিয়াছে।

উমা পিতার পানে ফিরিয়া গদ্গদকণ্ঠে বলিল, "বাবা, তুমি এত জায়গায় গিয়েছ, এত দেখেছ, কিন্তু বোধ হয় আমার মতই কোনও জায়গাকে পছন্দ করতে পার নি। এখানে বিশ্বের সৌন্দর্য্য সব যেন জেগে আছে, এখানেই বিশ্বের দেবতা রয়েছেন। বাবা, এখান হতে প্রণাম করলেই তো তাঁর পায়ে গিয়ে পৌঁছায়,—তবে তীর্থে যাওয়া কেন?"

অমরনাথ বলিলেন, "সে কথা ঠিকই মা। মনকে যেখানে নির্দ্দিষ্ট

করে দেখিয়ে দেবে, সে সেখানেই দেখবে। যথার্থ জ্ঞানী যাঁরা, তাঁরা মনের মধ্যেই ভগবানকে দেখতে পান। কোনও ভিন্ন জায়গা আছে—যেখানে ভগবান নির্দ্দিষ্ট হয়ে বাস করছেন—তা তাঁরা বলেন না। একটা কথাই তো আছে মা—মন মে চাঙ্গা তো কাঠ মে গঙ্গা। অবশ্য মুচি তার চামড়ার আধারের মধ্যে গঙ্গা পেয়েছিল—এ হচ্ছে কেবল বিশ্বাস আর ভক্তি মা; আর কিছু নয়। আমরা যে অত বিশ্বাসী হতে পারিনে উমা! বিশ্বাস করতে যাই; তার মধ্যে থেকে একটা কূট প্রশ্ন আসে—কেন! এই কেনটাই সব মাটি করে দেয়, আমাদের বিশ্বাস নষ্ট করে ফেলে। ভক্তি-বিশ্বাসের উপরেই ভগবানের আসন প্রতিষ্ঠিত। আমাদের তা নেই যে মা, তাই আমরা জোর করে সেই ভক্তি-বিশ্বাস আনবার জন্যেই পূজা, তীর্থ ভ্রমণ প্রভৃতি বাহ্যিক অনুষ্ঠান করি।"

উমা বলিল, "বাস্তবিক বাবা—তীর্থে গিয়ে আমি তো শান্তি পাইনি। আমার মনে হচ্ছিল, আমি কি যেন হারিয়ে ফেলেছি, কি যেন পেছনে ফেলে এসেছি। এই গ্রামের বুকে দাঁড়িয়েই আমার মনে হল, সব ফিরে পেলুম, আমার কিছু অভাব আর নেই।"

উমা আসিয়াছে, এ সংবাদ মুহূর্ত্ত মধ্যেই চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। উমাকে ভক্তি না করিত, ভাল না বাসিত, এমন লোক কেহই ছিল না। প্রাণপণে উমা জগতের মঙ্গল সাধন করিয়া যাইতেছিল, নিজের পানে চাহিতে সে একেবারেই ভুলিয়াছিল। গ্রামের সকলেই আসিয়া উমার সহিত দেখা করিল, কেহ আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল, কেহ আশীর্ব্বাদ লইয়া গেল।

বহু দিন পরে বিন্দু নিজের ছেলেটীকে কোলে লইয়া আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিল।

অনেক কাল তাহাকে উমা দেখিতে পায় নাই। আজ পায় [illegible]

বৎসর হইয়া গিয়াছে—বিন্দু এক দিন মাতাল স্বামীর হাতে প্রপীড়িত হইয়া তাহার নিকট হইতে শেষ দান লইয়া গিয়াছিল। তাহার পর হইতে সে আর আসে নাই। উমা খোঁজ লইয়া জানিয়াছিল, তাহার স্বামী তাহাকে ও তাহার পুত্রটীকে লইয়া কলিকাতায় কার্য্য করিতে গিয়াছে। এই দুঃখিনী রমণীর কথা ভাবিয়া উমা শান্তি পাইত না। আহা, কত না জানি সে নির্য্যাতন সহ্য করিতেছে! হয় তো না খাইতে পাইয়া পথে দাঁড়াইয়া ভিক্ষাও তাহাকে করিতে হইতেছে! উমা দু তিনবার তাহার খোঁজ করিয়াছিল, কিন্তু কোন সন্ধানই পায় নাই।

আজ বিন্দুকে দেখিয়া উমা বাস্তবিকই আনন্দিতা হইল, তাহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কোথা ছিলে এত দিন?"

বিন্দু যাহা বলিল তাহা এই—তাহার স্বামী তাহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়াছিল। উমার উপদেশে বিন্দু চলিয়াছিল, তাই সে হারা স্বামীকে ফিরিয়া পাইয়াছে। তাহার স্বামী বাস্তবিকই এখন সৎ হইয়াছে। সে নেশা করা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে, এবং সৎপথে থাকিয়া বেশ উপার্জ্জন করিতেছে। আজ তিন দিন হইল সে এখানে আসিয়াছে। আজ দিদিমণির কাছে আসিয়া একবার তাহার পায়ের ধূলা মাথায় না দিয়া, কাল প্রাতে কিছুতেই সে কলিকাতায় যাইতে পারিবে না।

বিন্দু ছেলেটীর মাথায় উমার পায়ের ধূলা দিল, নিজের মাথায় দিয়া চোখের জল ফেলিয়া বলিল, "আশীর্ব্বাদ কর দিদিমণি, যেন স্বামী-পুত্র রেখে মরতে পারি। যেন ওদের এমন সৎ দেখেই মরে যাই। তোমার আশীর্ব্বাদই আমার কাছে দেবতার কথা। তুমি বল দিদিমণি, তোমার কথাই সত্যি হবে।"

এই নির্ম্মল ভক্তি দেখিয়া বাস্তবিকই উমার হৃদয় দ্রব হইয়া গেল। তাহার চোখেও জল আসিয়া পড়িল, সে কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া একটু

হাসিয়া বলিল, "কি যে বল বিন্দু, তার কিছু ঠিক নেই। আমায় ভগবান বলে দিলেন, তাই আমি তোমায় বলেছিলুম। আমার আশীর্ব্বাদে কি হবে? ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, তোমার প্রার্থনা নিশ্চয়ই সফল হবে।"

বিন্দু ছাড়িল না—"ভগবানকে আগেও তো বলেছি দিদিমণি, তিনি তো আমায় একটা কথাও বলেন নি। তুমি যা বললে, তাই তো সত্যি হল। তুমিই আমার ভগবান দিদিমণি! তুমি আশীর্ব্বাদ কর, তোমার আশীর্ব্বাদেই ফল হবে, আর কিছুতেই নয়।"

আশীর্ব্বাদ লইয়া সে পুত্র লইয়া চলিয়া গেল।

নির্ম্মল আনন্দে কয় দিনই উমার হৃদয়খানা পূর্ণ হইয়া ছিল। সেই সময় উষার একখানা পত্র পাইয়া সে বিষণ্ণ ও গম্ভীর হইয়া উঠিল।

পিতার সেই উইলের কথা এত দিন উষা ও আর সকলের কাছেই গোপন ছিল। উমারও সে কথা মোটেই মনে ছিল না। আজ উষার পত্র পাইয়া তাহার মনে সে সকল কথা পুনরায় জাগিয়া উঠিল।

তাহাদের দীর্ঘ দুই বৎসর ব্যাপী ভ্রমণের কথা উষা লিখিয়াছে। ঠাকুর মায়ের যে সব তীর্থ-ই করা হইল, তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইল, সে কথাতেও সে খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে। সব শেষে লিখিয়াছে 'দিদি, শুনিলাম বাবা একখানা উইল করিয়াছেন, এবং তাহাতে তোমাকেই সমস্ত বিষয় সম্পত্তি দান করিয়াছেন। মনে ভাবিয়ো না, আমি নিজে হইতে কোনও কথা বলিতেছি,—তোমার ভগিনীপতির কথাই লিখিতেছি। তিনি শুনিয়া অনেক কথা বলিলেন, যাহা শুনিয়া আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেছি, এ উইলের কথা যেন মিথ্যাই হয়,— ইহার মূলে যেন সত্য না থাকে। যদি যথার্থই এ কথা সত্য হয়, তবে দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, আমার মুখ চাহিয়া বাবাকে নিবৃত্ত হইতে

বলিবে। তোমাদের নামে যে কেহ কোনও কথা বলিবে, ইহা আমার অসহ্য। দিদি, তোমরা আমায় যাই বল না, সবই আমার সহ্য হয়; কিন্তু এখানকার কোনও কথা আমার সহ্য হয় না। শ্বশুরবাড়ীর কেহ যদি বধূর বাপের বাড়ীর কাহারও নিন্দা করে, কোন বধূই তাহা সহ্য করিতে পারে না। যদিও আমি আজ বাড়ীর গৃহিণী—কারণ, তুমি হয় তো জান না—আমার শাশুড়ী আর এ জগতে নাই, কিছু দিন হইল তিনি মারা গিয়াছেন—এবং সন্তানের মা,—তথাপি দিদি, আমার পিত্রালয়ের চেয়ে প্রিয় কেহই নহে। আগে তোমাদের পাইয়াছি। আমার সংসার তোমাদেরই কৃপায়। তাই দিদি, তোমাদের কেহ কোন কথা বলিলে আমার বুকে বাজে বজ্রাঘাতের মতই। আমি তোমাদের যাহা খুসি তাহাই বলিতে পারি—কিন্তু ইহারা কোনও কথা বলিবে কেন? দিদি, ইহাদের এই নিন্দা করিবার সুযোগটুকু দিয়ো না! তোমায় কেহ যেন স্বার্থান্ধ না বলিতে পারে—আমি সেইটুকু কেবল চাই। তোমার পায়ে পড়ি—আমায় নিস্তার দাও,—আমার গর্ব্ব করিবার মত মুখটা রাখিয়া দাও। বাবাকে বলিয়ো—উহা কেবল বিষবৃক্ষের বীজই রোপণ করিবে,—ইহাতে যে বিষফল ফলিবে,—তাহা ভক্ষণে সকলেই মরিবে। যেমন করিয়া পারো বাবাকে নিরস্ত কর, তুমি তফাতে থাকো।"

পত্রখানি পড়িতে পড়িতে উমার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল,—তাহার কম্পিত হস্ত হইতে পত্রখানা পড়িয়া গেল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে কিছু ধারণাতেই আনিতে পারিল না—কিসে কি ঘটিয়া গেল, কেন এমন হইল?

নিজের বুদ্ধিতে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া—অমরনাথ যেখানে বাহিরের ঘরে বসিয়া জমীদারীর কাগজপত্র দেখিতেছিলেন, সেখানে দাসীকে পাঠাইয়া দিল,—শীঘ্র যেন তিনি একবার আসেন।

হাসিয়া বলিল, "কি যে বল বিন্দু, তার কিছু ঠিক নেই। আমায় ভগবান বলে দিলেন, তাই আমি তোমায় বলেছিলুম। আমার আশীর্ব্বাদে কি হবে? ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, তোমার প্রার্থনা নিশ্চয়ই সফল হবে।"

বিন্দু ছাড়িল না—"ভগবানকে আগেও তো বলেছি দিদিমণি, তিনি তো আমায় একটা কথাও বলেন নি। তুমি যা বললে, তাই তো সত্যি হল। তুমিই আমার ভগবান দিদিমণি! তুমি আশীর্ব্বাদ কর, তোমার আশীর্ব্বাদেই ফল হবে, আর কিছুতেই নয়।"

আশীর্ব্বাদ লইয়া সে পুত্র লইয়া চলিয়া গেল।

নির্ম্মল আনন্দে কয় দিনই উমার হৃদয়খানা পূর্ণ হইয়া ছিল। সেই সময় উষার একখানা পত্র পাইয়া সে বিষণ্ণ ও গম্ভীর হইয়া উঠিল।

পিতার সেই উইলের কথা এত দিন উষা ও আর সকলের কাছেই গোপন ছিল। উমারও সে কথা মোটেই মনে ছিল না। আজ উষার পত্র পাইয়া তাহার মনে সে সকল কথা পুনরায় জাগিয়া উঠিল।

তাহাদের দীর্ঘ দুই বৎসর ব্যাপী ভ্রমণের কথা উষা লিখিয়াছে। ঠাকুর মায়ের যে সব তীর্থ-ই করা হইল, তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইল, সে কথাতেও সে খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে। সব শেষে লিখিয়াছে 'দিদি, শুনিলাম বাবা একখানা উইল করিয়াছেন, এবং তাহাতে তোমাকেই সমস্ত বিষয় সম্পত্তি দান করিয়াছেন। মনে ভাবিয়ো না, আমি নিজে হইতে কোনও কথা বলিতেছি,—তোমার ভগিনীপতির কথাই লিখিতেছি। তিনি শুনিয়া অনেক কথা বলিলেন, যাহা শুনিয়া আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেছি, এ উইলের কথা যেন মিথ্যাই হয়,—ইহার মূলে যেন সত্য না থাকে। যদি যথার্থই এ কথা সত্য হয়, তবে দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, আমার মুখ চাহিয়া বাবাকে নিবৃত্ত হইতে

বলিবে। তোমাদের নামে যে কেহ কোনও কথা বলিবে, ইহা আমার অসহ্য। দিদি, তোমরা আমায় যাই বল না, সবই আমার সহ্য হয়; কিন্তু এখানকার কোনও কথা আমার সহ্য হয় না। শ্বশুরবাড়ীর কেহ যদি বধূর বাপের বাড়ীর কাহারও নিন্দা করে, কোন বধূই তাহা সহ্য করিতে পারে না। যদিও আমি আজ বাড়ীর গৃহিনী—কারণ, তুমি হয় তো জান না—আমার শাশুড়ী আর এ জগতে নাই, কিছু দিন হইল তিনি মারা গিয়াছেন—এবং সন্তানের মা,—তথাপি দিদি, আমার পিত্রালয়ের চেয়ে প্রিয় কেহই নহে। আগে তোমাদের পাইয়াছি। আমার সংসার তোমাদেরই কৃপায়। তাই দিদি, তোমাদের কেহ কোন কথা বলিলে আমার বুকে বাজে বজ্রাঘাতের মতই। আমি তোমাদের যাহা খুসি তাহাই বলিতে পারি—কিন্তু ইহারা কোনও কথা বলিবে কেন? দিদি, ইহাদের এই নিন্দা করিবার সুযোগটুকু দিয়ো না! তোমায় কেহ যেন স্বার্থান্ধ না বলিতে পারে—আমি সেইটুকু কেবল চাই। তোমার পায়ে পড়ি—আমায় নিস্তার দাও,—আমার গর্ব্ব করিবার মত মুখটা রাখিয়া দাও। বাবাকে বলিয়ো—উহা কেবল বিষবৃক্ষের বীজই রোপণ করিবে,—ইহাতে যে বিষফল ফলিবে,—তাহা ভক্ষণে সকলেই মরিবে। যেমন করিয়া পারো বাবাকে নিরস্ত কর, তুমি তফাতে থাকো।"

পত্রখানি পড়িতে পড়িতে উমার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল,—তাহার কম্পিত হস্ত হইতে পত্রখানা পড়িয়া গেল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে কিছু ধারণাতেই আনিতে পারিল না—কিসে কি ঘটিয়া গেল, কেন এমন হইল?

নিজের বুদ্ধিতে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া—অমরনাথ যেখানে বাহিরের ঘরে বসিয়া জমীদারীর কাগজপত্র দেখিতেছিলেন, সেখানে দাসীকে পাঠাইয়া দিল,—শীঘ্র যেন তিনি একবার আসেন।

দাসী যেরূপ ব্যস্ততার সঙ্গে গিয়া খবর দিল, তাহাতে অমরনাথ তাড়াতাড়ি কাগজপত্র ফেলিয়া রাখিয়া উমার কাছে আসিলেন। উমা বারাণ্ডায় দেয়ালে ঠেস দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল,—সামনে উষার খোলা পত্রখানা পড়িয়া ছিল।

"কি মা, কি হয়েছে ?"

ব্যগ্রতার সহিত অমরনাথ প্রশ্ন করিলেন। উমা কথা না কহিয়া পত্রখানা তুলিয়া তাঁহার হাতে দিল।

অমরনাথ পত্রখানা পড়িলেন। চক্ষু দুইটী শূন্যে রাখিয়া তিনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

উমা তাঁহার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, "আমি এখন কি করব বাবা ? আমায় তুমি একেবারেই সব হ'তে বঞ্চিতা করছ কেন ? আমি তোমার কাছে কি দোষ করেছি ?"

অমরনাথ শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "কি হ'তে তোমায় বঞ্চিতা করেছি উমা ? আমি যা করেছি, তা ভাল বলেই করেছি। এতে তোমার নিজেকে এতটা দুঃখী মনে করা উচিত নয়। বাপ মা যা করে, সে সন্তানের ভালর জন্যেই করে থাকে। সন্তানের মন্দ হোক, এ প্রার্থনা কেউ কি করে মা ? তুমি যে আমার মেয়ে! আমি তোমায় যা দিয়ে যাচ্ছি, এ তোমাকেই সাজে, আর কাউকেই সাজে না।"

উমা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "কেন সাজবে না বাবা ? সেও তো তোমার মেয়ে, সে তো জলে ভেসে আসেনি ?"

পিতা কন্যার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "সে সব কথা তো তোমায় আগেই বলেছি মা। তুমি বিধবা, তোমার যে কিছুর উপরেই দাবী নেই। তোমায় চিরকালই লোকের কাছে হাত পেতে থাকতে হবে উমা,—লোকের অনেক কথাও তোমায় সহ্য করতে

হবে। আমি বেঁচে থাকতে থাকতে তাই তোমার একটা উপায় করে দিয়ে গেলুম। তারা তোমায় স্বার্থান্ধা বলছে বলুক মা, তুমি তাদের কথা শুনো না। তাদের সব আছে, তোমার কি আছে মা? যত দিন আমি আছি, তত দিন তুমি জানছ তোমার সব আছে। আমি চলে গেলেই যে তোমার সব দিক ভেঙ্গে পড়বে। তোমার ধর্ম্ম কর্ম্ম, সব যাবে, তোমার গোবিন্দজী হতাদরে পথের পাশে লুটাবে। তোমায় তারা শুধু দৈহিক খাটাবে না, তোমার মনখানাকেও অপবিত্রতায় ভরে দেবে। না মা, আমি অনেক ভেবেছি, আর আমায় ভাবিয়ো না। আমার ভাবনার ফল এই উইলখানা, আমি আর নূতন কিছু করব না, করতে পারব না।"

উমা রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু বাবা—"

পিতা বলিলেন, "আবার কি মা?"

উমার কণ্ঠ একেবারেই জড়াইয়া আসিতেছিল,—অতি কষ্টে সে বলিল, "উষার সঙ্গে যে একেবারেই বিচ্ছেদ হয়ে গেল বাবা,—সে যে মনে মনে আমায় তার শত্রু বলে জেনে নেবে।"

গম্ভীর কণ্ঠে অমরনাথ বলিলেন, "লোক চেনা যাবে এইখানেই মা! ভাই বোন—কেউই যে আপনার নয়—এইখানেই দেখ তার দৃষ্টান্ত। অর্থ এমন জিনিস নয় উমা, এ নিমেষে মানুষকে পরিবর্ত্তিত করে দিতে পারে! ভাই বোন, ছেলে মেয়ে, সবাই তাকায় অর্থের দিকে,—এইখান দিয়েই তাদের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু দিয়ে যায় কেবল বাপ-মায়ে,—তারা কিছুই নিতে চায় না।"

"অনেক সময় দেখতে পাবে, ছেলে মেয়ে বাপ মাকেও কাঁদাচ্ছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত শুনতে পাবে না—কোনও বাপ মায়ে সন্তানকে কাঁদাতে সমর্থ হয়েছে। তারা ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট চিন্তা করে না, করতে পারে না। মা, ছি, চোখের জল ফেল না। অর্থ আমি তোমায় তো দিচ্ছিনে, তোমার

হাতে দিয়ে জীবরূপে নারায়ণের সেবা করাব, তাই দিয়ে যাচ্ছি। তাদের দিলে তারা নিজেদের ব্যবহারে লাগাবে, ভগবান একটু পাবেন না, তাই তাদের দিলুম না, তুমি তাই ভাব না কেন মা? তুমি কে, আমিই বা কে? এই সম্পত্তিই বা কার? ভগবানের আদেশে আমরা এসেছি,—তাঁরই সম্পত্তি আমরা পেয়েছি তাঁরই কাজে লাগাবার জন্যে,—নিজের ভোগ সুখের জন্যে তো নয়। আমি পরের জন্যে আমার সবই উৎসর্গ করেছি, নিজেকেও করেছি,—তুমিও তাই করেছ মা,—তাই তোমার হাতে ভার দিয়ে যাচ্ছি।"

উমা পিতার কথা বুঝিল ; তাই গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল একটু পরে আস্তে আস্তে বলিল, "অর্দ্ধেক উষাকে দাও না বাবা।"

অমরনাথ দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "এক পাইও দেব না উমা। তার নেই কি? সবই তো আছে। কোটী টাকা আছে তার ঘরে, কিন্তু ভিখারী তার দরজায় পায় গলাধাক্কা। সে টাকায় কি হচ্ছে খবর রাখো? ভোগই ভোগকে উপভোগ করে,—নিত্য নূতন ভোগের কামনা বুকের মধ্যে আরও জাগিয়ে তোলে। বাসনার নিবৃত্তি দূরে থাক, উত্তরোত্তর বাসনা আরও বেড়ে চলেছে। ঘরে যাও মা, পূজা কর গিয়ে,—ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর গিয়ে, যেন তাঁর কাজ তোমার দ্বারা শেষ হয়। নিজেকে উপযুক্ত করে তোল, অত কোমল হলে চলবে না।"

উমার মাথায় হাত রাখিয়া অস্ফুট স্বরে কি বলিয়া তিনি আবার বাহিরে গেলেন।

পিতার মৃত্যুদিন যে এত শীঘ্রই ঘনাইয়া আসিবে, তাহা উমা বুঝিতে পারে নাই। আজ সাত আট দিন হইল জ্বর হইয়াছে,—একজ্বরী অবস্থায় তিনি বিছানায় পড়িয়া। গৃহ-চিকিৎসক শ্রীনাথবাবু দেখিতেছিলেন। আজ তিনি দেখিয়া মুখখানা বিকৃত করিলেন।

অমরনাথ মলিন হাসিয়া বলিলেন, "কি রকম দেখলেন শ্রীনাথ বাবু?"

সঙ্কুচিত ডাক্তার বলিলেন, "না, তেমন কিছু নয়।"

অমরনাথ বলিলেন, "অনর্থক মিথ্যে কথাগুলো বলে আর কি ফল হবে ডাক্তার? আমি নিজের শরীরের অবস্থা বেশ বুঝতে পারছি। আমার হৃৎপিণ্ডের কাজ খুব ধীরে ধীরে চলছে,—যে কোনও মুহূর্ত্তে হঠাৎ তার ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আপনিও তাই দেখলেন তো?"

সেই প্রশস্ত উজ্জ্বল মুখখানার পানে চাহিয়া ডাক্তার মিথ্যা কথা বলিতে পারিলেন না, বলিলেন "সে কথা সত্য।"

অমরনাথ ক্লান্তিভরে চক্ষু দুইটী মুদিত করিয়া বলিলেন, "আঃ, বড় শান্তি। আজ আমায় যে কথা শুনাতে ভয় পাচ্ছিলেন শ্রীনাথবাবু, আপনি কি জানেন—আমি কত কাল ধরে তার প্রতীক্ষা করচি। দিন যায়—রাত যায়, আমার মনের মধ্যে কে আর্ত্তনাদ করে কেঁদে উঠে বলে—এখনও সময় হয় নি। আর কত কাল—ওগো, আর কতকাল এখানে পড়ে থাকব? আমার শরীর দিন দিন ক্ষয় হয়ে আসছিল। আমার মুখ আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। আমার সংসারে থাকতে মোটেই ইচ্ছে ছিল না শ্রীনাথ বাবু, এখনও ইচ্ছে নেই। আঃ, কি শান্তিদায়ক এই মৃত্যু, কি ঠাণ্ডা তাহার হাতখানা! যখন সে হাত আমার বুকে দেবে,

দেখতে দেখতে আমার বুকের এই ক্ষীণ স্পন্দন টুকুও থেমে যাবে,—আমার জ্বালাময় তপ্ত দেহখানা মুহূর্তে জুড়িয়ে ঠাণ্ডা বরফ হয়ে যাবে। কখন আসবে শ্রীনাথ বাবু, কখন সে বন্ধু আমার আসবে ?"

নিঃশব্দে শ্রীনাথ বাবু বসিয়া রহিলেন।

উমা গৃহে আসিয়া গ্ল্যাসে ঔষধ ঢালিয়া পিতার মুখে দিতে গেল—"বাবা, ওষুধ এনেছি।"

অমরনাথ চাহিলেন, হাসিমুখে বলিলেন, "আর কেন মা ওষুধ দেওয়া ? এত দিন শুধু তোমার ব্যাকুলতাতেই ওষুধ খেয়েছি—মা, আর কেন এ সময়ে ওষুধ দিতে আসছ ? ওষুধে কি মৃত্যু নিবারণ হয় মা,—ডাক্তার কি তার আসার পথে ব্যাঘাত দিতে পারে ? মা আমার, আর ওষুধ নয়, এখন গঙ্গা জল দিয়ো, আর অন্য জল দিয়ো না। গীতাখানা পড় মা, সেই আমার প্রকৃত ওষুধের কাজ হবে। কল্যাণময়ী উমা আমার, তোমার বাবা বলা যে শেষ হয়ে এসেছে, এখন মেয়ের যোগ্য কাজ কর।"

"বাবা—"

উমা বালিকার ন্যায় কাঁদিয়া উঠিয়া পিতার বক্ষে মুখ লুকাইল "না বাবা, ও কথা তুমি ব'ল না,—ওতে যে আমার বুকখানা ফেটে যায়,—আমি জগৎ আঁধার দেখি।"

অমরনাথ কন্যার মুখখানা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার চোখ দিয়া দুই বিন্দু জল অজ্ঞাতে গড়াইয়া পড়িল। ডাক্তারের পানে চাহিয়া বিষণ্ণ হাসিয়া বলিলেন, "দেখেছেন ডাক্তার বাবু, মায়াকে দমন করতে পারে, এমন লোক জগতে বড় কম। আমি সংসারের সবই শৃঙ্খলাবদ্ধ করে যাচ্ছি, তবু,—আমার উমার কথা ভেবে আমি চোখের জল রাখতে পারছিনে। উমা, মা আমার, ছি, কাঁদছ কেন মা ? তুমি কেঁদে আমাকেও যে কাঁদাচ্ছ। আমার যাবার সময় হয়েছে, এ সময়

তুমি যদি অমন করে কাঁদ মা, আমি শান্তি পাব না যে! জান তো মা, মায়াবদ্ধের অধোগতির কথা,—আমায় আবার সংসারে ঘুরিয়ে আনবে—এই কি তোমার ইচ্ছা? তুমি যে কল্যাণী, জগতের কল্যাণ করবে—তোমার বাপের কল্যাণ করবে না?"

উমা চোখ মুছিয়া উঠিল, "করব বাবা। আগে তোমার কাজ, তার পরে জগতের কাজ। তুমি আমায় যে কাজ দিয়ে যাচ্ছ, আশীর্ব্বাদ করে যেয়ো—যেন তা শেষ করে যেতে পারি।"

তখনই সে দুইখানি টেলিগ্রাম করিবার জন্য শ্রীনাথ বাবুকে পাঠাইয়া দিল,—একখানি মনীশ ও একখানি মৃন্ময়কে করিয়া দিবার জন্য। এ সময় তাহাদের আসা নিতান্ত দরকার।

বুক ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল, আর্ত্ত স্বরটা বাহির হইয়া পড়িতে চাহিতেছিল, আত্মদমন করিয়া উমা গীতা লইয়া পিতার মাথার কাছে বসিল। তাহার বাহিরের জগৎ নিস্তব্ধ হইয়া গেল,—জাগিয়া রহিলেন সম্মুখে মৃত্যুশয্যা-শায়িত পিতা, আর হাতে সেই গীতাখানি। তাহার আহার-নিদ্রা ঘুচিয়া গেল। মনে জাগিতে লাগিল—পিতা চিরকালের জন্য বিদায় লইতেছেন,—তাঁহাকে এ সময়ে তাঁহার বাঞ্ছিত বস্তু দেওয়া। ইহার পরে আর সে এমন সময় পাইবে না,—হাহাকার করিয়া মরিলেও না।

বগলা দেবী অতি বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছিলেন,—তাঁহার বয়স সত্তর বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আজকাল তিনি বড় একটা হাঁটিতে চাহিতেন না। তাঁহার কানে গিয়া পৌঁছাইল—অমরনাথ শেষ শয্যায় শায়িত। যে কোনও মুহূর্ত্তে তিনি ইহলোক ত্যাগ করিবেন।

বৃদ্ধা অতি কষ্টে কোন মতে অমরনাথের গৃহে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহার ক্রন্দনে বিলাপে গৃহখানা মুখরিত হইয়া উঠিল। উমার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

সেই দিনই বৈকাল বেলা অমরনাথ প্রশান্ত মুখে ভগবানের নাম করিতে করিতে কন্যার কোলে মাথা রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। প্রস্তর-গঠিতা দেবী-প্রতিমার ন্যায় পিতার মাথা কোলে লইয়া উমা তখনও বসিয়া রহিল।

মনীশ বা মৃন্ময় কেহই আসিয়া পৌঁছিল না। দেওয়ান চোখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া বলিলেন, "এখন কি হবে উমা ?"

উমা শান্ত কণ্ঠে বলিল, "কিসের কি হবে কাকা ?"

দেওয়ান তাহার শান্ত ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। এমন আশ্চর্য্য দৃশ্য তিনি তাঁহার এই সুদীর্ঘ বয়সের মধ্যে দেখিতে পান নাই। উমার অশ্রুহীন চোখ তাঁহার চোখে অশ্রুর বন্যা বহাইয়া দিল; কথা কহিতে গিয়া তিনি কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

পিতার মাথা সযত্নে কোল হইতে নামাইয়া উপাধানে রাখিতে রাখিতে উমা বলিল, "কাঁদবেন না কাকা, এতে বাবার আত্মা শান্তি পাবে না। তিনি সকলকেই কাঁদতে নিষেধ করেছেন; বলেছেন, কাঁদলে তিনি যেতে পারবেন না। আপনি সৎকারের কথা বলছেন? বাইরে রাষ্ট্র করে দিন—বাবা আর নেই, সংসারের মায়া কাটিয়ে তিনি চলে গেছেন। এ কথা শুনবামাত্র এখনি হাজার হাজার লোকে এসে বাড়ী ছেয়ে ফেলবে,—সবাই তাঁকে শ্মশানে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করবে। আমার বাবা তো তেমন লোক ছিলেন না কাকা, আমার বাবা যে দেবতা ছিলেন—।"

উমার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল, সে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মৃতের শান্ত মুখখানার পানে চাহিয়া রহিল।

দেওয়ান কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "আমি সে কথা বলছিনে মা। বাইরে হাজার হাজার লোক এসে হাহাকার করছে, বাড়ীর মধ্যে

বলে কেউ আসতে পারছে না। তুমি এবার অন্য ঘরে যাও, তোমার ঠাকুর মাকে দেখ গিয়ে, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। কেউ তাঁকে প্রবোধ দিয়ে রাখতে পারে নি। তোমায় পেলে তিনি অনেকটা ঠাণ্ডা হবেন'খন। আমি সে সব কথা বলছি নে মা, আমি বলছি আর এক কথা।"

উমা নত মুখে কি ভাবিতেছিল, মুখ তুলিয়া বলিল, "দাহ করার কথা কাকা?"

দেওয়ান বলিলেন, "হ্যাঁ মা।"

উমা বলিল, "মনীশ দা, মৃন্ময়, কেউ আসে নি?"

দেওয়ান বলিলেন, "এখনই ষ্টেশন হতে লোক ফিরে এল, কেউ আসে নি। আজ রাত্রে তো আর ট্রেন নেই কলকাতা হতে আসবার। ভোরের সময় একখানা ট্রেণ আসে, সেই ট্রেণখানায় সব আসতে পারে। কিন্তু—এমন দেবতুল্য লোকের দেহটা বাসি হয়ে যাবে যে মা। আমাদের যে সংস্কার আছে, বাসি মড়া হলে তার গতি হয় না। আমি তাই যে ভাবছি—ভেবেও তো কিছু ঠিক করতে পারছিনে।"

উমার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। একান্ত অসহায়ার ভাবে সে দেওয়ানের পানে তাকাইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "তাই তো কাকা।"

দেওয়ান চুপ করিয়া রহিলেন,—কি করিবেন, তাহা তিনিও ভাবিয়া পাইতেছিলেন না।

উমা বেদনা-জড়িত কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু—তা আমি করতে দেব না কাকা, আমার বাবার এ দেহ আমি বাসি হতে দেব না,—এর আজই সৎকার করা চাই। কাকা, আমি মুখ-অগ্নি করলে কি হবে না? বাবা যে আমায় বড় ভালবাসতেন কাকা, আমার আগুন দেওয়া কি শাস্ত্রসম্মত হবে না?"

দেওয়ান একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "অগত্যা তাই করতে হবে মা, নইলে বাসি মড়া রাখতে হয়। কিন্তু পারবে মা? এ বড় শক্ত কাজ যে। জগতে যে তোমার বড় আপনার ছিল, সেই স্নেহময় বাপ—তাঁর মুখে নিজের হাতে আগুন তুলে দিতে পারবে তুমি?"

উমা হাসিল। সে যে কি হাসি, তাহা দেওয়ান বুঝিলেন। উমা বলিল, "পারব কাকা, না পারলে চলবে না যে। আমার বাবাকে শেষ খেতে দিয়েছি আমি, শেষ ভগবানের নাম শুনিয়েছি আমি, এত করে এই কাজটা করতে পারব না? আমি এত দুর্ব্বল নই কাকা, আমি বেশ আগুন দিতে পারব। দেখবেন, আমি একটু ভেঙ্গে পড়ব না।"

বাস্তবিকই দেওয়ান তাহা দেখিলেন। শ্মশানে পিতাকে চিতায় শোয়াইয়া, প্রদক্ষিণ করিয়া, অকম্পিত হস্তে সে পিতার মুখে আগুন দিল।

ধূ ধূ ধূ—

চিতা জ্বলিতে লাগিল, অগ্নি গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে উমার এ জগতের সর্ব্বস্ব স্নেহময় পিতার দেব-শরীরখানা বেষ্টন করিয়া ধীরে ধীরে গ্রাস করিতে লাগিল। কাছেই একটা বকুল গাছের গোড়ায় হেলান দিয়া বসিয়া উমা চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

বকুল ফুল ঝরিয়া তাহার মাথায় পড়িল, গাছের উপর শবভুক শকুনীদল ডানা ঝাড়িল, অদূর হইতে পেচক কর্কশ স্বরে ডাকিয়া উঠিল। খুব নিকটে একদল শৃগাল বিকট রবে চেঁচাইয়া উঠিল, শবদাহকারীরা—বল হরি—হরি বল—বলিয়া গগন প্রকম্পিত করিয়া তুলিল।

দেওয়ান উমাকে অনেক আগেই লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, উমা কিছুতেই রাজি হয় নাই। ক্রন্দনরুদ্ধ-কণ্ঠে সে বলিয়াছিল—"শুধু আজকের দিনটা কাকা—আজ আমায় ক্ষমা করুন—আপনার অবাধ্য আমি

কখনই হব না। আমি প্রথম হতে বাবার কাছে আছি, শেষ পর্য্যন্ত থাকব। নিজের হাতে খাইয়েছি যাঁকে, দেখব, তাঁর সেই শরীরটা কেমন করে ভস্মসাৎ হয়ে যায়। আমি নিজের হাতে জল তুলে এই চিতা ধুইয়ে দিয়ে যাব কাকা, এ আজ আমি কাউকে করতে দেব না।”

উমা দেখিতেছিল, কত অল্প সময়ে কত বৎসরের সযতনে রক্ষিত দেহখানা কেমন করিয়া ছাই হইয়া যায়। আঃ, এই দেহটাকেই না কত যত্ন করা—এ যে সবই বৃথা। কত জিনিস দিয়া এই দেহটাকেই না সাজানো হয়,—কত ভোগে এই দেহটাকেই না পুষ্ট করা হয়। সবই মিথ্যা যে! হায়, এর মধ্যে সত্য কি? সত্য জীবনের মাঝে কই? সত্য যে এই মরণের মাঝে প্রতীয়মান হয়। ওগো সত্য,—হে চিরন্তন, হে অনন্ত, অসীম, আমার মাঝে কবে তুমি ফুটিয়া উঠিবে? আমার চারিদিককার মিথ্যার দেওয়ালগুলা খসিয়া খসিয়া পড়িবে—শেষে একেবারেই মিথ্যা হইয়া যাইবে, তাহার মধ্যে চিন্তা করিবার মত কিছু পাওয়া যাইবে না। বন্ধু আমার, কবে আসিবে তুমি? আমার কলঙ্কময় চিত্ত পবিত্র নির্ম্মল করিয়া তুলিতে, আমায় নিত্য জ্ঞানের সাগরে ভাসাইতে কবে আসিবে তুমি বন্ধু? জগৎ যে আমার চোখে ছায়াই হইয়া গিয়াছে, সে থাকিয়াও যে নাই! প্রবঞ্চনা আমায় জানাইয়াছে সব মিথ্যা,—এখানে সত্য শুধু তুমি, আর কিছু নাই। যত দিন বুঝি নাই, তত দিন এই মিথ্যাকেই আশ্রয় করিয়াছিলাম। এ আমার চক্ষে মোহের অঞ্জন পরাইয়া দিয়া ছিল। আজ সেই মিথ্যাই অতর্কিত আঘাতে আমার চেতনা ফিরাইয়া দিয়াছে। মিথ্যাকে দিয়াই আমি মিথ্যাকে চিনিতে পারিয়াছি। এ জগৎ যে শুধু প্রবঞ্চনায় ভরা,—এ যে শুধু বুকই ভাঙ্গিয়া দেয়। জীবন কালের প্রথমেই যে আঘাত লাভ হইয়াছে, তাহাতে চৈতন্য ফিরিয়াছে, সংসারের অসারতা তাহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ছায়া—মিথ্যা—এই যে জগতের উপাদান। বন্ধু আমার—ওগো সত্য, তুমি কবে আসিবে—কবে তোমায় তুমি আমার মাঝে প্রকাশ করিবে ?

জ্বলিয়া জ্বলিয়া চিতা নিভিয়া গেল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উমা কলসী করিয়া জল আনিয়া চিতার উপর ঢালিয়া দিতে লাগিল।

বোল হরি—হরি বোল—

শবদাহকারীরা যখন ফিরিল—তখন রাত তিনটা।

অন্ধকারে বাড়ীখানা দৈত্যের মতন দাঁড়াইয়া। উমা সহজে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেছিল না,—তাহার বুক হাত পা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

দেওয়ান তাহার মনের ভাব বুঝিলেন। এতক্ষণ সে যে উত্তেজনাবশে কাজ করিতেছিল, সে উত্তেজনা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে,—অবসাদ তাহাকে এখন বড় দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে।

"চল মা, বাড়ীর মধ্যে চল।"

"আমি কি করে ভেতরে যাব কাকা, আমি যে বাবাকে বিসর্জ্জন দিয়ে এলুম—।" অস্ফুট স্বরে উমা কাঁদিয়া উঠিল।

দেওয়ান সস্নেহে তাহার হাতখানা ধরিয়া বলিলেন, "মা আমার, তুমি কাঁদছ, এটা যে মোটেই মানায় না মা। তোমার বাবা স্বর্গে গ্যাছেন,—আবার তাঁর জন্যে তুমি কাঁদছ। চল মা, আমি তোমায় নিয়ে যাচ্ছি।"

সে রাত্রি উমা মোটেই শুইতে পারিল না,—দেওয়ালে ঠেস দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দেওয়ান দ্বারের কাছে বসিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। এই নীরব শোকের প্রতিমূর্ত্তিকে তিনি যে কি সান্ত্বনা দিবেন, তাহা ভাবিয়া পাইতেছিলেন না।

২৫

সত্যই সকালের ট্রেণে মনীশ এবং মৃন্ময় ও উষা আসিয়া পৌছিল। উষা পিতাকে জীবিত ভাবিয়াই আসিয়াছিল, পিতা নাই শুনিয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। বিবাহের পর চার বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে সে পিতাকে আর দেখিতে পায় নাই।

মনীশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, মৃন্ময় বাহিরের বারাণ্ডায় একখানা চেয়ারে নীরবে বসিয়া রহিল। উমা খানিক আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পর উষার হাত ধরিয়া উঠাইয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, "কাঁদিস নে উষা, বাবা গিয়াছেন ভালই হয়েছে। আমি একটুও কাঁদি নি দেখছিস।"

উষা কাঁদিয়া বলিল, "তুমি কাঁদবে কি দিদি, তুমি তো বাবার কাছেই ছিলে, বাবার সব কাজই তুমি করতে পেয়েছ, আমি যে কিছুই করতে পারলুম না, একবার যে শেষ দেখাটাও দেখতে পেলুম না।"

উমা তাহাকে টানিয়া গৃহে লইয়া গেল। তাহার এক বৎসরের ছেলেটীকে কোলে লইয়া মনীশের কাছে আসিল, "ঘরে চল মনীশ-দা, উঠানেই দাঁড়িয়ে রইলে যে।" তাহার পর একটু হাসিয়া বলিল, "তোমরা দৃঢ়চিত্ত পুরুষ বলে অহঙ্কার কর, কিন্তু আমি দেখছি এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে গর্ব্ব করা। তোমরা যদি সত্য সত্যই তাই হও—তবে দৃঢ়তা আনো তেমনি, সব উড়িয়ে দাও। তোমরা এমন করলে আমরা যাই কোথা?"

মনীশ বিস্মিত নেত্রে তাহার পানে চাহিল, কোনও কথা কহিতে পারিল না।

উমা বলিল "মৃন্ময় কোথা মনীশ-দা ?"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনীশ বলিল "বোধ হয় বাইরে।"

উমা বলিল, "তাকে দেখা শোনা করা তোমার কাজ মনীশদা,— আমি কিছু ঠিক করতে পারছি নে, কি করতে হবে এখন আমায়। আমার মাথারই মোটে ঠিক নেই। এর ওপরে ঠাকুরমার জন্যে ভারি ভাবনা হয়েছে। কাল হতে তিনি কেবলই অজ্ঞান হয়ে পড়ছেন। তাঁকে এত বুঝাবার চেষ্টা করছি, কিছুতেই বুঝাতে পারছি নে। আমি আবার তাঁর কাছে চললুম মনীশদা, তুমি এদিককার সব দেখ।"

উমাকে মনীশ যতই দেখিতেছিল, ততই যেন আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে-ছিল। পিতার শ্রাদ্ধের দিন যতই কাছে আসিতে লাগিল, ততই তাহার পূর্ব্ব দৃঢ়তা ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

মৃন্ময় মনীশকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিল, "উইলের কথাটা জিজ্ঞাসা করেছিলে মনীশ ?"

মনীশ বিরক্ত ভাবে মাথা নাড়িল "না।"

মুহূর্ত্তে কঠিন হইয়া গিয়া মৃন্ময় বলিল, "কিন্তু মনে করে দেখ মনীশ, আমি আসতে চাই নি, তুমিই আমায় নিয়ে এলে।"

মনীশ বলিল "বেশ মনে আছে মৃন্ময়, সে কথা আমি ভুলি নি। আমি ভেবেছিলুম, কাকা বেঁচে আছেন,—শেষ সময়টায় তাঁর মেয়ে জামাই সকলকে দেখানোর উদ্দেশ্যেই আমি তোমায় জোর করে নিয়ে এসেছি। উইলের কথা আমি বলব উমাকে, কিন্তু মাপ কর ভাই, শ্রাদ্ধটা আগে শেষ হতে দাও, তার পরে।"

মৃন্ময় বলিল, "শ্রাদ্ধ শেষ হলে তার পরে তুমি কথা তুলবে ? আশ্চর্য্য কথা। যদি কথা তুলতে হয় তবে এখনই তোলা উচিত। বিধবা মেয়ে সম্পত্তির অধিকারিণী হতে পারে না ; মাসে মাসে কিছু সাহায্য পেতে

পারে, এইমাত্র তার দাবী। দৌহিত্র যখন রয়েছে, তখন আইনতঃ সেই বিষয়ের যথার্থ উত্তরাধিকারী, তা তো জানো ?"

মনীশের মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। সে একটু থামিয়া বলিল, "তা আমি জানি, কিন্তু মৃত উইল করে গ্যাছেন—"

বাধা দিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মৃন্ময় বলিল, "সে উইল ন্যায়সঙ্গত নয়। তুমি আমায় কি বুঝাতে চাও মনীশ,—আমি ও-সব জানি। আমি বেশী দিন থাকতে পারছি নে আজই কাজটা মিটে যায় যদি, আমি আজই চলে যাব। আমার হাতে অনেকগুলো রোগী আছে তা জানো।"

মনীশ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, "আমায় তুমি শাসাচ্ছ কি মৃন্ময় ? আমি তার বাপের বন্ধুর ছেলে, এই মাত্র সম্পর্ক ! এ নিয়ে তুমি আমায় কোনও কথা বলতে পার না। তোমার আত্মীয়া,—বরং তোমার জোর আছে,—আমার কথা বলবার অধিকার নেই। তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি নিজেই বলতে পার। আমায় বলতে বলছ, আমি একবার কথাটা তাকে শুনিয়ে দেব এই মাত্র, –এর বেশী আর কিছু সাহায্য তুমি আমার কাছ হতে পাবার আশা করো না।"

সে সরিয়া গেল। মৃন্ময় আপনার মনে শুধু গর্জ্জন করিতে লাগিল। মনীশকে আর কোনও কথা বলার সাহস তাহার হইল না।

খোকাকে কোলে লইয়া উমা তখন আদর করিতেছিল, ঊষা নিকটে বসিয়া ছিল। স্বামীর নিকট হইতে বারংবার সে খোঁচা খাইতেছিল, যেন উইলের কথাটা উমার কাছে তোলা হয়। ঊষার মনেও একটা বিরুদ্ধ মত জাগিয়া উঠিয়াছিল ; কিন্তু সাহস করিয়া সে কথা পাড়িতে পারে নাই।

আজ কথাটা বলিবার জন্য তাহার অন্তরটা ছটফট করিতেছিল ; তাই সে একেবারেই বলিয়া বসিল, "কিন্তু ভাই দিদি, সব্বাই বলছে কাজটা মোটেই ভাল হচ্ছে না।"

উমা কথাটা বুঝিতে পারিল না, বিস্মিত নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া বলিল, "কি কথা উষা ?"

উষা নতমুখে বলিল, "এই বিষয় সম্পত্তি—"

"ওঃ কথাটা যখন তুললে উষা, ভালই হল। বলি সব শোন তবে।" উমা খোকাকে উষার কোলে দিয়া বসিয়া পড়িল, "বিষয় সম্পত্তি সব বাবা আমার নামে উইল করে দিয়ে গ্যাছেন, তাতে অনেক সাক্ষী আছে, তিনি—"

বাধা দিয়া সকল সঙ্কোচ দূর করিয়া উষা বলিল, "কিন্তু সব্বাই বলছে, এ কখনই আইনসঙ্গত নয়। বিধবা মেয়ে না কি সম্পত্তি পেতে পারে না, বিশেষ উত্তরাধিকারী দৌহিত্র যখন রয়েছে।"

উমা স্থির দৃষ্টি তাহার মুখের উপর রাখিল। উষা সে দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

উমা বলিল, "সব্বাইয়ের দোহাই দিয়ে তুইকি নিজের কথাটাও বলছিস নে উষা ? তোর মনেও জাগছে—আমি তোর ছেলের ন্যায্য বিষয় বড্ড ফাঁকি দিয়ে নিয়েছি। অবশ্য এর মধ্যে প্রবঞ্চনা আছে বই কি—যেহেতু বাবা কোর্টে আমায় বিবাহিতা বলেছেন, বিধবা বলেন নি। যারা স্বাক্ষর করেছে, তারাও জেনে শুনে এই মিথ্যার স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছে। এটুকু মিথ্যার জন্যে বাবাকে দোষ দেওয়া যায় না ; কারণ, বাবা শুধু আমার দিকে তাকিয়েই এ কাজ করেন নি। তিনি দৃষ্টি রেখেছিলেন তাঁর প্রজাদের দিকে, তাঁর গৃহ দেবতার দিকে। আশ্রিতের জন্যে মিথ্যার আশ্রয় নিলে বিশেষ দোষ হয় না ভেবেই, তিনি এই মিথ্যাটুকুর আশ্রয় নিয়েছিলেন। বিষয়টা যে ন্যায়সঙ্গত ভাবে তোমাদেরই, তা আমি অস্বীকার করছি নে। অনেক ভেবে চিন্তেই বাবা আমায় দিয়েছেন। তিনি ভেবেছিলেন, এতে ভাল ফল উৎপন্ন হবে; কারণ, আমার

কাপড়, এই হলেই মিটে গেল। তিনি আমায় তাঁর অর্থ ভোগের জন্যে ব্যয় কর্‌তে বা সঞ্চয় করে রাখতে বলে যান নি, বলেছেন এর যথার্থ সদ্ব্যবহার করতে।”

ঊষা একটু উষ্ণ হইয়া বলিল, “এইটে যে তোমার বড় অন্যায় কথা হয়ে গেল দিদি। আমরা যদি পেতুম সব,—তুমি কি বলতে চাও, সবগুলো আমাদের ভোগ বিলাসেই ব্যয় হত, অথবা আমরা সঞ্চয় করেই রাখতুম?”

আহতা উমা ঊষার মুখপানে চাহিল। হায়, সে ঊষা কোথায় গেল, যাহাকে সে এই কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছে, নিজে না খাইয়া যাহাকে খাওয়াইয়াছে। চার বৎসর আগে যে ঊষা এ বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছিল, এ তো সে ঊষা নয়। হায় সংসার, হায় মানুষ, এত শীঘ্রই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায় তোমার?

উমার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ত্বরিতে সে চোখের জল শুকাইয়া লইল। তাহার পর ফিরিয়া একটু হাসিয়া বলিল, “না হয় করতিস না। কিন্তু, ঠাকুরসেবা তো হত না ঊষা। মৃন্ময় ঘোর নাস্তিক, সে ঠাকুর সেবার অর্থ কিছুই বোঝে না। আমাদের পিতৃ-পিতামহের আমলের ঠাকুর কি শেষে পথের ধারে গড়াগড়ি যাবে ঊষা?”

তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। আত্মসম্বরণে অসমর্থ হইয়া উমা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

গোপনে পিতার কক্ষে গিয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া সে আজ এই প্রথম হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া ডাকিল—“বাবা—বাবা গো।”

সংসার কি যথার্থ ই এমনি? এখানে যথার্থ ই কেহ কাহারও নয়। বাবা—স্নেহময় বাবা আমার, আমার মাথায় এ কি দায়িত্ব দিয়া গেলে গো,—আমি যে আর পারি না, আমার বুক যে ফাটিয়া যায়। এ কি পৈশাচিক ভাব এ জগতে? বাবা, তোমার উমাকে তোমার

কাছে ডাকিয়া লও, সংসারের নিষ্ঠুরতা সে আর সহিতে পারিতেছে না।

মনীশ কি কাজে বারাণ্ডা দিয়া যাইতেছিল। গৃহমধ্যে অস্ফুট রোদনের স্বর শুনিতে পাইয়া সে দরজা খুলিল। উমাকে গৃহতলে লুণ্ঠিতা দেখিয়া সে প্রথমটা কিছুই বলিতে পারিল ন । সে যে সংসারের নিদারুণ নিষ্ঠুরতা দেখিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সান্ত্বনার আশায় কাঁদিবার জন্য পিতার এই শয়নকক্ষে ছুটিয়া আসিয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না ; সে ভাবিল, পিতার জন্য কাঁদিতেই সে আসিয়াছে।

তাহার আর্ত্ত কণ্ঠ মনীশের বুকের মধ্যে কাটিয়া কাটিয়া বসিতে লাগিল। তাহার দুইটী চোখ অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সে ডাকিল "উমা—"

"মনীশ দা—"

উমা মুখ তুলিয়া চাহিল—দুই হাতের মধ্যে মুখখানা লুকাইয়া সে আরও কাঁদিতে লাগিল।

"কেঁদে কি করবে উমা,—যিনি গেছেন, তিনি তো আর ফিরবেন না। মৃতের জন্যে কান্না ভাল নয় তো, তা তুমি জানো উমা। এ ত তাঁর পরলোকগত আত্মাকে আবার মায়া-মোহপূর্ণ জগতে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস মাত্র। না উমা, তাঁকে শান্তি পেতে দাও, কেঁদ না।"

রুদ্ধ কণ্ঠে উমা বলিল. "আমি তো তার জন্যে কাঁদছিনে মনীশদা। বাবা গ্যাছেন,—আমি এত দিন কাঁদিনি তো এমন করে। আমি তা জানি। আমি বাবাকে আর আকর্ষণ করব না। মনীশদা, আমার বুকখানা আজ যে ভেঙ্গে গ্যাছে। আমি যে সংসারের কথা ভেবে, এর লোকদের নিষ্ঠুরতা দেখে কোন ক্রমে চো'খের জল রাখতে পারছিনে মনীশদা।"

উমা আবার হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"আমার বুক একেবারে

ভেঙ্গে গেল মনীশ দা,—আমি একেবারে ভেঙ্গে পড়লুম যে আজ। আমার কি হল, মনীশ দা, আমার যে আর বাঁচতে ইচ্ছা করছে না। আজ উষা, আমার সেই উষা—দেখেছ তো তুমিও, সে আমার কি জিনিস,—সেও কি না আজ টাকার দাবী করছে,—সেও স্পষ্ট আজ আমায় জানিয়ে দিলে—অর্থের কাছে আর কেউ নয়। মনীশদা, আমার বুক ভেঙ্গে গ্যাছে, আমি চুরমার হয়ে গেছি যে।"

মনীশ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল, "না, ভেঙ্গে গেলে তো চলবে না উমা। তুমি সংসারের মানুষ নও বলেই সংসার কি, তা জানতে পার নি। এখানে সব আছে উমা, এখানেই সব তুমি দেখতে পাবে। বনে হিংস্র জন্তু বাস করে; কিন্তু সংসারে তার চেয়ে বেশী হিংস্র মানুষ বাস করে। এখানে তুমি যাকে যত স্নেহ করবে, জেনো, সেই তোমায় দেবে শুধু বেদনা। যাকে ভালবাসবে—সে দেবে কঠিন উপেক্ষা—যাতে তোমায় একেবারেই চুরমার করে দিতে চাইবে। কিন্তু তাই বলে কি ভেঙ্গে চুরমারই হতে হবে? দেখতে হবে, আরও কতদূর যায়। একটু আঘাতেই যদি ভেঙ্গে পড়লে উমা, তবে তুমি শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ হয়েছ কেন, এত জ্ঞানই বা পেয়েছ কেন?"

উমা উঠিয়া বসিল। বিশৃঙ্খল এলায়িত চুলগুলা চারিদিক হইতে গুটাইয়া বাঁধিল। নিতান্ত অসহায়ভাবে সে বলিল, "আমি কি করব মনীশ দা! তুমি আমার গুরুস্থানীয়, তোমার কাছ হতে আমি অনেক উপদেশ পেয়েছি। আজও উপদেশ দাও মনীশ দা, আমি তোমার পায়ের কাছে বসি, সেই ছোট বেলার মতই তোমার ওপরে আবার নির্ভর করি। বল—আমি এখন কি করব?"

মনীশ বলিল, "কি করবে? ওরা যাই বলুক, তুমি কান দিয়ো না। তোমার স্বর্গীয় পিতার কথা মনে কর, বুকে বল নিয়ে এস। তিনি সব

ভেবে যা ঠিক করে দিয়ে গ্যাছেন, তা কখনই মিথ্যা হতে পারে না। নিজের দৃঢ়তার ওপরে নিজে নির্ভর করে দাঁড়াও। শুধু উনিই এ কথা বলে নি উমা, মৃন্ময়ও আমায় বলেছে তোমায় এ কথা বলবার জন্যে। আমি তাকে জবাব দিয়ে এসেছি, আমি পারব না। সম্ভব সেও তোমায় এ কথা বলবে। আমি আজ মহলে যাচ্ছি সকলকে খবর দেবার জন্যে, যে, কাকা মারা গ্যাছেন। কাল বোধ হয় ফিরব। এর মধ্যে যদি মৃন্ময় তোমায় কোনও কথা বলে, তা শুনো না। এখন তোমার ওপরেই সব নির্ভর করছে, এটা জেনে রেখো। উইল কখনই বার করে ওদের দেখিয়ো না। সকলে শ্রাদ্ধের দিনে আসবে, তখন আমি উইল বার করে সবাইকে দেখাব।"

উমা নীরবে তাহার পায়ের কাছে মাথা নোয়াইল, নীরবে তাহার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।

মনীশ তাড়াতাড়ি করিয়া মহলে চলিয়া গেল। আর তিন দিন পরেই শ্রাদ্ধ। ইহার মধ্যে প্রজাদের খবর দেওয়া চাই—তাহাদের দেবতার মত জমীদার আর নাই।

মনীশ চলিয়া গেলে মৃন্ময় হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে বাস্তবিকই তাহাকে একটু ভয় করিয়া চলিত। কারণ, সে জানিত, মনীশ যাহাই হউক না, সে ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াইবে,—আর ইহাদের সে আপনার বলিয়াই জানে। উমার কাছে কোনও কথা বলিতে তাহার ভয় লাগিত না যদি সে একা থাকিত। মনীশ তাহার স্বপক্ষে দাঁড়াইতে, মৃন্ময় কিছু স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল।

"শুনুন, আমি একটা কথা বলতে চাই—"

উমা তখন সন্ধ্যাহ্নিক করিবার জন্য পূজার গৃহে যাইতেছিল, মৃন্ময়ের কথা শুনিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। কি যে কথা—তাহা তাহার বেদনা-

পূর্ণ হৃদয়খানা শীঘ্রই বুঝিয়া লইল। তাহার চোখে-মুখে হৃদয়ের আর্ত্ত ভাবটা বেশ ফুটিয়া উঠিল। অন্তর হইতে কে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "ও গো, না, আর আমায় কোনও কথা শুনাইয়ো না, আমি যথেষ্ট শুনিয়াছি। সংসারের এই সব আঘাত আমি যে আর সহ্য করিতে পারি না।"

কিন্তু অন্তরের দেবতা আর্ত্তনাদ করিলে কি হইবে? উমার বহিঃপ্রকৃতি যে মনুষ্য আবরণের মধ্যে, সেই হিসাবে তাহাকে এ কথা শুনিতেই হইবে যে। তাই সে যথাসাধ্য শান্তভাবে বলিল "কি কথা?"

মৃন্ময় জোর করিয়া বলিল "এই উইলখানার কথা। আপনি বুদ্ধিমতী—জানছেন, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা দিয়েই তৈরি হয়েছে, সত্য এর ভিত্তি নয়। কাজেই এ টলমল করছে, দাঁড়াতে পারছে না। আপনি যদি সত্যর ওপরেই নির্ভর করতে না পারলেন, তবে আপনিই যে মিথ্যা হয়ে গেলেন। যথার্থ অধিকারীকে ফাঁকি দেওয়া—এ হৃদয়হীন বর্ব্বরেরই সাজে, আপনাতে সাজে না বলেই আপনাকে বলছি। এখনও সময় আছে, এখনও আপনি যা নিয়েছেন ফিরিয়ে দিতে পারেন।"

"উঃ!" উমার কণ্ঠ চিরিয়া এই একটা কথা মাত্র বাহির হইয়া পড়িল। না, আর তো সহ্য হয় না, এ ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিতে উমা যে অক্ষম। পিতা, উমা তোমার কথা রাখিতে সমর্থ হইল না, ন্যায্য যাহার জিনিস তাহাকেই সে ফিরাইয়া দিবে।

হাতের ফুল বেলপাতা পড়িয়া গেল, উমা দ্রুতপদে নিজের গৃহে চলিয়া গেল। অকম্পিত হস্তে বাক্স খুলিয়া পিতার আয়রণ-চেষ্ট খুলিয়া সেই সযত্ন-রক্ষিত উইলখানা বাহির করিয়া লইল।

ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, মৃন্ময় তখনও দাঁড়াইয়া আছে।

গর্ব্বপূর্ণ কণ্ঠে উমা বলিল, "এই নাও, আমার সকল দাবী আমি ছেড়ে দিচ্ছি। বাবা আমায় যা দিয়ে গেছলেন, আমি তা তোমাদেরই দিচ্ছি।

সত্য মিথ্যার কথা তুমি কি বলছ মৃন্ময়? আমার বাপের সঙ্গে তুমি ব্যবহার করনি, নইলে জানতে পারতে, তিনি নিজেই জীবন্ত সত্য ছিলেন। আমি আজ সেই সত্যের অমর্য্যাদা করলুম, মিথ্যার আশ্রয় নিলুম,—এ আমার কর্ম্মফল ভিন্ন আর কিছুই নয়। তোমাদের বাধা আমি আমারই হাত দিয়ে সরিয়ে দিলুম, এর জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ—তা আমি ঘৃণাজনক বলেই মনে করি।"

উইলখানা শতখণ্ডে পরিণত করিয়া সে তাহা মৃন্ময়ের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া, ধীরপদে পূজার গৃহে চলিয়া গেল। মৃন্ময় হাঁ করিয়া সেই গঠিত মূর্ত্তির পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল!

২৬

সকাল বেলাই মনীশ ফিরিয়া আসিল। বেলা তখন সাতটা বাজিয়া গিয়াছে। বাড়ীর সকলকেই সে দেখিতে পাইল; দেখিল না কেবল উমাকে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, সে তখনও বিছানায় শুইয়া আছে।

উমা বগলাদেবীর গৃহে শয়ন করিত,—তাহার গৃহটা সে অন্য লোককে ছাড়িয়া দিয়াছিল। বগলাদেবী তখন মুহ্যমান ভাবে বারাণ্ডায় বসিয়া ছিলেন, কথাবার্ত্তা বলা তিনি প্রায় ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন। মনীশ তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিল, "উমা কি এখনও শুয়ে আছে ঠাকুর মা?"

বগলাদেবী শুধু ফেল ফেল করিয়া চাহিয়া রহিলেন, উত্তর দিলেন না। তাঁহাকে কথা বলা নিস্ফল জানিয়া, মনীশ দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "উমা"—

"এস মনীশ-দা, দরজা ভেজানো আছে।"

দরজা ঠেলিয়া মনীশ গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, উমা বিছানায় পড়িয়া আছে, ছিন্ন লতাটীর মতই সে লুটাইয়া পড়িয়াছে।

মনীশ বলিল "এখনও ওঠনি যে উমা?"

উমা বলিল, "উঠতে পারলুম না মনীশদা, মাথা এত ভার হয়েছে যে তুলতে পারছিনে মোটে। বোধ হচ্ছে জ্বর হয়েছে; গাটাও তেমনি ব্যথা হয়েছে।"

মনীশ ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, উমার সুগৌর মুখখানা খুব লাল হইয়া উঠিয়াছে; তাহার চোখ দুইটাও যেন বড় ক্লান্তি ভরে মুদিয়া আসিতেছে। মনীশ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তা তোমার জ্বর হওয়াটা বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা নয় তো উমা। শরীরকে তুমি বড় অবহেলা

কর। এ শুধু আজ বলে নয়, বরাবর এমনি। এত দিন কাকা ছিলেন, তিনি নিজে তোমার ওপর দৃষ্টি রাখতেন, ঠাকুর মা আছেন বটে, কিন্তু তিনি তো আর মানুষই নন, কি রকম হয়ে গেছেন, ডাকলেও আর সাড়া দেন না। তোমায় আর কে কি বলবে উমা ?"!

উমা শ্রান্ত চক্ষে চাহিয়া বলিল, "বলতে তুমি তো আছ মনীশদা।"

ব্যথার হাসি হাসিয়া মনীশ বলিল "আমি ? আমি তোমায় কি বলছি উমা ? আমি বাইরের তালে রয়েছি,—তোমার খাওয়া দাওয়ার কথাটা পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করতে পারি নি আমি।"

উমা বলিল, "এবারে তো তোমার কাছেই যাব মনীশদা! আমায় তোমার কাছে গিয়েই থাকতে হবে। শ্রাদ্ধটা মিটে গেলেই আমি ভারি নিশ্চিন্ত হয়ে বেরুব। দেখো, তখন ঠিকমত শরীরটাকে যত্ন করতে পারি কি না। তখন তো দিনরাত তোমার চোখের ওপরেই থাকব,—দেখতে পাবে সব।"

বিস্মিত মনীশ বলিল, "আমার কাছে ? কলকাতায় থাকতে যাবে তুমি উমা ? কেন এখানে তুমি থাকবে না ?"

যেন অশ্রু অতি কষ্টে সামলাইয়া উমা বলিল, "এখানে থাকবার অধিকার আমার আর কি আছে মনীশদা ?"

মনীশ অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিল, "নেই কি রকম ? কাকা রীতিমত উইল করে তোমাকেই তো সব দিয়ে গেছেন, কাল পর্য্যন্ত তা শুনে গেছি, আজ আবার এ কি কথা বলছ উমা ?"

উমা হাসিমুখে বলিল, "সত্যি কথা বলছি মনীশদা। আমি ঊষাদের সব দিয়ে দিলুম। আমি আজ ভিখারিণী, পরের দয়ার প্রত্যাশী। তবু— ওদের দেওয়া দানে আমি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইনে মনীশদা। আমি তোমার কাছে জোর করে তবু চাইতে পারি; কারণ, তোমার

আমার মধ্যে আর কেউ এসে দাঁড়াতে পারে নি। আমরা যেমন ভাই-বোন, তেমনি ভাই-বোনই আছি। ছোটবেলায় আমরা যেমন ছিলুম—এখনও তেমনি আছি, বোধ হয় আজীবন কাল তেমনি থাকবও। কিন্তু উষা—মনীশদা, সেই কেবল আমার একেবারে পর হয়ে গেল। সে চিনলে কেবল অর্থকে,—তার দিদিকে সে চিনতে পারলে না।”

প্রবল দুঃখাবেগে উমার কণ্ঠ একেবারেই রুদ্ধ হইয়া গেল। মনীশ সন্দেহাকুল ভাবে বলিল, “তুমি কি করেছ উমা, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনে।”

উমা বলিল, “আমি উইল ছিঁড়ে ফেলেছি মনীশদা, মৃন্ময়ের সামনেই তা দূর করেছি।”

“ছিঁড়ে ফেলেছ উমা! করলে কি! এমন করেও নিজের সর্ব্বনাশ করলে?” মনীশ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে উমার পানে চাহিল।

উমা শান্ত কণ্ঠে বলিল, “সর্ব্বনাশ কিসের মনীশদা? যার সর্ব্বস্ব গেল। তার আর বেশী কি সর্ব্বনাশ হতে পারে? যেদিন বাবা গেলেন—আমি জেনেছি, সেই দিনই আমার সব ফুরিয়ে গেল। আমার আর কিছুই তো নেই, মিথ্যে আমায় কেন জড়াতে চাচ্ছ মনীশদা। আমি আর কিছু চাই নে, আমায় আর তোমরা জড়িয়ো না, আমায় মুক্তি দাও, আমায় তোমার কাছে নিয়ে চল,—এখানে—এদের দয়ার ওপরে আমায় ফেলে রেখে যেয়ো না।”

উমার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মনীশ বলিল “না উমা, তোমায় ফেলে যাব না। আমি যা পাব, তার অর্দ্ধেক তুমিও পাবে। যতক্ষণ আমি বেঁচে থাকব, ততক্ষণ তোমায় আমি কারও দয়ার ওপরে নির্ভর করতে দেব না। ভগবান যা ব্যবস্থা করেছেন, তা খণ্ডাতে কারুরই ক্ষমতা

নেই, তা বেশ বুঝছি। একটা কথা আছে—মানুষ গড়ে, দেবতা ভাঙ্গে,—সেটা এখানে ঠিকই খেটে গেছে। এ বেশই হয়েছে উমা; তুমি সংসারে চির-অনাসক্তা, সংসারের ভাবনা তোমার মাথায় চাপানো ভগবানের অভিপ্রেত নয় বলেই, তিনি তোমার হাত হতে নিলেন। আমি তোমায় নিয়ে যাব, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

মৃন্ময়ের মুখখানা আজ বড় উজ্জ্বল, বড় দীপ্ত। মনীশ তাহার সেই আনন্দদীপ্ত মুখখানার পানে চাহিতেছিল, আর হৃদয়ের মধ্যে প্রবল জ্বালা অনুভব করিতেছিল।

এক সময়ে নির্জ্জনে পাইয়া সে মৃন্ময়কে ধরিল,—কথাটা বলিবার লোভ সম্বরণ করা তাহার পক্ষে বড় দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

"আচ্ছা মৃন্ময়, কাজটা তোমার ভাল হয়েছে বলে তুমি বিবেচনা করছ? এটা তোমার উচিত হয়েছে?"

চশমার মধ্য হইতে চক্ষু দুইটা কুঞ্চিত করিয়া, তীব্র দৃষ্টি মনীশের মুখের উপর ফেলিয়া মৃন্ময় বলিল, "কিসের কথা বলছ?"

মনীশ বলিল "মৃতের সম্মানটা যে তোমরা রাখলে না, এতে আমি বাস্তবিকই অত্যন্ত ব্যথা পেয়েছি মৃন্ময়। জীবিতের কথা ঠেলা যায়, কিন্তু মৃতের কথা অগ্রাহ্য করা যায় না বলেই আমার বিশ্বাস ছিল,—অন্ততঃ কোনও হৃদয়বান লোক সেটা অগ্রাহ্য করতে পারে না। তুমি শিক্ষিত, সদ্বংশজাত,—কেমন করে সেটা অগ্রাহ্য করলে, তা আমি ভেবে পাচ্ছিনে। সংসারে স্বার্থ টাই যে সবচেয়ে বেশী, তা আমি বেশ জানতে পেরেছি, নইলে কেউ এমন করে না।"

উদ্বেলিত ক্রোধ চাপিয়া মৃন্ময় বলিল, "অন্যায় আমি কিছু করিনি মনীশ, আমার যা ন্যায্য তাই আমি চেয়েছি। তোমার বোন যা করতেন, আমিও তাই কর্ব্ব, তবে এতে না ছেড়ে দেবার

মানে কি? তিনি এখানে থাকুন, আমি রীতিমত তাঁর সব ভার নেব।"

বিদ্রূপের সুরে মনীশ বলিল, "তুমি, তোমার স্ত্রী কলকাতায় থাকবে, আর উমা এখানে থাকবে দাসীর মত,—শুধু সে খেটে যাবে—এই মাত্র। নিজের সংসারে নিজেই সে চোর হয়ে থাকবে,—একটা কাজ তোমাদের বিনানুমতিতে করতে পারবে না, একটা কথা পর্য্যন্ত বলতে পারবে না। এ রকম পরাধীনতার জীবন সংসারে কেউ যে প্রার্থনা করে না, তা তুমিও বেশ জানো মৃন্ময়।"

মৃন্ময় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "সত্য কথা বলছি আমি, শোন। উমা যুবতী, সুন্দরী, বিধবা,—হাতে থাকবে তার প্রচুর সম্পত্তি! সুতরাং তাকে বিপথগামিনী করবার লোকের অভাব হবে না। এত দিন বাপ ছিলেন, সে সদুপদেশই পেয়েছে। এখন সে সদুপদেশ পাবে না। চির দিন মানুষের মন কিছু পবিত্র থাকতে পারে না—বিশেষ এ রকম অবস্থায়। মাথার উপর একজন শক্ত অভিভাবক থাকবার দরকার, সে তাকে সম্পূর্ণ বশে রাখতে পারবে। উমার যা আছে—আর যা তার হাতে পড়ছিল—এর একটাও মানুষের চিত্ত স্থির রাখতে পারে না,—বিপথগামী করে ফেলে। আমি শুদ্ধ তাকে রক্ষা করবার জন্যে, তার প্রবল শত্রুকে নিজের কাছে রাখলুম।"

মনীশ তীব্র হাসিয়া বলিল, "ধন্যবাদ তোমায়! তোমার নিজের মনটাই কলুষিত; তাই তুমি এত সহজেই উমার পরিণামটা দেখতে পেয়েছ,—তাই নিজের হাতে তার পথটা পরিষ্কার করে, তাকে সোজা পথে যাবার সাহায্য করলে। এটা বোধ হয় তোমার মনে নেই—শিশুকালেই মানুষের প্রকৃতির প্রকৃত পাওয়া যায়। সে ছোটবেলায় যে শিক্ষার ভিত্তি গড়ে তোলে, তার উপরে ভর দিয়েই তার সারাজীবনটা দাঁড়িয়ে থাকে। উমার

শিক্ষা যে কি, তা তোমার মত বধির অন্ধের কাছে বলা নিষ্প্রয়োজন। উমার শুধু রূপই দেখে গেছ তুমি,—সে যে কি রূপ, তা তুমি যথার্থ ই অনুভব করতে পারবে না ; কারণ বিশ্বজননীর মূর্ত্তি কখনও তুমি সরল চোখে দেখতে পাও নি। যদি সেই যথার্থ মাকে দেখতে, সে রূপ তোমার হৃদয়ে থাকত, তবেই তুমি, উমার রূপ যে কি, তা অনুভব করতে পারতে। তুমি অন্ধ—নইলে দেখতে পেলে না কেন? তোমার অন্তর জড়, নইলে তুমি ধারণা করতে পারলে না কেন? তুমি পশু, তাই তাকে স্বর্গীয় ভাবে দেখতে পাও নি, দেখেছ পার্থিব চোখে। যাই হোক, ধন্যবাদ তোমায়, তোমার দয়াকেও সহস্র ধন্যবাদ! যেহেতু, তার ভার তুমি নিতে চাচ্ছ। কিন্তু কে বলবে, তোমার এই দয়ার মূলে কোনও গোপনীয় উদ্দেশ্য জেগে নেই—তুমি তাকে নির্য্যাতন কর্তে পার না? আমি তোমার এ দয়া তোমাকেই ফিরিয়ে নিতে বলছি,—আমার আশ্রয় উমার জন্যে চির উন্মুক্ত আছে,—আমার শ্রমলব্ধ উপার্জ্জনেই আমাদের বেশ চলে যাবে!"

মৃন্ময় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল ; কিন্তু সাহস করিয়া মনীশকে সে আর বিরক্ত করিতে পারিল না। মনীশের চেয়ে সে মনীশের কথাকে বড় ভয় করিত।

শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গেল, মনীশ উমা ও বগলাদেবীকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

সজল-নয়না উষা আসিয়া উমার পায়ে প্রণতা হইয়া বলিল, "আমার ওপর রাগ করে চলে যাচ্ছ দিদি,—আর কখনও এখানে আসবে না?"

উমা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল "না ভাই, আর এখানে আসা হবে না। আর কি করতেই বা আসব উষা,—এ বাড়ী যে আমার কাছে শূন্য হয়ে

গেছে। বাবা থাকতেন—তাই মনে হত, বাড়ী পূর্ণ হয়ে আছে। যেদিকে তাকাতুম—মনে হত সব সুন্দর, সব ভাল। আমার সবই স্বপ্ন হয়ে গেল উষা, এ স্বপ্নের দেশে এসে আর আমার কি হবে ?”

আবেগে তাহার কণ্ঠ কাঁপিতে লাগিল। উষার ছেলেকে কোলে টানিয়া লইয়া, তার ললাটে, গণ্ডে চুম্বন দিয়া উমা বলিল, “তোর ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি উষা—যেন যথার্থ এ মানুষ হতে পারে, যেন আমাদের ঠাকুরবাড়ীতে আবার তেমনি জাঁকজমকের সঙ্গে পূজা হতে পারে। যদি তত দিন বেঁচে থাকি, আমার কানে সে কথা গিয়ে পৌঁছাবামাত্র আসব, একবার এসে দেখে যাব. নইলে এই শেষ।”

ঠাকুরবাড়ী গিয়া সে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিল। দেবতা—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। এ যে তোমারই ইচ্ছা দয়াময়! তুমি করাইতেছ তবে তো আমরা করিতেছি; তোমার শক্তি না পাইলে আমরা কি করিয়া করিতাম? তুমি সামনে পথ দেখাইয়া চলিতেছ, আমরা চলিতেছি; নহিলে পথ যে দেখিতে পাই না। এখনও দীর্ঘ জীবন সম্মুখে পড়িয়া—পথ দেখাইয়ো ভগবান,—দেখিয়ো, যেন বিপথে না যাই।

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া উমা উঠিল।

সেই দিন সে ও বগলাদেবী মনীশের সহিত প্রসাদপুর ত্যাগ করিল।

২৭

গ্রীষ্মের ছুটীতে সতী বাড়ী আসিয়া ভাইয়ের কাছে সব কথাই শুনিতে পাইল। মৃন্ময় গর্ব্ব ভরে বলিল, "বুঝেছিস সতী, আমি বলে তাই আদায় করতে পেরেছি সব, অন্য কেউ হলে পারত না, সে কথা আমি খুব জোরের সঙ্গে বলতে পারি। মেয়েটার এত তেজ—সে আর কি বলব! কিছুতেই জমীদারী ছাড়ল না, বলে—আমার বাবা বলে গেছেন ঠাকুর-সেবা হবে না, তাঁর জমীদারীর উন্নতি হবে না। আঃ, কি জমীদারীর উন্নতি আর কি ঠাকুর-সেবা! কতকগুলো ছোটলোক, ভদ্রলোক—এই তো প্রজা। এদের উন্নতি এরা নিজেরাই করুক। তার জন্যে টাকা ঢালতে যাই আমি! আর একটা মাটীর পুতুল—তার পূজোর জন্যে মাসে একশ হতে দুশো টাকা বন্দোবস্ত,—আবার তা ছাড়া বেশীও দিতে হয়। এই এতগুলো করে টাকা অনর্থক—সে আমার দ্বারা হবে না। আমি ও সব কিছু করব না। ঠাকুর অমনি থাকবে, সেই একটা পুতুল পূজোতে আমি অনর্থক এত টাকা নষ্ট করতে পারব না। আর প্রজার সঙ্গে জমীদারের সম্পর্ক খাজনা নিয়ে,—দেখা শোনা করা যাবে সেই সময়ে, অন্য সময়ে আমি কারও নই।"

আগাগোড়া সব কথা শুনিয়া সতী হৃদয়ে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা পাইল—সংসারে এ কি উৎপীড়ন! পরস্পর পরস্পরকে জয় করিবার জন্য কেন বৃথা প্রয়াস করিতেছে? স্থায়ী যাহা নহে—তাহা পাইবার জন্য মানুষ কেন হাহাকার করিয়া মরে?

সতী উষার কাছে উমার কথা জিজ্ঞাসা করিল। উষা দারুণ অভিমানে বলিল, "দিদি এই এখানে মনীশদার বাড়ী এসে আছে। এই এক বছর

হয়ে গেল,—একটী দিন আমাদের একটী খবর দেয় নি। মনীশদা আগে রোজই আসতেন, এই একটা বছর তিনিও আমাদের বাড়ী আসেন নি।"

আহা—উমা !

উমার মূর্ত্তিখানা সতীর চোখে স্পষ্ট রূপেই ফুটিয়া উঠিল। আহা, সে একসঙ্গেই সব হারাইল। সে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াছিল, স্বেচ্ছায় তাহা বিসর্জ্জন দিল। সংসারে তাহার কিছু ছিল না, তবু সবই তাহার ছিল। পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার সব ঘুচিয়া গেল, সে নিজে আজ পরের দুয়ারে হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়াছে !

সতী মনে মনে তাহাকে প্রণাম না করিয়া থাকিতে পারিল না! সে তাহার হৃদয়হীন নিষ্ঠুর ভগিনীপতি কিম্বা ভগিনীর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়ায় নাই,—সে মনীশের শরণাপন্ন হইয়াছে,—মনীশ তাহাকে আদরে নিজের গৃহে স্থান দিয়াছে। ধন্য মনীশ—সে যথার্থ মানুষের মতই কাজ করিয়াছে।

বাড়ীতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া সতী সে দিন সন্ধ্যার সময় গোপনে একেবারে মনীশের বাড়ী গিয়া উঠিল।

নীচে বাহিরের ঘরে মনীশ একখানা চেয়ারে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল। সতী ইতস্ততঃ না করিয়া সোজা সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

বিস্ময়ে কাগজ ফেলিয়া মনীশ বলিল, "এ কি, সতী ?"

সতী তাহার পায়ের কাছে মাথা নত করিয়া প্রণাম করিল, "হ্যাঁ, আমিই।"

মনীশ বিস্ময় প্রশমিত করিয়া বলিল, "আমি তো তোমায় ডাকি নি।"

সতী বলিল, "তুমি ডাক নি, কিন্তু আমি না ডাকতেই এসেছি ; কারণ, এতে তোমার একারই কর্ত্তব্য নেই, আমারও কর্ত্তব্য আছে।

দাদা যা করেছেন, তা আমি শুনেছি,—শুনে আমি তোমার কাছে এসেছি। তুমি একা ভার বইতে পারবে না, আমায় তার অংশ দাও।"

মনীশ নির্ব্বাক-প্রায় কণ্ঠে বলিল, "তুমি কি অংশ নেবে সতী?"

সতী নির্ভীক কণ্ঠে বলিল, "আমি উমাকে চাই, দেবে না কি?"

"তুমি উমাকে চাও?" মনীশ তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

সতী দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "হাঁা, আমি উমাকে চাই। দাদা তার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাকে পথের ভিখারিণী করেছে, আমি আমাকে দিয়ে তার সে অভাবটা পূর্ণ করব।"

মনীশ বলিল, "কিন্তু সতী—"

সে থামিয়া গেল। সতী বলিল, "থামলে কেন? আমায় সেই মৃন্ময়ের বোন বলে তুমি আমায় অবিশ্বাস করতে পার, কিন্তু তোমার বলে তুমি তো অবিশ্বাস করতে পার না। আমার এই বাহ্যিক দেহটা তাদের হতে পারে, কিন্তু অন্তরটা তো তোমারি। বাহ্যিক দেহ কারও অনিষ্ট করতে পারে না, যদি তার অন্তরটা না যোগ দেয়। অন্তরে তুমি রয়েছ,—তোমার যে প্রিয়, তার অনিষ্ট আমি করতে পারি, এই কি তুমি বিশ্বাস কর?"

মনীশ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না সতী, আমি অবিশ্বাস করছিনে। আমি বলছি, উমা তাদের দান নেবে না বলেই প্রতিজ্ঞা করেছে,—তোমায় সে গ্রহণ করবে কি? তোমাকেও সে তো তাদের জিনিস বলেই জানে,—আমার বলে তো জানে না।"

সতীর চোখ সজল হইয়া উঠিল, বলিল, "তুমি তা বলবে না?"

মনীশ বলিল, "কি করে বলব সতী,—আমার স্বর যে বন্ধ হয়ে যাবে!"

সতী তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল, "না, তোমায় তা বলতেই হবে,—না বললে কোন মতে চলবে না। আমার প্রকৃত পরিচয় তোমাকেই দিতে হবে। তাকে আমার চাই-ই, নইলে হবে না, আমি তোমার

কাছে হতে কখনই ফিরে যাব না। বল—বলবে তুমি, আমায় তাকে দেবে ?"

মনীশ একবার তাহার মুখের পানে চাহিয়াই চোখ নামাইল, "দেব, তোমাকে অদের আমার কিছু নেই। তুমি তোমার ত্যাগ দিয়ে আমায় জয় করেছ,—আমি তোমার কাছে অনেক দিন আগেই পরাজয় স্বীকার করেছি। উমাকে কোথাও রেখে আমার শান্তি নেই। আমার কাছে যে সে আছে, এতেও আমি শান্তি পাচ্ছি নে, দুর্ভাবনা আমায় শুষে রক্ত খাচ্ছে। কি জানি, যদিই সে সত্য কোনও ক্রমে বেরিয়ে পড়ে! তার সে আঘাতে উমা যে বিবর্ণ হয়ে যাবে,—সে ফুল শুকিয়ে ঝরে যাবে। যে উমা আমার এত প্রিয় ছিল, তাকেই আমি এখন সর্পের চেয়েও বেশী ভয় করি, তার সামনে যেতে আমার বুক কেঁপে ওঠে,—যদি প্রকাশ পায়,—যদি আমারই আঘাতে সে ঝরে যায়! আমি কোথাও তাকে নামাবার মত জায়গা পাচ্ছিনে,—যেখানে রেখে আমি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি।"

সতী গাঢ় স্বরে বলিল, "তাই তো আমিও এসেছি। তোমাকে আমি চিনি, তোমার কিছুই আমার কাছে গোপন নেই। পাছে তোমারই আঘাতে সে ঝরে যায়, তাই আমি এসেছি। তাকে আমি নিয়ে যাব, তোমায় রক্ষা করব, সংসারের আর একটা ভীষণ আঘাত হতে তাকেও রক্ষা করব। সে সংসারের সকলকেই চিনেছে, চেনেনি কেবল তোমায়। যদি তোমার বুকের এ গোপন কথা সে জানতে পারে,—সে ধরায় লুটিয়ে পড়বে, আর তাকে তোলা যাবে না।"

মনীশের মাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া রাজি করিয়া, সে উমাকে রাজি করিতে গেল।

কিন্তু উমা প্রবল বেগে মাথা নাড়িল, একটু হাসিয়া বলিল, "আর

আমায় ও-সব ফেঁসাদে টেন না ভাই। লোকের মনের পরিচয় যত না পাওয়া যায় ততই ভাল। আমি মানুষ চিনবার প্রার্থনা করি নে, সংসার আমি যা দেখেছি, তাই আমার পক্ষে চরম দেখা হয়েছে। এখানে আমি বেশ শান্তিতে আছি, আমায় আর ও-সব ঝঞ্ঝাটে নিয়ে যেয়ো না। এ ভাই—আমার আপনার লোক, তুমি তো ভাই—"

সে থামিয়া গেল, সতী হাসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "পর—কেমন? পর—কেন না আমি উষার ননদ, মৃন্ময়ের বোন। উমা, বাহির নিয়ে বিচার করতে যেয়ো না,—অন্তর নিয়ে বিচার করলে দেখতে পাবে, আমিও তোমার বড় আপনার। যেমন তোমার মনীশদা, আমিও তাই। মনীশদার কাছে থাকতে পার, আমার কাছে থাকতে পারবে না কেন? তাঁর অর্দ্ধেক শক্তি আমি পেয়েছি, তাঁর সেই শক্তির ওপরে নির্ভর করে আমি তোমায় রাখতে পারব,—সেই সাহসেই আমি এসেছি।"

অদূরে দণ্ডায়মান মনীশের পানে চাহিয়া সে হাসি মুখে বলিল, "এস না তুমি, তুমি সাক্ষ্য না দিলে তোমার বোন যে মোটে বিশ্বাসই করতে চায় না আমাকে।"

বিস্ময়ে মনীশের পানে চোখ তুলিয়া চাহিয়া উমা বলিল, "মনীশদা—"

বিষণ্ণ কণ্ঠে মনীশ বলিল, "সত্য উমা।"

উমা মাথা নত করিল। যখন সে মাথা তুলিল, তখন তাহার মুখখানা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। সতীর গলা ধরিয়া সে বলিল, "আমি সব বুঝেছি সতী, আমায় আর কিছু বুঝাতে হবে না। আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি, কারণ, বাস্তবিকই তুমি মনীশদার শক্তি লাভ করেছ। আমি তোমার ওপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারি; কারণ, তুমি তাদের নও, তুমি আমাদের। আমার আর কোন বাঁধন নেই, ঠাকুরমা ছিলেন, তিনিও চলে গেছেন। এখন আমায় যেখানে নিয়ে যাবে,—আমি সেখানেই যাব।"

* * * * *

মনীশ ষ্টেশনে গিয়াছিল সতী ও উমাকে ট্রেণে উঠাইয়া দিতে। উমা তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আশীর্ব্বাদ কর মনীশদা, আবার যখন ফিরব, তখন যেন তোমাদের এমনই দেখি।"

মনীশ হাসিল, আশীর্ব্বাদ করিল।

উমাকে উঠাইয়া দিয়া মনীশ সতীকে ডাকিল।

"জানো সতী, আমি আজ কি দিলুম তোমায় ?"

তাহার কণ্ঠ তখন কম্পিত হইতেছিল।

সতী বলিল "জানি, আমায় এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার দানের মর্য্যাদা রাখতে পারি, হেলায় যেন এ রত্ন হারিয়ে ফেলি নে। আমার সর্ব্বস্ব তুমি, তোমার ধ্রুবতারা উমা, সেই উমাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। তুমিও জানতে পারছ না—সে আমার কে ? সে আমার উপাস্যের উপাস্য আমার লক্ষ্যের লক্ষ্য, আমার মহাসাধনার ধন। তুমি জানবে কি—আমি তাকে কতটা ভালবাসি, কতটা ভক্তি করি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি তাকে তোমার চেয়েও বেশী আদরে রাখব। তোমার গুপ্ত কথা প্রকাশের ভয় ছিল এখানে, আমার কাছে তা নেই। দাদার সঙ্গেও উমাকে নিয়ে কাল ঝগড়া হয়ে গেছে। দাদা আর এক দিন আমায় রেখে আমার প্রাপ্য এখানকার দুখানা বাড়ী আর তিন লাখ টাকা বুঝে নিতে বলেছিলেন,—আমি বলে এসেছি, আমি তাঁর এক পয়সাও চাই নে। আমার নিজের উপার্জ্জিত যা—আমি তাহাতেই খুব খুসী হয়ে থাকব। আমি এই যাচ্ছি—কত কালে ফিরব, তার ঠিক নেই। যদি আমার বিশেষ দরকার পড়ে, তোমায় ডাকব, তুমি যাবে তো ?"

রুদ্ধকণ্ঠে মনীশ বলিল, "যাব বৈ কি সতী।"

"তবে যাই আমি।"

মনীশের পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া সতী উঠিয়া দাঁড়াইল, ধীরপদে গিয়া ট্রেণে উঠিল।

ধীরে ধীরে ট্রেণ চলিল। যতদূর দেখা যায়, সতী গবাক্ষ-পথে মুখ বাড়াইয়া ছিল,—তাহার পর আর দেখা গেল না।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মনীশ ক্লান্ত দেহে শ্রান্ত পদে বাড়ীর দিকে ফিরিল। তখন পথের ধারে একটা বাড়ীতে কে গাহিতেছিল—

চলিয়াছি গৃহপানে খেলাধূলা অবসান,
ডেকে লও, ডেকে লও, অতি শ্রান্ত মম প্রাণ ॥

Why incomplete

সমাপ্ত